সন্ধ্যা রাত্রির সেই অল্প সময়টুকুর মধ্যে বন্দী হ'য়ে পড়্‌ল—কেবল ঐ টুকু সময়ের জন্ত আমি প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠ্‌তুম, অন্ত সব সময় আমার অস্তিত্বের কোনো লক্ষণ আমি নিজে পেতুম না। সে সময় কে আমার সম্বন্ধে কি ভাব্‌চে, কি বল্‌ছে, ও সব কথা আমার মনের ধা'র দিয়েও আস্‌ত না—আমাকে যেন সারাদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হ'ত। আমার মনের সমস্ত চিন্তা, প্রাণের সমস্ত আবেগ, দেহের সমস্ত বৃত্তি ঐ একটি বাঞ্ছিত মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় একেবারে নিশ্চল হ'য়ে যেতো—ঐ একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন অনন্তকাল বাঁধা পড়েছে—ওরি মধ্যে যেন বিশ্ব-জগতের ছায়া! ওর বাইরে সময় নেই, জগৎ নেই, আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রাণ নেই, মৃত্যু নেই, সুখদুঃখ কিচ্ছু নেই, শূন্তও নেই! রহস্তময়ীর রহস্তমোচন কর্‌বার জন্তে মনের যে কৌতূহল একটু স্বাধীন চিন্তার রূপে, অস্তিত্বের একটু ক্ষীণ সাড়ার মত আমার মধ্যে ঝিল্‌মিল্‌ করছিল—তাও মিলিয়ে গেল—সে কৌতূহলও আর রইল না।—এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে তখন নিশ্চয়ই আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলুম।—এ ও যদি পাগ্‌লামি না হয়, তবে আর পাগ্‌লামি কি?

এই উন্মত্ত লীলা কতদিন চলেছিল মনে নেই, কিন্তু কি করে' হঠাৎ একদিন চিরতরে থেমে গেল, তা বল্‌ছি। সে রাত্রে শোবার ঘরে ঢুক্‌বার সময় চৌকাঠে আছাড় খেয়ে পড়ে' গেলুম—সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে' উঠ্‌ল—মধুর অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে এল। ক্লান্তি, নীলিমা—অসম্ভব ক্লান্তি! বিছানায় উঠে যেতেও যেন ক্ষমতায় কুলোল না। সেই কার্পেটের উপর মাথা রেখেই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়্‌লুম। সে রাত্রে আর ঘুম ভাঙে নি।

* * * *

দেশে ফিরে' এসে শুন্‌লুম, সে রাত্রে আমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ে' কার্পেট্ ভিজে' গিয়েছিল, ঐ অজ্ঞান অবস্থায় দু'দিন ছিলুম—সারাক্ষণ এত দুর্ব্বল ছিলুম যে, ডাক্তাররা আশঙ্কা কর্‌ছিলেন যে কোনো সময়ে আমার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে। আমার জ্ঞান-নায় জন্তও নাকি ভয়ানক শারীরিক দুর্ব্বলতা আংশিকরূপে দায়ী! তা ছাড়া, মানসিক উত্তেজনা ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য মিলে' আমার শরীরকে নাকি এমন ভাবে ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল, যে, আরেকটু হ'লেই একেবারে হাড়গোড় সুদ্ধ চুরমার হ'য়ে যেতুম!

ধীরে ধীরে সেরে উঠ্‌লুম। মন্‌টা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে' এল, তখন সেই অপরিচিতাকে জান্‌বার জন্য সহস্র চেষ্টা কর্‌তে গেলুম, কিন্তু সমস্ত ছল, সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হ'ল। কিছুতেই কোন দিশে কর্‌তে পার্‌লুম না। আজ পর্য্যন্ত পারি নি।

তারপর—ষ্টিমারটা বিকট স্বরে শিঙা বাজিয়ে উঠ্‌ল। আমার আর বলা হ'ল না।

গোয়ালন্দ এসে পড়েচে। অতি সঙ্কীর্ণ জল পথের মধ্য দিয়ে আমাদের ষ্টিমারখানা খুব সাবধানে আপনাকে বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে চল্‌চে। একটা বিশাল ফ্ল্যাট্ সাম্‌নে এসে পড়েছে, ঝন্ ঝন্ কড়্ কড়্ কড়্ করে' নোঙর্ নেমে যাচ্ছে, ভস্‌ভস্ করে' রাশি রাশি বাষ্প বেরুচ্ছে—এতখানি পথ নিরাপদে অতিক্রম করে' এসে ষ্টিমারটা যেন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে—সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু দুল্‌ছে আমাদেরো দোলাচ্ছে। ঘট্‌ঘট্ করে' সিঁড়ি ফেলা হচ্ছে, খালাসীরা ব্যস্ত হ'য়ে ছুটোছুটি কর্‌ছে, কুলিরা দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অনিশ্চিত সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে হুড়্‌হুড়্ করে উপরে উঠে 'ফাস্‌টো কেলাসের' মাল নেবার জন্তে কাড়াকাড়ি কর্‌চে, থার্ড ক্লাশের যাত্রীরা ব্যাগ্ হাতে করে' প্রতীক্ষা কর্‌ছে—আমাদেরো নাব্‌তে হবে তো! এখানে অসংখ্য ষ্টিমার ফ্ল্যাটের ব্যূহ ভেদ ক'রে চাঁদের আলো ঢুক্‌তে পার্‌ছে না। গ্যাসের আলোয় নদীর কালো জল আগুনের মত জ্বল্‌ছে—ডাঙায় রেল-গাড়ীর সিংহনাদ শোনা যাচ্ছে—উঃ—কি ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে চার্‌দিক থেকে!

এতক্ষণে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলুম। দুটো কুলি ডেকে ওদের মাথায় জিনিষ-পত্তরগুলো চাপিয়ে দিয়ে ওদের আগে পাঠিয়ে দিলুম। তারপর নীলিমার একটু কাছে সরে' এসে বল্‌লুম, গাড়ী ছাড়্‌বার আর পনেরো মিনিট্ বাকী। এ গাড়ীতে চাপ্‌লে কাল ভোর নাগাদ পৌঁছ্‌ব। কাল বুধবার। রবিবার তারিখ ফেলা হয়েছে। মায়ের

মিনিটে দিন হাতে থাকে। তুমি আজ ছাড়বার সময় যে কথা বলেছিলে, এখনো কি সেই কথা বল্‌ছ?"

নীলিমার ঠোঁট কেঁপে উঠ্‌ল, কিন্তু কি বল্‌লে, শুন্‌তে পেলুম না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ষ্টিমারের বাঁশিটা অসম্ভব জোরে চীৎকার করে' উঠ্‌ল। নীলিমার মুখের ওপর ষ্টিমারের চোঙাটার ছায়া পড়েছিল।

আমি নীলিমার হাত ধরে সেই অন্ধকারের তলা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম।

রূপছায়া

(উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১

ছেলেবেলায় কোন্ রূপকথায় শুনিয়াছিলাম, এক রাজার বাগানে না কি গাছে আম পাকিয়াছিল, মন্ত্রীপুত্রের সে আম খাইবার লোভ হয়। ঢিল ছুড়িয়া আম পাড়িতে একটা বড় ঢিল আসিয়া রাজকন্যার মাথায় পড়ে—রাজকন্যা সেই গাছের কাছে দীঘির ঘাটে বসিয়াছিলেন,—ঢিল পড়িয়া মাথায় রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। ফলে ভিন্ দেশের রাজপুত্র তাঁর মাথায় চোট দেখিয়া বিবাহের কথা ভাঙ্গিয়া দেন। কন্যার পিতা রাজা তখন মন্ত্রীপুত্রের সাজার ব্যবস্থা করেন, মন্ত্রী পদচ্যুত হন্। প্রজার দল ছিল মন্ত্রীর পক্ষে;—তারা প্রচণ্ড বিদ্রোহ তুলিয়া রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে। রাণী ও কন্যাকে লইয়া রাজা বনে যান্—এবং সেই বনে এক দরিদ্র বনবাসী যুবার সহিত কন্যার বিবাহ হয়। কন্যা অতি-দুঃখে কাল কাটায়!

এত-বড় যে করুণ মর্ম্মান্তিক জীবন নাটক, এর মূলে ছোট একটু কারণ,—মন্ত্রীপুত্রের সেই আমের লোভে গাছে ঢিল ছোড়া। এ তো রূপকথা! সংসারেও দেখি, মস্ত-বড় ব্যাপারের মূলে এমনি ছোট ছোট হেতুই প্রচ্ছন্ন থাকে। ছোট একটু বীজ, তা হইতেই তো প্রকাণ্ড মহীরুহের সৃষ্টি!

ঠিক এমনি ছোট কারণেই কলিকাতার বাগবাজারে কাঁটাপুকুরের মিত্র-পরিবারে একদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের কুঠার পড়িয়া সংসারটার সঙ্গে সঙ্গে দুটী তরুণ প্রাণকে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া কি নাট্য গড়িয়া তুলিবার সূচনা করিল, কে জানে!

একটা ভৃত্য তুচ্ছ কি অপরাধ করিয়াছিল, গৃহিণী ভৃত্যকে কঠোর সাজা দেন। মনিব তার প্রতিবাদ করিতে দুইজনে তুমুল তর্ক বাধিয়া যায়। ফলে গৃহিণী তিনটী ছেলে-মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ী যাত্রা করেন। যাইবার সময় স্বামীকে এমন কতকগুলা কথা বলেন যে-কথায় বিষ অত্যুগ্রধারে উৎসারিত হইয়া পড়ে। সে কথা শুনিয়া স্বামী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বহুৎ আচ্ছা!

স্ত্রী চলিয়া গেলেন। শূন্য গৃহে স্বামী কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—যাক্ গে! আর পারাও যায় না!

দাসী-চাকরে এই ছোট ব্যাপারটুকুর মধ্যে এমন বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিল না। শুধু স্বামী আর স্ত্রীই বুঝিল, এ বিচ্ছেদের যবনিকা সহজে উঠিবার নয়!

কিন্তু এটুকুও ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে গোড়ার অনেক ব্যাপারের খোঁজ লইতে হয়।

ব্রজনাথ মিত্র ধনীর পুত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীর সঙ্গে তাই বলিয়া সম্পর্ক রাখিতে সে কৃপণতা করে নাই। সেখান হইতেও বৈশিষ্ট্যের ছাপ লইয়া জীবনটাকে উপভোগ করিবার-বাসনায় তরুণ বয়সে আপনাকে সে বেশ উদ্যত উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। পিতা ব্রজনাথের বিবাহ দিয়া বধূ আনিলেন।

বধূ ধনীর কন্যা। অঙ্গে তার রূপের উজ্জ্বল আবরণ যেমন ছিল না, মনটাও ছিল তেমনি আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ। তার ফলে ব্রজনাথ প্রথম মুখেই ধাক্কা খাইল। তবু সে লেখাপড়া শিখিয়াছে, অপরের মনের প্রতি নাকি একবারে উদাসীন থাকিতে জানে না। তার উপর এ জ্ঞানটুকু তার ছিল, হিন্দুর ঘরে বিবাহ হইলে তাকে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই,—তা সে বিবাহ প্রাণে যত কঠিন হইয়াই বাজুক! কাজেই কংকগুলা খুঁৎ লইয়া মনে অশান্তি গড়িয়া দিন কাটানোর চেয়ে যা ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাকেই মানিয়া লইয়া কোনো মতে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলায় আর কিছু না থাক্, এটুকু তৃপ্তি আছে যে, অশান্তির মাত্রা তাহাতে বাড়িতে পারে না! তাছাড়া একদিক দিয়া জীবনে বিফলতাই যদি আসে, আরো তো হাজার দিক খোলা আছে। সে দিকগুলায় হুঁশিয়ার থাকিলে জীবনটা কোনো রকমে চলিয়া যায়!

ফাল্গুনের কত জ্যোৎস্না-রাত্রি তার শোভা-মাধুর্য্যের ডালি লইয়া হৃদয়ের দ্বারে অতিথি সাজিয়া আসিয়াছে, বসন্ত-বাতাস তার ফুলের গন্ধ, পাখীর গানের লহর তুলিয়া দেহে-মনে কি কুহকেরই না সৃষ্টি করিয়াছে, ব্রজনাথ বিপুল আগ্রহ-সত্ত্বেও তাদের বরণ করিয়া লইতে পারে নাই! তার উদগ্র-উন্মুখ পিয়াসী চিত্ত তরুণী প্রিয়ার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারের সামনে হইতে বাক্যবাণে জর্জ্জর পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসে! স্ত্রী নীরজা আপনাকে লইয়া সর্ব্বক্ষণই বিভোর। নিজের সাজসজ্জা, সাধ-খেয়াল···এগুলার দাবী সকলের আগে সে মিটাইতে চায়! তার এই সব খেয়ালের সাম্‌নে তরুণ স্বামীর সুগভীর আবেগ, বসন্তের চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, সমস্তই ছায়ার মত কোথায় মিলাইয়া যায়! ব্রজনাথ আসিয়া কোনদিন যদি বলে,—বায়োস্কোপে যাবে, নীরো? নীরজা তার জবাব দেয় না। ব্রজনাথ যদি একটু মিনতি করিয়া বলিল,—চলো না, ভালো ছবি আছে। আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে, তোমায় নিয়ে বায়োস্কোপে যাই। নীরজা বাধা দিয়া ভ্রূভঙ্গী তুলিয়া বলে—তোমার ভালো লাগে বলেই আমায় যেতে হবে... বটে। আমার ভালো লাগে না...আমি যাবো না।

সেবার, ব্রজনাথের শিশু পুত্রটি তখন পাঁচ মাসের, হঠাৎ ব্রজনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটিল। এত বড় শোকে সংসারটা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিলে শোকের প্রথম প্রচণ্ড বেগ কমিল, কিন্তু তার স্তম্ভিত ভাবটা তখনো বাড়ীময় থম্‌থম্ করিতেছিল! এমন সময় শিশু পুত্রের অন্নপ্রাশন দিতে হইবে বলিয়া শাস্ত্র মাথা তুলিয়া আদেশ জানাইল। ব্রজনাথের তখন মনে পড়িল, এই শিশুর অন্নপ্রাশনের উৎসব পিতা কতখানি জাঁকাইয়া তুলিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সে সঙ্কল্প লইয়া কত ঘটার যে প্ল্যান্ খাটাইতেন! আজ সে পিতা ইহলোকে নাই! এখন সে কথা মনে করিতেও বুকটা হা-হা করিয়া ওঠে। এ শোকে ফল নাই, ব্রজনাথ তা জানে! আমার প্রাণে শোকের ঘা লাগিয়াছে বলিয়া অপরে তাদের পাওনা-গণ্ডা ছাড়িবে কেন? তবু এগুলা যে মানুষের বড় অন্তরের জিনিষ! এগুলাকে অস্বীকার করিয়াও তো মানুষ থাকিতে পারে না! বিশেষ, যখন এ শোক তার স্ত্রী-পুত্রকেও স্পর্শ করিয়াছে! তাই নীরজা আসিয়া যখন হিসাবের মস্ত ফর্দ্দ দাখিল করিল, ব্রজনাথ তখন স্ত্রীর এই উদ্দীপ্ত আগ্রহ দেখিয়া শিহরিয়া নীরব রহিল। এই উৎসবের আলোচনায় পিতার সেই প্রকাণ্ড উৎসাহের কথা মনে পড়িয়া গেল; তার মুখে কোন কথা ফুটিল না।

নীরজা বলিল,—আর বেশী সময় নেই। সামাজিক, বাজনা-বাদ্যি...এগুলোর বন্দোবস্ত এখন থেকে সুরু করে দাও, বুঝ্‌লে! স্ত্রীর এই লজ্জাহীন অসঙ্কোচ আব্‌দারে ব্রজনাথ বিরক্ত হইয়া বলিল,—এখন এ আমোদ-আহ্লাদে তোমার রুচি হয়, নীরু? এত বড় বিপদের পর···?

নীরজা দুই চোখে বিস্ময় ভরিয়া বলিল,—তার মানে?

ব্রজনাথ কহিল,—বাবার কি সাধই ছিল এতে·· সেই বাবা আজ নেই! বাড়ী থেকে শোকের নিশ্বাস, চোখের জল এখনো মিলিয়ে যায় নি! এখন এই বাজনা-বাদ্যি আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গান···মনের কথা নয় ছেড়েই দি... কিন্তু বাইরে থেকেও এ-সবগুলো যে ভারী বিশ্রী দেখানাব দেখাবে, নীরু!

নীরজা বলিল—সংসারে শোক তো আছেই, তা বলে আমার ছেলের প্রথম কাজ পণ্ড হবে?

ব্রজনাথ কহিল—ও শুধু তোমারি একলাকার ছেলে নয়, আমারো ছেলে! আমার এ শোক-দুঃখ, এর ঘা ওকেও সইতে হবে, নীরু...

নীরজা বলিল—লোকের বাপ-মা চিরদিন থাকে না তা বলে...

এ কথায় ব্রজনাথের মনের দারুণ ক্ষতটাকে যেন সে মাড়াইয়া ধরিল। ব্রজনাথ জ্বলিয়া উঠিল, কহিল,—তোমার নিজের বাপ নয়, তাই! ধর, তিনিই যদি আজ মারা যেতেন,...তা হলে এ কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুতে পারতো কখনো?

নীরজা বলিল—কি! এত বড় কথা বল তুমি! কি দুঃখে আমার এমন দুর্ভাগ্যি হবে! নীরজার দুই চোখে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

ব্রজনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল—ঠিক সে কথা তোমায় বল্‌চি না আমি। সে দুর্ভাগ্য তোমার না আসুক... কিন্তু আমার দুরদৃষ্টে তা যখন ঘটেছে—তখন তুমি আমার স্ত্রী হয়ে এ কথা তুলছো কি করে! এতবড় শোকে তোমার কাছ থেকে এটুকু দরদ এটুকু সহানুভূতি যদি আমি প্রত্যাশা করি, তাহলে সে কি আমার অসম্ভব প্রত্যাশা করা হবে।

নীরজা বলিল—আমি অত-শত বুঝি না। আমার ছেলের এই প্রথম কাজ! তোমরাই হেন করবে, তেন করবে বলে কত কথাই তুলেছিলে! সে কথা আমিও পাঁচজনকে বলে এসেছি। আজ যদি নেহাৎ দুঃখী-গরীবের ছেলের মত ওর মুখে ভাত দেওয়া হয়, তাহলে লোকের কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায়ও থাকবে না! এ ভাত দেওয়ার কোনো দরকারও নেই তোমাদের! দরদ...? আমার উপর ভারী মস্ত দরদ দেখাচ্ছ কি না!

ব্রজনাথ ডাকিল,—নীরু...

নীরজা বেশ ঝাঁজালো স্বরেই কহিল,—এর আবার নীরু কি! আমার পষ্ট কথা! ভাত আমি দেবোই, আর তা বেশ ঘটা করেই দেবো। তোমাদের এখানে তার সুবিধে তোমরা না করতে পারো,—আমি সত্যি বলে আমি নি—আমার বাপের বাড়ীতে গিয়ে ভাত দেবো। আমার বাবা আমার এ আব্দারটুকু অনায়াসেই সহ্য করবেন, সে পয়সার জোর তাঁর আছে।

কথাটার ভিতর হইতে এমন ইতর ইঙ্গিত দারুণ বীভৎসতা লইয়া বাহির হইল যে, মানস-নেত্রে তা দেখিয়া ব্রজনাথ শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল,—পয়সার কথা হচ্ছে না, নীরু! আমার ছেলে...আমার খুবই স্নেহের ধন, আদরের বস্তু! এ হলো মনের কথা। আমার মনের অবস্থা এখন ভালো নয়, অর্থাৎ আমোদ-আহ্লাদ করবার মতন...বুঝলে!

—কে বলচে তোমায় আমোদ-আহ্লাদ করতে...বলিয়া বিদ্যুৎগতিতে নীরজা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

এমনি করিয়াই নানা ব্যাপারে ক'বৎসর ধরিয়া অহর্নিশি খিটিমিটি চলিয়া আসিতেছে। যে-বয়সে মানুষের প্রাণ সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব দ্বেষ বা দেনা-পাওনার হিসাব দূরে ঠেলিয়া রাখে, সে-সবের সন্ধানও লইতে জানে না—আকাশ-প্রমাণ দরদ, মমতা, আর আশার রঙীন স্বপ্নে প্রাণটাকে ভরপুর রাখে, ঠিক সেই বয়সে এ সব তর্ক-কলহ, আর তাও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে...ব্রজনাথের এক-একবার মনে হইত, এই সংসার, এই স্ত্রী...ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া জীবনের পথে তাকে চলিতে হইবে! এর চেয়ে আশার ফানুষটাকে ছিঁড়িয়া চূর্ণ করিয়া লোটা-কম্বল লইয়া বাহির হইয়া পড়াও যে ঢের ভালো—তাহাতেও ঢের বেশী আরাম!

তার এই তরুণ বয়স, এই যৌবন-স্বপ্ন সবই যে ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে! কতবার মনকে প্রস্তুত করিয়া নিজেকে সর্ব্ব প্রকারে নত করিয়া সে গিয়া নীরজার কাছে দাঁড়াইয়াছে, ...ওগো তরুণী প্রিয়া, তোমার যৌবনকুঞ্জে ঐ যে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়াছে, যার বর্ণে-গন্ধে একটা পিয়াসী চিত্তকে পরিপূর্ণ মশগুল, প্রাণটাকেও সার্থক সুন্দর করিয়া তুলিতে পারো, সে ফুলগুলাকে কেন অকারণ ক্রোধের ঐ বিদ্যুৎ-ঝলকে, কথার ঝড়ে ঝরাইয়া নির্ম্মূল করিয়া দাও! ইহাতে যে বেদনাই সার হয়, তা নয়! ঐ ভ্রুভঙ্গী, ঐ রোষের দাহ...ও যে তোমারো চিত্তে অনেকখানি অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তোলে। জীবন বড় ক্ষণিক,...যৌবন সে

জীবনের ক্ষুদ্র একটা নিমেষমাত্র—কেন এ যৌবনের অপব্যয় কর! তোমার প্রাণের সুধামধু, তার একটি বিন্দুর কাঙাল যে সে আমি...কিন্তু হায়, সবই মিছা হয়! নীরজা অহঙ্কারের প্রাচীরে এমনি কঠিন দুর্গ রচিয়া তার ভিতর বসিয়া থাকে যে, ব্রজনাথের সমস্ত মিনতি বেদনায় ব্যথাতুর হইয়া ফিরিয়া আসে!

—

পাছে স্ত্রী-পুরুষের এই কলহ বাহিরে কৌতুক বা কোনো অলস জল্পনা গড়িয়া তোলে, এই আশঙ্কায় ব্রজনাথ নীরবে এ রূঢ়তা সহিয়া যায়। দৃষ্টির ভঙ্গীতে, মুখের ভাবে বা বাক্‌হীন পরুষতায় অন্তরের এ দা'হের একটু ছিটাও সে বাহিরে প্রকাশ হইতে দেয় না। এত বড় বাড়ী, আত্মীয় স্বজন, দাস-দাসীর এই কলরব, তার মধ্যে কেহ বুঝিতেও পারে না, এই তরুণ বয়সে ব্রজনাথ নিজের মনকে কি দুশ্চর বৈরাগ্যের মাঝে নিঃসহায় ছাড়িয়া দিয়াছে! যে-বয়সে তরুণ প্রাণ তরুণীর দুটা সোহাগ-বচন, রূপের দীপ্তি, সরস অনুরাগ-পরশ চাহিয়া আকুল হয়, সেই বয়সে তার সব-চাওয়ার মূলে স্ত্রী এমন আঘাত করিল যে, চাওয়ার জিনিষ জগতে কিছু থাকিতে পারে, সে-কথাটাও ব্রজনাথ ভুলিয়া গেল।

সংসার তবু গড়াইয়া চলিয়াছিল। যে সংসারে টাকা-পয়সারূপ তৈলের জোগান ঠিক থাকে, তার চলিবার পক্ষে কোথাও বাধে না। হয় তো স্বামী-স্ত্রী একদিন পাশাপাশি মিলিতে পারিত—যদি এ সংসারে বাহিরের দিক হইতে কোনো অভাব বা অভিযোগ উঠিত! কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। স্ত্রী নিজের দর্পে নিজের খেয়াল লইয়াই মত্ত থাকিত, কোনো অভিযোগ-অনুযোগ লইয়া স্বামীর সামনে তাকে দাঁড়াইতে হইত না এবং স্বামীও স্ত্রীর কোনো কাজে না লাগিয়া আর-পাঁচটা আস্‌বাবের সামিল হইয়া সংসারে সজ্জায় সম্পূর্ণতাই বিধান করিতেছিল! আস্‌বাবের যেমন প্রাণ নাই, মন নাই—স্বামী ব্রজনাথও নীরজার কাছে তেমনি!··একটা প্রাণহীন আসবাব মাত্র! যখনি স্বামী বা স্ত্রীর মন জাগিত, তখনি তর্ক উঠিত, কলহ বাধিত! ব্রজনাথ মনের সে ক্রোধ-গর্জ্জন কোনমতে দাবিয়া রাখিয়া নীচের ঘরে, নয়, বন্ধু-মজলিসে প্রস্থান করিত, এবং নীরজা তার রাগের ঝাল মিটাইত দাসী-চাকর বা আশ্রিত আত্মীয়-পরিজনের উপর।

কিন্তু এত দোলায়, এত আঘাতে শক্ত ষ্টীমার যেমন চিরদিন জলের বুকের উপর টিঁকিয়া থাকিতে পারে না, একদিন জলের নীচে তলাইয়া যায়, তেমনি কঠিন কথায় ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যাপার এমন দাঁড়াইল যে, ঐ তুচ্ছ ভৃত্যটাকে বকাবকি লইয়াই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মস্ত ব্যবধান দেখা দিল। নীরজা তিন ছেলেমেয়ে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়া উঠিল—আর ব্রজনাথ বন্ধু মজলিসে ঘণ্টাখানেক কাটাইয়া বায়োস্কোপ দেখিতে চলিয়া গেল।

—ক্রমশ

— —

প্রবঞ্চিত

শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী

সম্মুখে সমুদ্র ঘোর উথলিছে আমি তার তটে
তুমি তরণীতে,—
বাহু প্রসারিয়া মোরে ডাক্ দিলে প্রসন্ন বদনে
ধরে' তুলে' নিতে।
নয়নে অভয় তব অধরে সোহাগভরা হাসি
আপনা ভুলিয়া,—
কি আনন্দ আশাভরে ঝাঁপ দিনু দুই বাহু মেলি'
নয়ন মুদিয়া।

আকণ্ঠ নিমজ্জমান, চেয়ে দেখি সুদূরে তোমার
ভেসে যায় তরী—
কোথা তুমি? কোথা আমি? কোথা কূল—এ কি প্রবঞ্চনা
পরাণে যে মরি!
ঘিরিয়াছে চারিদিকে শুধু জল—শুধু নীল জল
অকূল পাথার—
মরণ ঘনায় নেমে; চলিলাম সম্বল করিয়া
বঞ্চনা তোমার।

———

রমাঁ রলাঁ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রভাত

[শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী কর্তৃক অনূদিত]

মেলশিয়রের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং পানদোষ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক অভাব খুব বাড়িয়া চলিল; তবুও জাঁ মিশেল্ যতদিন জীবিত ছিলেন এক রকমে দিন কাটিয়া যাইত। একমাত্র মিশেলই মেলশিয়রের উপর খানিক প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিলেন এবং তার কদভ্যাস হইতে খানিকটা নিরস্ত করিতে পারিতেন। মিশেলকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত, সে জন্য মাতা ও পুত্রের নানান 'বেয়াড়ামো' কতকটা ক্ষমা করিয়া চলিত; তাছাড়া মিশেল্ প্রায়ই কিছু কিছু অর্থ দিয়া পরিবারটিকে সাহায্য করিতেন। প্রাক্তন-যন্ত্রী সর্দ্দার হিসাবে মিশেল সামান্য কিছু পেন্‌সেন্ পাইতেন, তার উপর সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া এবং বেসুরো পিয়োনো মেরামত করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার এই আয়ের অধিকাংশ বৃদ্ধ তার পুত্র-বধূকে দিতেন; লুইসা তাঁহার কাছ হইতে গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও মিশেল তার সমস্ত বিপদ আপদের কথা বুঝিতে পারিতেন। তাহাদের জন্য বৃদ্ধ মিশেল যে নিজেকে বঞ্চিত করিবেন তাহা লুইসা সহ্য করিতে পারিত না। বৃদ্ধ বেশ একটু ভাল রকম খাওয়া-পরায় অভ্যস্ত; তাঁহার নানান রকমের অভাবও ছিল; এমন অবস্থায় আত্ম-সংযম করিয়া চলার কতখানি সার্থকতা তাহা সহজেই বুঝা যায়। সময়ে সময়ে শুধু স্বার্থত্যাগেও কুলাইত না, কোন একটা জরুরি ধার শোধ করিবার জন্য জাঁ মিশেল্ গোপনে কোন আসবাবপত্র, কিছু বই অথবা কোন পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন যাহা সযত্নে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাহাও বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। মেলশিয়র ক্রমশ জানিতে পারিয়াছিল যে, তার পিতা তাহার অজ্ঞাতসারে লুইসাকে কিছু কিছু দেন এবং আপত্তি করা সত্ত্বেও মেলশিয়র তাহা প্রায়ই হাত করিত। কিন্তু সে কথা যখন বৃদ্ধের কানে যাইত—বলা বাহুল্য, লুইসা এ সব কথা কখনও বলিত না, বাড়ির ছেলে-পিলেরা বলিয়া দিত—মিশেল চটিয়া আগুন হইতেন; এবং পিতাপুত্রে তুমুলকাণ্ড বাধিত। উভয়েরই মেজাজ বেশ গরম, দুজনেই শপথ হইতে অভিশাপের পালা শেষ করিয়া প্রায় ঘুষঘুষিতে নামে আর কি! কিন্তু প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও পিতার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা মেলশিয়রকে সংযত করিত, এবং তার মত্ততা যতই উগ্র হউক না কেন, পিতার তীব্র আক্রমণ ও গালাগালির বন্যার সামনে সে মাথা হেঁট করিয়া থাকিত। কিন্তু আবার একটু অবকাশ পাইলেই মেলশিয়র নিজমূর্ত্তি ধরিত; সুতরাং ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া মিশেলের হৃদয় বিষাদে ও দুশ্চিন্তার ভারে যেন ভাঙিয়া পড়িত।

লুইসাকে ডাকিয়া একদিন বৃদ্ধ বলিলেন, বাছা আমার, আমি মরে গেলে তোদের কি হবে! তার পর ক্রিস্তফ্‌কে

আদর করিয়া কাছে টানিয়া বৃদ্ধ আপন মনে বলিয়া যাইতেন, যা' হোক্ একটা আশা, এই বাচ্চাটা তোদের সকলকে এই পাঁকের তলা থেকে টেনে উপরে তুলবে। আশা করছি ততদিন পর্য্যন্ত আমি কোন রকমে টিঁকে থাক্‌ব।

হায় বৃদ্ধ মিশেল! সে জানে না তার হিসাবের ভুল থাকিয়া গেছে—তাঁর চলার পথ শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ মাত্রও জাগে নাই, কারণ আশী বছর পার হইয়া গেলেও বৃদ্ধ আশ্চর্য্য রকম মজবুত্‌ ছিল; একমাথা চুল,—যেন সিংহের শাদা কেশর! এখনও সবটা সাদা হয় নাই, মধ্যে মধ্যে গাঢ় পাঁশুটে ছাপ দেখা যায়! তাঁর ঘন দাড়িতে এখনও দু একটা কালচুল চোখে পড়ে! দাঁতের মধ্যে দশটিমাত্র অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু তাহার সাহায্যেই বৃদ্ধ কোষে' চিবাইতে পারিতেন। খাবার টেবিলে তাঁহাকে দেখিলে সত্যই আনন্দ হইত। তাঁর রীতিমত জোর ক্ষুধা ছিল এবং মেলশিয়রকে বেশীমাত্রায় মদ খাইবার জন্য সর্ব্বদা ধমকাইলেও বৃদ্ধ নিজের বোতলটি উজাড় করিতে কখনও ভুলিতেন না। 'মোজেলের' শাদা মদ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল, তাছাড়া 'বিয়ার' 'সাইডার' প্রভৃতি যত রকমের পানীয় বিধাতার স্থষ্টিতে আছে সবগুলিকেই নিরপেক্ষ ভাবে তিনি আদর করিতেন। অবশ্য তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি সব পেয়ালার মধ্যে ডুবাইয়া দিবার মত নির্ব্বুদ্ধিতা তাঁর ছিল না। বৃদ্ধ সর্ব্বদা ওজন ঠিক রাখিয়া চলিতেন। অবশ্য সে ওজনটা সাধারণ লোকের মাথা ঘুরাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর পা তাঁর চোখ যেমন সবল তেমনি অশ্রান্তভাবে কর্ম্মঠ ছিল। ভোর ছ'টায় উঠিয়া বৃদ্ধ স্নানাদি দস্তুর মত সারিতেন, কারণ শরীরের পরিচ্ছন্নতা তাঁর কাছে মস্ত বড় জিনিষ ছিল। বৃদ্ধ একা তাঁর বাড়িতে বাস করিতেন, তাঁর পুত্রবধূকে কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। তিনি নিজে গিয়ে তাঁর ঘর পরিষ্কার করিতেন, 'কফি' প্রস্তুত করিতেন এবং বোতাম সেলাই হইতে তালি লাগানো পর্য্যন্ত সব কাজ নিজে করিতেন। জামার আস্তিন গুটাইয়া সিঁড়ি দিয়া উপর নীচ করিতে করিতে বৃদ্ধ গম্ভীর গলায় সর্ব্বদা গান করিতেন এবং অপেরার অভিনেতাদের মত নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতেন।° জল হাওয়া যেমনি থাক্ বৃদ্ধ মিশেল সর্ব্বদা বাইরে যাইতেন, যেখানে যেখানে কাজ আছে বৃদ্ধ সেখানে যাইবেনই। হয় ত ঠিক সময়মত যাইতে পারিতেন না কিন্তু কিছুতেই যাওয়া বাদ পড়িত না। প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে তাঁহাকে দেখা যাইত, কখন কোন পরিচিত লোকের সহিত তর্ক করিতেছেন, কখন কোন মুখচেনা স্ত্রীলোকের সহিত ঠাট্টা মস্করা করিতেছেন সুন্দরী স্ত্রীলোক এবং পুরানো বন্ধু বৃদ্ধের কাছে অতিপ্রিয় বস্তু ছিল, সুতরাং তাঁর সময়েরও হুঁস থাকিত না। প্রায়ই দেরী হইয়া যাইত; কিন্তু সান্ধ্য ভোজনের ব্যাপারটা কিছুতেই ফাঁক পড়িত না। সে সময়ে বৃদ্ধ যেখানে হাজির হইতেন সেইখানেই নিজেকে নিমন্ত্রণ করাইয়া খাইতে বসিতেন সুতরাং তাঁর নিজের বাড়ি ফিরিতে বেশ দেরি হইত। নাতি নাতিনীদের দেখিয়া গভীর রাত্রে তিনি গৃহে প্রবেশ করিতেন। বিছানায় শুইয়া নিদ্রার পূর্ব্বে বৃদ্ধ তাঁহার পুরানো বাইবেলের অন্তত একপাতা পড়িবেনই। রাত্রে দু এক ঘন্টার বেশী একসঙ্গে ঘুম হইত না, সুতরং উঠিয়া আধা দরে-কেনা তাঁর পুরানো বইগুলি হইতে ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, সাহিত্য, কবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন একটা বই লইয়া পড়িতেন। যেমন খুশী কয়েকপাতা পড়িয়া যাইতেন—তা ভালই লাগুক্ আর নাই লাগুক্, বুঝিতে পারুক বা নাই পারুক, একটি কথাও বাদ না দিয়া বৃদ্ধ পড়িয়া যাইতেন যতক্ষণ না ঘুম আসে।

রবিবারে বৃদ্ধ গির্জ্জায় যাইতেন এবং পরে ছেলেদের লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নানা রকম খেলা করিতেন। পায়ের আঙুলে একটু বাতের ব্যথা ছাড়া তাঁর প্রায় কোন অসুখই ছিল না। সেই ব্যথার দরুণ রাত্রে বাইবেল পড়িতে পড়িতে বৃদ্ধ অতর্কিতে শপথ করিয়া বসিতেন, মনে হইত এমনিভাবে মিশেল একশো বৎসর পর্য্যন্ত টিঁকিবেন এবং মিশেলও সেটা বিশ্বাস করিবার বিরুদ্ধে কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না। লোকে যখন বলিত, মিশেল ভায়া একশো বছর পার না হয়ে ছাড়বে না—তখন বৃদ্ধ মনে মনে ভাবিতেন, ভগবানের শুভ ইচ্ছার সীমা নির্দ্দেশ করা কি মানুষের কাজ! ...

তাঁহার বৃদ্ধত্বের দু একটা চিহ্ন ক্রমশ স্পষ্ট হইতেছিল: প্রতিদিন তার 'খিটখিটেমি' যেন বাড়িয়া যাইতেছিল এবং একটুতেই তার চোখে জল আসিত। মানুষ একটু ধৈর্য্য

হইলেই বৃদ্ধ যেন ক্ষেপিয়া যাইতেন, তাঁর লালমুখ এবং ছোট্ট ঘাড় যেন অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিত, কথা বলিতে গিয়া রাগে কণ্ঠরোধ হওয়ায় তিনি থামিয়া যাইতেন! পরিবারের প্রাচীন ডাক্তার-বন্ধু মিশেলকে তাঁর রাগ ও লোভকে দমন করিতে উপদেশ দিতেন কিন্তু বৃদ্ধজনোচিত একগুঁয়েমির বশে জেদ করিয়া তিনি আরও বেশি অত্যাচার করিতেন এবং ডাক্তার ও অষুধপত্র লইয়া বিদ্রূপ করিতেন। বৃদ্ধ এমন ভাব দেখাইতেন যেন মৃত্যুকে তিনি কৃপার চক্ষে দেখেন এবং অতিরঞ্জিত ভাষায় বলিতেন যে, মরণকে তিনি এতটুকুও ভয় পান্ না।

গ্রীষ্মকাল। দিনটা ভারি গরম। বৃদ্ধ মিশেল একটু বেশি রকম পান করিয়া হাটে নানান লোকের সঙ্গে তর্ক করিয়া বাড়ি ফিরিলেন। মাটি খুঁড়িতে তাঁর বড় ভাল লাগিত। তিনি বাগানে আস্তে আস্তে কাজ সুরু করিলেন। রৌদ্রে খোলা মাথায় তিনি যেন রাগিয়া রাগিয়া খুঁড়িতেছেন। তর্কের জের তখনও তাঁর মাথায় বিষম জোরে ঘুরিতেছে। ক্রিস্তফ্ একটি বই হাতে করিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়াছিল, বিশেষ কিছু পড়িতেছিল না, কেমন যেন স্বপনের ঘোরে সে ঝিল্লির সঙ্গতের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল, শুধু যন্ত্র-চালিতের মত তার দাদা মশায়ের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধ তার দিকে পিছন ফিরিয়া নীচু হইয়া আগাছা উপড়াইতে-ছিলেন। হঠাৎ ক্রিস্তফ্ দেখিল, বৃদ্ধ খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বারকতক শূন্যে কি যেন একটা ধরিবার চেষ্টা করিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া মাটির উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেলেন। চকিতে ক্রিস্তফের হাসি পাইল কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল, বৃদ্ধ নড়েও না চড়েও না। সে ছুটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া দাদা মশায়কে ডাকিল, তার সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে নাড়া দিল; হঠাৎ কেমন একটা ভয় ক্রিস্তফ্‌কে অভিভূত করিল, তবু হাঁটু গাড়িয়া দুই হাতে বৃদ্ধের প্রকাণ্ড মাথাটি মাটি হইতে তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেটি এত ভারি ঠেকিল এবং ক্রিস্তফ্ এমনি কাঁপিতেছিল যে, সে যেন একটুও নাড়াইতে পারিল না। শেষে উলটাইয়া যখন চোখের দিকে চাহিল, সে যেন ভয়ে জমিয়া গেল। বৃদ্ধের চোখ শাদা এবং রক্তাভ। বিকট চীৎকার করিয়া ক্রিস্তফ্ মাথাটা ফেলিয়া দিল এবং ভয়ে অধীর হইয়া সেইস্থান হইতে ছুটিয়া পালাইল। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল, একজন পথিক ক্রিস্তফ্‌কে থামাইল, সে কিছুই কথা বলিত পারিল না, শুধু বাড়িটা দেখাইল। লোকটি ভিতরে যাইতে ক্রিস্তফ্ তার পিছনে পিছনে গেল, তাহার চীৎ-কারে আশপাশের বাড়ির লোকেরাও আসিয়া জুটিল এবং বাগানটি লোকে ভরিয়া গেল। ফুলের গাছপালা ভাঙিয়া কত লোক বৃদ্ধকে দেখিতে আসিল, কেহ কেহ চীৎকার করিয়া ডাকিল, দু তিন জনে বৃদ্ধকে তুলিল, ক্রিস্তফ্ ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া তাহার হাতে মুখ লুকাইল। সে দৃশ্য দেখিতে তার ভীষণ আতঙ্ক! অথচ না দেখিয়াও থাকিতে পারিল না। আঙুলের ভিতর দিয়া সে একবার চকিতে দেখিল, বৃদ্ধের বিরাট দেহ কেমন যেন এলাইয়া পড়িয়াছে এবং সকলে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাঁর একটি হাত ঝুলিয়া মাটিতে ঠেকিতেছে; তাঁর মাথাটা একজন কোলে করিয়া ল্যাংচাইয়া চলিতেছে। বৃদ্ধের মুখ ক্ষত বিক্ষত, কাদা ও রক্তমাখা। মুখ ফুলিয়া আছে, চোখের দিকে চাহিলে ভয় করে! ক্রিস্তফ্ আবার চীৎকার করিয়া ছুটিল এবং বাড়ি না পৌছানো পর্য্যন্ত একবারও থামিল না, যেন তাহাকে কিসে তাড়া করিয়াছে। বিকট চীৎকার করিয়া সে একেবারে রান্না-ঘরে গিয়া হাজির হইল, লুইসা তরকারি কুটিতেছিল, ক্রিস্তফ্ তার বুকে আছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। কান্নার তোড়ে তার মুখ বিবর্ণ, সে কথা বলিতে পারিতেছিল না; কিন্তু প্রথম একটা কথাতেই লুইসা সব বুঝিল। তার হাত হইতে সব জিনিষপত্র পড়িয়া গেল, একটি কথাও না বলিয়া পাংশুবর্ণ মুখে সে ছুটিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

ক্রিস্তফ্ আলমারীর পাশে গুঁড়ি মারিয়া একা বাড়ীতে পড়িয়া রহিল; সে কাঁদিতেছে- ছোট ভাই-এরা খেলা করিতেছে; ঠিক কি হইয়াছে কেহই বুঝিতেছে না। ক্রিস্তফ্ দাদা মশাই-এর কথা ততটা ভাবে নাই যতটা ভাবিতেছিল সেই ভীষণ দৃশ্যটার কথা—এইমাত্র যাহা দেখিয়াছে—আবার যদি সেটা দেখিতে হয়!

সন্ধ্যা হইয়া আসিল বাড়ীর ছেলেরা যত রকম ছুটামী করিতে পারে সব সারিয়া শেষে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া

উঠিল। এমন সময় লুইসা ছুটিয়া প্রবেশ করিল এবং দাদামশাই-এর বাড়ীর দিকে ছেলেদের টানিয়া লইয়া গেল। লুইসা এত জোরে হাঁটিতেছিল যে, ক্রিস্তফের দুই ভাই ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু লুইসা এমন গলায় তাদের চুপ করিতে বলিল যে ছেলেরা থামিয়া গেল। আপনা হইতেই কেমন একটা ভয় ছেলেদের অভিভূত করিল; বাড়ীতে ঢুকিয়াই তারা কাঁদিয়া উঠিল; তখনও রাত্রি হয় নাই; সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকু বাড়ীর ভিতরে পড়িয়া—দরজার কড়া, আয়না, দেয়ালের উপর টাঙ্গান বেহালাখানা সব কেমন একটা অদ্ভুত আলো-আঁধারে যেন কেমন কেমন দেখাইতেছে। বৃদ্ধের ঘরে বাতি জ্বলিতেছে, সেই নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা পাংশুবর্ণ দিগন্তের আলোর সঙ্গে মিলিয়া সেই ঘরের অন্ধকারটা যেন আরও অসহ্য করিয়া তুলিয়াছিল। মেলশিয়র জানালার কাছে বসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। ডাক্তার বিছানার উপর ঝুঁকিয়া থাকায় তার উপর কি আছে দেখা যায় না; ক্রিস্তফের বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া ফাটিয়া যায় বুঝি। লুইসা ছেলেদের ধরিয়া বিছানার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসাইল। ক্রিস্তফ্ একটিবার সবটা দেখিয়া লইল; বিকালে যাহা দেখিয়াছে তাহার তুলনায় এ দৃশ্য তেমন কিছু নয় সুতরাং সে প্রায় খানিকটা আশ্বস্ত হইল; দাদামশাই স্থির হইয়া পড়িয়া আছেন যেন ঘুমে আচ্ছন্ন; একবার মনে হইল যেন বৃদ্ধ ভাল আছেন, সব বিপদ কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু যখন তাঁর শ্বাসের গভীর আওয়াজ কানে গেল, যখন সে ক্ষতবিক্ষত ফোলা মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিল ক্রিস্তফ্ বুঝিল মৃত্যু আসন্ন- সে কাঁপিতে লাগিল; লুইসা প্রার্থনা করিতেছে দাদামশাই সারিয়া উঠুন—ক্রিস্তফ্ও তাহাতে যোগ দিতেছিল কিন্তু মনে মনে বলিতেছিল যদি সারিতে না পারে তা হইলে শীঘ্র সব শেষ হওয়াই ভাল; আবার কি ঘটিবে সে কথা ভাবিতেও ভয়ে তার প্রাণ শুকাইয়া আসিতেছিল।

বাগানে পড়িয়া যাইবার পর হইতে বৃদ্ধের আর চৈতন্য হয় নাই। মাত্র একবার একটু সজাগ হইয়া শুধু বুঝিয়াছিল যে শেষ দশা! পুরোহিত আসিয়া শেষ প্রার্থনা করিতেছেন। সকলে ধরিয়া বৃদ্ধকে বালিসে ঠেস দিয়া তুলিল, ধীরে ধীরে তাঁর চোখ খুলিল কিন্তু চোখ আর যেন বাগ মানে না। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতেছে; বৃদ্ধ, আলো মানুষের মুখ এ সব যেন দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না; হঠাৎ একবার মুখ খুলিয়া গেল; কেমন একটা অজানা ভয়ে তাঁর সমস্ত মুখ যেন আচ্ছন্ন! হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি বলিলেন—

তা—হলে মরতে—যাচ্ছি!

তাঁর সেই ভয়াতুর কণ্ঠস্বর যেন ক্রিস্তফের বুকের ভিতর তীরের মত বিঁধিল। তার স্মৃতিপটে সে দৃশ্য চিরদিনের মত বসিয়া গেল; বৃদ্ধ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না; শুধু শিশুর মত গোঁঙাইতে লাগিলেন; আচ্ছন্ন ভাবটা বাড়িয়া চলিল, শ্বাসের কষ্টও বাড়িতেছিল, হাত পা ছুঁড়িয়া তিনি যেন কালনিদ্রার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন; অর্দ্ধচৈতন্যে বৃদ্ধ একবার শুধু ডাকিল— মা গো!

অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর সেই বৃদ্ধ শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মাকে ডাকিতেছেন! যে মা'র কথা সে কোনদিন বলেন নাই - মৃত্যুর সেই চরম ভয়ের মধ্যে শেষ আশ্রয়রূপে সেই মাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছেন—ক্রিস্তফ্ও এমনি করিত একথা ভাবিতেও ক্রিসতফ্ ·যেন অধীর হইয়া পড়িল। এ দিনের কথা সে কখন ভুলে নাই। বৃদ্ধ যেন ক্ষণিকের জন্য শান্ত হইলেন; চকিতে একবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল; তাঁর সেই ভারি চোখ এলোমেলো রকমে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রিস্তফের চোখের উপর পড়িল—সে ভয়ে যেন জমিয়া গেছে! বৃদ্ধের চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি যেন কথা বলিতে, একটু হাসিতে চেষ্টা করিলেন; লুইসা ক্রিস্তফ্কে ধরিয়া বৃদ্ধের পাশে লইয়া গেল, মিশেল শেষবার ঠোঁট নাড়িয়া ক্রিস্তফের মাথায় হাত দিয়া যেন আদর করিতে চেষ্টা করিলেন—তারপরই চরম বিস্মৃতি—সব শেষ!

ছেলেদের পাশের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু তাহাদের লইয়া কাহারো মাথা ঘামাইবার অবসর ছিল না। ক্রিস্তফ্ হঠাৎ ভয়ের মোহে আকৃষ্ট হইয়া দরজার ফাঁক দিয়া সব দেখিল; বালিশের উপর সেই বেদনা-কাতর মুখ —যেন কে গলা টিপিয়া মারিতেছে। দেখিতে দেখিতে চোখমুখ যেন বসিয়া গেল! কোন এক মহাশূন্যে যেন

প্রাণীটি তলাইয়া যাইতেছে আর কে যেন তাকে গ্রাস করিয়া লইতেছে, তারপর সেই ভীষণ গলার ঘড় ঘড় শব্দ। কলের মত নিঃশ্বাস পতন—যেন জলের ভিতর দিয়া বুদ্বুদ উঠার শব্দ—প্রাণ চলিয়া যাইতেছে তবু শরীরটার বাঁচিতে শেষ চেষ্টা! হঠাৎ মাথাটা একপেশে হইয়া বালিশের উপর পড়িল—তারপর সব নিস্তব্ধ!

* * *

মৃত্যুর পর প্রার্থনা ক্রন্দনাদির গোলমালের মধ্যে লুইসা হঠাৎ দেখিল ক্রিস্তফ্ নীল হইয়া হাঁফাইতেছে এবং দরজাটা ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। ছুটিয়া গিয়া ক্রিস্তফ্কে ধরিতেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। মা তাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন—ক্রিসতফ্ জাগিয়া দেখে সে শুইয়া আছে; তাহাকে একা ফেলিয়া গিয়াছে দেখিয়াই ক্রিস্তফ্ চীৎকার করিয়া আবার অজ্ঞান হইয়া গেল। সেই রাত্রি ও পরের দিন তার জ্বর চলিল; ক্রমশ শান্ত হইয়া পরের রাত্রে সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল—পরদিন দুপুর পর্য্যন্ত সে ঘুমাইল; সে অনুভব করিল কে যেন তার ঘরে চলিয়া বেড়াইতেছে, তার মা বিছনার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাকে চুম্বন করিতেছেন; ক্রিস্তফ্ যেন দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছে—কিন্তু নড়িতে পারিতেছে না, সে যেন স্বপ্নে আচ্ছন্ন!

আবার যখন চোখ খুলিল ক্রিস্তফ্ দেখে গড্ফ্রিড্ মামা তার বিছানায় বসিয়া আছে। শ্রান্তিতে ক্রিস্তফ্ যেন কিছুই মনে করিতে পারিল না; হঠাৎ স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে সে কাঁদিতে লাগিল। গড্ফ্রিড্ উঠিয়া তাকে চুম্বন করিয়া স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে বলিল—

কি হয়েছে রে বাচ্চা?

মামা মামা গো—ক্রিস্তফ্ আর কিছু বলিতে পারিল না, শুধু কাঁদিতে কাঁদিতে গড্ফ্রিড্কে জড়াইয়া ধরিল।

আচ্ছা কাঁদ্…খানিক কেঁদে নে—গড্ফ্রিডের নিজের চোখ দিয়াও জল পড়িতেছিল।

একটু শান্ত হইয়া ক্রিস্তফ্ চোখ মুছিয়া মামার দিকে চাহিল—মামা বুঝিল সে কিছু প্রশ্ন করিতে চায়।

না—ঠোঁটে আঙুল দিয়া মামা বলিল—না, কথা বলা বারণ; কাঁদা ভাল কথা বলা ঠিক নয়;—কিন্তু ক্রিস্তফ্ জেদ করিতে লাগিল।

মামা বলিল, ওরে কথা বলে কোন লাভ নেই।

শুধু একটা কথা বল্‌ব মামা।

কি?

ক্রিস্তফ্ একটু ইতস্তত করিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল—

মামা গো, দাদামশাই কোথায় গেল্?

ভগবানের কাছে গিয়েছেন।

কিন্তু ক্রিস্তফের প্রশ্ন মোটেই এদিকে যায় নাই—

মামা, তুমি বুঝতে পার নি—দাদামশাই—সেই মানুষ—কোথায় গেল?

আবেগে ক্রিস্তফের গলা কাঁপিতে ছিল, সে বলিয়া উঠিল—

এখনও কি বাড়ীতে আছে?

না—আজ সকালে তাঁর সমাধি হয়েছে—ঘণ্টার আওয়াজ শুনিস্ নি?

ক্রিস্তফ্ যেন একটু শান্তি বোধ করিল; পরক্ষণেই যখন মনে পড়িল তার চিরআদরের দাদামশাইকে সে আর দেখিতে পাইবে না—ক্রিস্তফ্ কাঁদিয়া অধীর হইল।

গড্ফ্রিড্ অকরুণ ভাবে তার দিকে চাহিয়া আপন মনে শুধু বলিল, বাচ্চাটা বড় কষ্ট পাচ্ছে।

ক্রিস্তফ্ আশা করিয়াছিল, মামা তাকে সান্ত্বনা দিবে কিন্তু সেটা নিরর্থক জানিয়া গড্ফ্রিড্ চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ ক্রিস্তফ্ প্রশ্ন করিল—

মামা, ঐ জিনিষটাকে তোমার ভয় করে না?

ক্রিস্তফ্ খুব আশা করিয়াছিল যে, মামা বলিবে তার কোন ভয় নাই এবং সেই নির্ভয়তার রহস্যটা তার কাছে উদ্ঘাটিত করিবে, কিন্তু মামা কেমন যেন কম্পিত কণ্ঠে বলিল—

চুপ! ঐ ভয়টা ঠেকায় কে? কিন্তু তবু আমরা কি করতে পারি বল্? এমনই চিরকাল ঘটে আসছে—আমাদের সহ্য করে যাওয়া ছাড়া গতি কি?

বিদ্রোহের বশে ক্রিস্তফ্ মাথা নাড়িল।

এটা সয়ে যেতেই হবে রে! এ যে তাঁর বিধান - তাঁর আদেশকে মান্য করতে, ভালবাসতে শিখতে হবে।

কিন্তু ক্রিস্‌তফ্‌ রাগে আকাশের দিকে ঘুসি দেখাইয়া বলিল—

তোমার ঐ ভগবানকে আমি ঘৃণা করি!

গড্‌ফ্রিড্‌ সভয়ে তাকে চুপ করিতে বলিল। ক্রিসতফ্‌ও যে কথা বলিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে ভয় পাইয়া মামার সঙ্গে প্রার্থনা জুড়িয়া দিল; কিন্তু তার বুকের ভিতর রক্ত যেন ফুটিতেছিল; যতই সে বিনয় ও আত্মনিবেদনের দাস্যভাব-মাখা কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছিল তার মর্ম্মস্থলে ভীষণ একটা বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল—কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? ঐ যে জঘন্য জিনিষটা—মৃত্যুভয়! এবং যে নিষ্ঠুর দানব সেটা সৃষ্টি করিয়াছে — . . .

—ক্রমশ

আঁধারের যাত্রী

[শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত]

চারিদিকে ধূ ধূ রাতি, সৃজনের অন্ধকার রাশি,
জোনাকীর মত প্রাণ তার মাঝে চলিছে উদাসী!
পত্রগুচ্ছে যেটুকু নিশীথ,
যে খণ্ড আঁধারটুকু,—যে তুষার শীত,
তারি বুকে ঢালি তাপ, জ্বালি আমি শিখা,
অনন্ত শর্ব্বরী দূরে ছড়ায়েছে বাধা-বিভীষিকা!
কোন্ দূর অলক্ষ্যের পানে
স্পন্দহীন প্রেতপুরে,—শোকের শ্মশানে,
মূক তরুচ্ছায়াতলে, নিঃশব্দ গহ্বরে
কলহীন তটিনীর তরঙ্গের পরে,
ছুটিয়া যেতেছে মোর সচকিত প্রাণ,
মৌন অভিযান!
আমার এ কণ্ঠপ্রবক্ষে তৃপ্তিহীন বিচ্ছুরণ জ্বলে;
দূরে দূরে দিগন্তের তলে
ছুটে যাই দিশাহারা, আকুল, চঞ্চল,
কেঁদে ওঠে বিটপীর ভগ্নশাখা, বনানীর পল্লব-অঞ্চল!

বালুকা-সৈকতে বাজে তটিনীর গান
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ!
সৃজনপুলিনে বসি মায়াবীর বেশে
অন্তহীন ইন্দ্রজাল রচিতেছে কে সে!
কোথা তব গুপ্ত কক্ষ,—রহস্যের দ্বার
ওগো অন্ধকার!
হে অচল রুদ্ধ আয়তন
বিজন গোপন!
তমিস্রার উর্ম্মিরাশি—দুশ্চর, দুস্তর,
চিররাত্রি,—তার মাঝে আমি নিশাচর!
নিষ্প্রভ এ চোখে মোর পশে না ক' নক্ষত্রের শিখা,
দীপহীন অমাতটে নাচে একা প্রাণ খদ্যোতিকা!
প্রান্তরের পারে জ্বলে অলীক আলেয়া,
তার মাঝে মোর এই নিশীথের খেয়া
চলে একা ভেসে',
স্বপ্নাবিষ্টা মৌন অভিসারিকার বেশে!

ডাকঘর

এবারকার প্রথম কবিতাটি কবি তাঁহার জন্মতিথিতে লিখিয়াছেন। কল্লোলের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ। অনুমতি চাহিবামাত্রই কল্লোলে প্রকাশ করিতে সম্মতি দিয়াছেন। এই কবিতাতে মনের যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে. জন্মতিথির উৎসবেও কবি তাঁহার মনের সেই কথাই বলিয়াছেন।

———

বোলপুর শান্তিনিকেতনে ২৫এ বৈশাখ কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে উৎসব হয়। শনিবার উৎসবের দিন। শুক্রবার রাত্রি আটটার সময়ও আমরা কল্লোল আপিসে কাজ করিতেছিলাম। হঠাৎ এক বন্ধু বোলপুর যাইবার কথা তুলিলেন। যাওয়া হইতে পারে না বলিয়াই মনকে বুঝাইয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু বন্ধুগণের আগ্রহে রাত্রি দশটার ট্রেনে কলম ছাড়িয়া তীর্থযাত্রা করিলাম। আমরা শনিবার সকালে যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছিলাম তখন অভিষেক উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কবি বসিয়াছেন চাঁদোয়ার তলে একটি অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি বেদীর উপরে। সম্মুখে শ্বেত পদ্ম ও নানা পুষ্প-অর্ঘ্য সাজান। ধূপ-ধূনোর সুগন্ধে সভাস্থল প্রভাত বাতাসে সুরভিত। কবির দক্ষিণ পার্শ্বে বৃত্তাকারে মহিলারা বসিয়াছেন, অন্য পার্শ্বে পুরুষ অভ্যাগত ও আশ্রমবাসীগণ। কবির সম্মুখে গায়ক ও বাদক স্তোত্র গান করিতেছেন। মণ্ডপের শেষ ভাগে ফরাসী, ইটালীয় রাজদূত ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় অতিথি পুরুষ ও মহিলাবৃন্দ। বড় বড় আম গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে প্রভাত সূর্য্যের নবারুণ স্বর্ণসূত্রের মত আকাশ ও মাটিকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

আশ্রমের আচার্য্য ও শিষ্য এবং শিষ্যাগণ গুরুর বন্দনা ও তাঁহাকে ধান্য দূর্ব্বা ও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিলে অভ্যাগতবর্গ কবিকে নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিস্বরূপ সম্ভাষণ জানাইলেন।

কবি তাহার পর সকলকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া জন্মোৎসবে তাঁহার নিজের কথা বলিলেন। এক-স্থানে তিনি বলিলেন, পরিবারে শিশু জন্মগ্রহণ করিলে আত্মীয়গণ তাহাকে প্রীতি ও আনন্দ দ্বারা জগতের নব-শিশুর জন্ম বলিয়া বরণ করিয়া লয়। প্রত্যেকের মনে যে কল্পনা ও আদর্শের মানুষের একটি চিত্র অঙ্কিত থাকে, মানুষ আশা করে এই নবজাত শিশুর মধ্যেই তাহার বিকাশ দেখিবে। তাই শিশুকে এমনি ভাবে অভিবাদন করে। আমারও জন্মদিনে আপনারা আপনাদের মনের সেই সর্ব্ব গুণান্বিত আদর্শ কবি ও আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন বলিয়া আমাকে এত প্রীতির অর্ঘ্য ও সমাদরের সম্ভার দিয়া কৃতার্থ করিতেছেন। এত শ্রদ্ধা ও প্রীতি পৃথিবীর সেই কবিরই প্রাপ্য, যে কবি আপনাদের মনে অহর্নিশ ধ্যানে, জ্ঞানে ও কল্পনায় রূপ ধরিয়া যুগযুগান্তর অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি হয় ত পৃথিবীর এই সকল প্রাহ্য বস্তুকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, কিন্তু আমার কবি-মনের মৃত্যু নাই। আমি বারে বারেই মানুষের আকাঙ্ক্ষায় নবশিশুর মতই জন্মলাভ করিব। আমার শৈশবে যে প্রকৃতির বিচিত্রতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই বিচিত্রতাই আজও আমাকে তাহাদের সঙ্গে সেই শিশু-মন লইয়া ক্রীড়া করিতে ডাকে। গানে গানে যে কবি মরণকে বরণ করিয়াছে, সে কবির মৃত্যু নাই—নব নব জন্মে সে কবি অমরত্ব লাভ করিতেছে।

কবির সুন্দর অভিভাষণটির পর সভা ভঙ্গ হয়। নানা-বিধ ফল, মিষ্ট ও পানীয় দ্বারা অতিথি ও আশ্রমবাসীদিগকে জলযোগ করান হয়। তার পর সকলে মিলিয়া কলাভবন পাঠাগার প্রভৃতি দেখিতে বাহির হন। দুপুরে প্রায় বারো-টার সময় মধ্যাহ্ন ভোজনের ডাক পড়ে। প্রায় তিনশত লোক এক সঙ্গে আহারে বসেন।

মধ্যাহ্নে সকলে বিশ্রামার্থ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কুটীর ও গৃহে যান। বৈকালে চা, সরবৎ ও মিষ্টান্ন দ্বারা জলখাবার দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় কবির গৃহে অভিনয় আরম্ভ হয়। আশ্রমের শিষ্যাগণই এই অভিনয়টি করেন। কবির নূতন নাটিকা—"নটীর পূজা"—অভিনীত হয়।

দেশের রাণী বৌদ্ধ ধর্ম্মকে দেশে আনিলেন ? কিন্তু

তাঁহারই প্রাণপ্রতিম পুত্র চিত্রসেন যখন ভিক্ষু হইয়া গেল তখন রাণীর সেই মর্ম্মন্তুদ বেদনা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ঈর্ষায় পরিণত হইল। কিন্তু প্রাণগত ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাকে বিপথে যাইতে দিল না। নটী শ্রীমতী যখন শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে, রাণীর কণ্ঠ আপনি বিদ্বেষ ভুলিয়া সেই মন্ত্রে যোগ দিতেছে। বেদনা তাঁহার অসীম কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস তাহাকেও ছাপাইয়া চলিয়াছে। মালতী গ্রাম্য বালিকা—নটীর কাছে আসিল আশ্রয় লইতে। যুবরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে তাহার প্রণয়—যুবরাজ ভিক্ষুর বেশে তাহাকে দেখা দিয়াছিলেন—তাহাকে বলিয়া গেলেন, তাঁহাদের মিলন হইবে নির্ব্বান-তীর্থে। মালতী নটীর সঙ্গে গান গায়, শ্রীবুদ্ধের পূজা করে।

রাজকন্যাগণের বিদ্বেষের জ্বালা নটীকে অপমান করে। বুদ্ধস্তূপ ধ্বংস করিবার আদেশ হয়। সেই ধ্বংসলীলার মধ্যে নটীর সেই সকরুণ বুদ্ধের মহিমা গীত অশ্রুধারার মত ঝরিয়া পড়ে।

রাজকন্যাগণ স্থির করেন, নটীকে বুদ্ধের মূর্ত্তি সমক্ষে নর্ত্তকীর বেশে নাচিয়া পূজা দিতে হইবে। নটী শ্রীবুদ্ধের শরণাপন্ন হয়। এবং সকল অপমান অব্যাহত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। বুদ্ধে শরণাগতা, বুদ্ধে সমাহিতা নর্ত্তকী তাহার প্রাণের সকল জ্বালা ও বেদনা নৃত্যের ছন্দে মূর্ত্ত করিয়া তোলে। সেই অপরূপ লীলা ও ভঙ্গী নটীকে নবজীবন দান করে। ধীরে ধীরে সে আপন বসন ও অলঙ্কার নৃত্যের গতির সঙ্গে আপন অঙ্গ হইতে বিমুক্ত করিতে থাকে। রাণী আসিয়া সে দিন সেই মুহূর্ত্তে বুদ্ধের জয়গাথাতে সকল ভুলিয়া যোগ দেন। পুরনারীরা স্তম্ভিত হইয়া ধর্ম্মের মহিমা অবলোকন করে। নটী মৃত্যুর নৃত্যে উন্মাদ, পুর-প্রহরী তাহার বক্ষে অনিচ্ছায় আদেশক্রমে ছোরা বসাইয়া দেয়। নটী দেহমুক্ত হইয়া শ্রীবুদ্ধে শরণ লয়।

নটীর ভূমিকায় আমাদের বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী গৌরী আশ্চর্য্য প্রতিভা ও ভাবের অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। নৃত্যে তিনি অপূর্ব্বভঙ্গী ও পেলবতা দেখাইয়াছেন। কবি আমাদের বলিয়াছেন, তিনি শ্রীমতী গৌরীকে কিছুই শেখান নাই। তাঁহার বাক্যাংশ, গীত ও নৃত্য তিনি আপন মনেই পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রাণ ঢালিয়া তাহাই আপন ক্ষমতা দ্বারা দর্শকদের বিমুগ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমতী মালতী রাণীর অংশে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছেন। দুঃখ, ঈর্ষা, ও ধর্ম্মানুরাগের বিপুল সংঘর্ষ তিনি আশ্চর্য্যরূপে অভিনয় করিয়াছেন।

মালতীর অংশেও কন্যাটিও অতি স্থির ধীর সংযত অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার বিরহ, তাঁহার মনোদুঃখ তিনি অতিশয় নিরাকুল ভাবেই সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার গীত ও দৃষ্টির স্নিগ্ধতা বর্ষার সিক্ত কামিনী পুষ্পের গুচ্ছের মতই পবিত্র ও অনাবিল।

অন্যান্য মহিলারাও প্রত্যেকে তাঁহাদের নিজেদের অংশ নিরুপম সৌন্দর্য্য ও অনুভূতির সহিত অভিনয় করিয়াছেন।

বিশেষ করিয়া সকলের সাজ সজ্জা সুন্দর ও বড়ই শোভন মনে হইল। কোথাও যেন কষ্ট-চেষ্টা নাই, অতি স্বাভাবিক অথচ অংশোপযোগী। অভিনয় শেষে রাত্রে আহারাদির পর আশ্রম সম্পর্কীয় কার্য্যাদির চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইল।

কবির সঙ্গে আজকালকার মাসিক পত্রিকা প্রভৃতির বিষয়ে একটু আলাপ হইল। কল্লোলের কয়েকজন লেখক ছাড়িয়া গিয়াছে, বুঝিলাম তাহা তিনি জানেন। বলিলেন, থিয়েটারেই ত এমন হয়, আজকাল সাহিত্যেও এ রকম আরম্ভ হয়েছে! আমার কোনও মন্তব্যই অনাবশ্যক মনে করিয়া আমি সে কথা ফিরাইয়া অন্য কথা পাড়িলাম। বর্ত্তমানের নবীন লেখকদের সম্বন্ধে কবির মনে কোনও ছোট ধারণা হয় তাহা আমি ইচ্ছা করি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য, কবি কল্লোল পড়িয়া বেশ লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছেন, কে কে লিখিত, এখন কে কে আর লেখে না।

আমি যাইবামাত্রই তিনি সে কথা নিজে উল্লেখ করিলেন। দেখিলাম এই উৎসবের গোলমালের মধ্যেই বৈশাখের কল্লোল পড়িয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পুরাতন কবিতাটি ছাপা হইয়াছে এবং তাহার কারণ পড়িয়াছেন বলিলেন। খুব সাহস দিলেন, অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত কল্লোলের শুভকামনা করিলেন। বলিলেন, দেখ কতদিন চালাতে পার। যতদিন চালাবে ততটুকুই এর দাম।

ভাল জিনিষ চালান শক্ত, তাই অল্পদিন থাকলেও তাতে দুঃখ করবার কিছু নাই।

কবির আশীর্ব্বাদ লইয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

বিগত ৩-রা ও ৪-ঠা এপ্রিল কানপুরে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ থাকাতে কবি শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

লক্ষ্ণৌ, কাশী, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, বরাবাঁকী, ইন্দোর আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন।

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সাহিত্য-সম্মিলন কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

১। এই সম্মিলন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতেছে।

২। এই সম্মিলন দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করিতেছে।

৩। এই সম্মিলন প্রবীণ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করিতেছে।

৪। এই সম্মিলন সাহিত্যরসিক মহারাজা জগদিন্দ্র-নাথের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে।

৫। এই সম্মিলন সেবাব্রত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিতেছে।

৬। এই সম্মিলন কানপুরের কর্ম্মী ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরলোক গমনে শোকপ্রকাশ করিতেছে।

৭। এই সম্মিলন উদীয়মান সাহিত্যিক গোকুলচন্দ্র নাগ, সুকুমার ভাদুড়ী ও বিজয়চন্দ্র সেন মহাশয়গণের অকাল-মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতেছে।

৮। এই সম্মিলন বঙ্গের কৃতিসন্তান স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের পরলোক গমনে শোকপ্রকাশ করিতেছে।

৯। এই সম্মিলন সেবানিরতা সাহিত্যানুরাগিণী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে।

সভায় প্রায় ১৯-টি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। সন্ধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিবর্গকে অভিনন্দন দেওয়া হয়।

কল্লোলে 'শরৎচন্দ্র' ও 'স্মৃতির আলো' এই দুইটি বিষয়ের লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এ তাবৎকাল নানা প্রকার বিপদ ও অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াও কল্লোলের পাঠকবর্গকে তাঁহার লেখা দিয়া আসিতেছেন। কি অবস্থার ভিতরে তিনি নিয়মিত লেখা দিয়াছেন তাহা পাঠকগণ জানেন না। এবারে নিতান্ত দুর্ঘটনার জন্য লেখা দিতে পারিলেন। তাঁহার নিজের হাতে বহুকাল অবধি অসহ্য একটা বেদনা আছে। অল্প দিন হয় তাঁহার স্ত্রী বিশেষ পীড়িতা। সুরেনবাবু ভাগলপুর ছাড়িয়া নিজের নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুটীরটুকুতে আশ্রয় লইয়াছেন। পল্লীর নির্জ্জনতার ভিতরেই কায়ক্লেশে দিন কাটাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আশা করি, পাঠকগণ তাঁহার বিপদে সহানুভূতি দেখাইবেন। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, একটু সুবিধা পাইলেই লেখা পাঠাইয়া দিবেন। আশা করা যায়, আষাঢ়ে তাঁহার লেখা পাইব।

লেখকগণের প্রতি আমাদের কয়েকটি নিবেদন আছে।

কল্লোলে নানাবিধ রচনার সমাবেশ করিতে হয়। অথচ কল্লোলের অবয়ব বর্ত্তমানে যেরূপ আছে তাহা হইতে বড় করাও আপাতত সম্ভব নয়।

এইজন্য দীর্ঘ প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতা ছাপিতে আমাদের অসুবিধা হয়। লেখকগণ তাঁহাদের রচনায় এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বাধিত হইব।

অনেক লেখক রচনার সঙ্গে ডাকটিকিট না দিয়া পরে একখানি পোষ্টকার্ড উত্তরের জন্য পাঠান। তাহাতে রচনা ফেরত দেওয়া চলে না এবং টিকেট না থাকায় অমনোনীত রচনা রাখা হয় না বলিয়া এতদিন পরে তাহা ফেরত দেওয়াও সুবিধা হয় না। এইজন্য রচনার সঙ্গে টিকেট দেওয়াই ভাল।

অনেক লেখা হাতে জমা থাকে, সেগুলি সুবিধা অনুসারে ছাপিবার জন্যই রাখা হয়। কিন্তু অনেক লেখা এইভাবে

ছাপিতে বড় বিলম্ব হইয়া যায়। লেখকগণ হয় ত মনে করেন, আমরা ইচ্ছা করিয়াই কোনও বিশেষ রচনা ছাপিতেছি না। তাই আমাদের অনুরোধ, প্রকাশে বিলম্বের জন্য কোনও লেখক তাঁহার লেখা ফেরত চাহিলে তাহা অবিলম্বে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ফেরত দিব।

আজকাল সব গল্পগুলিই প্রায় একধরণের আসে। কারখানা ও খনির কুলীদের ঘটনা লইয়া গল্প লেখা এখন সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক গল্পে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব দেখা যায়। আর একরকম বস্তির গল্প—এরূপ একটা পেয়ালা, কাদা ভরা ময়লা রাস্তা, একটা কেরাসিনের ডিবরী, একখানা ছেঁড়া চাটাই—গল্পের ছবির আসবাব—তারপর চরিত্রগুলি নিছক কল্পনা! দেখা শোনা আছে বলিয়া গল্প পড়িয়া মনে হয় না। গল্পে তাই নূতন কথা কিছু বলিবার থাকে না। মামুলী প্রেমের গল্পের ত অভাবই নাই। তাহাতে বিশেষত্ব বা নূতন দৃষ্টির ফল কিছু থাকে না বলিয়াই গল্পগুলি মামুলী মনে হয়।

সকলেরই লেখক হইতে ইচ্ছা, এ সকল লেখার দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয়। কিন্তু লেখক হইতে যে সাধনা, অভিজ্ঞতা ও আত্মবিচারের প্রয়োজন তাহা এড়াইয়া লেখক হওয়া অসম্ভব। অনেক 'মক্স' করিয়া যাঁরা বড় লেখক তাঁহারা আজ লেখকের সম্মান পাইতেছেন।

নূতন লেখকদের মধ্যে আর একটি জিনিষের অভাব দেখি। সেটি বিনয়। বড়র প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইতে না পারে, গুণের প্রতি যে সম্মান দেখাইতে না পারে, সে নিজে কখনও বড় হইতে পারে না।

দু' চারটি লেখা কোনও সাময়িক কাগজে ছাপা হইলেই যে লেখক-হিসাবে পরিগণিত হইলাম, এরূপ ধারণা শিক্ষা ও উন্নতির পক্ষে বিষম বাধা।

ভাল লেখক হওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য - লেখক খ্যাতি ছাপার অক্ষরের সাহায্যে অনায়াসে লাভ করিবার প্রয়াস অত্যন্ত বিড়ম্বনা। তাহাতে লেখক বা লেখা দীর্ঘকাল মানুষের মনে স্থান পায় না। যেমন সহজে লেখকখ্যাতি অর্জ্জন করা হয় তাহা হইতেও সহজে সে খ্যাতি নষ্ট হইয়া যায়।

আমরা আশা করি, কল্লোলে এবার হইতে খুব ভাল ভাল গল্প ও অন্যান্য লেখা পাইব। এবং লেখকগণ মনে রাখিবেন, লেখা দীর্ঘ হইলে আমাদের ছাপিতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়।

নূতন গ্রাহকগণ তিন টাকা মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলে গত বৎসরের কল্লোল বিনা মাশুলে সম্পূর্ণ সেট পাইবেন।

সেতুবন্ধ

শ্রীউমা মিত্র

আমি যখন গেজেটে আমার নাম দেখতে পেলাম না তখন আমার মনটি দমে গেল। সমস্ত রঙিন কল্পনাগুলি ঝরা-ফুলের মত খসে খসে পড়ে গেল। এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমি ভাবি নি যে, এক্জামিনে ফেল করব। টেবিলের উপর মাথাটি রেখে আমি ভাবতে লাগলাম। চোখ দিয়ে দু এক ফোটা জলও গড়িয়ে পড়ল। এই হোষ্টেলের ছেলে যারা পাস করেছে তাদের কি বুকভরা আনন্দ!

দিনগুলি কাটছে বড় করুণ ভাবে; যেন কোন এক আহত পাখীর চোখের দৃষ্টির মত। সর্ব্বদাই বুকে অশান্তি নিয়ে বসে থাকি। কি যে করব কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারি না। এক একবার ভাবি, দূর হকৃগে, যাক আর পড়ে কি হবে! আবার পরক্ষণেই ভাবি, না পড়েই বা কি উন্নতি করতে পারব? ঠিক সেই সময় সুনীলার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলাম। সে লিখেছে—"মানুষের সহ্য করবার ক্ষমতা আছে বলেই, তারা এত দুঃখ কষ্ট পায়। তারা যদি এই দুঃখ কষ্ট ভ্রূক্ষেপ না করে' কাজ করে যেতে পারে তবেই তারা পরে উন্নতি করতে পারে। তাই আমি বলি, তুমিও সেই পথের পথিক হবে। আর

তুমি একবার এখানে এসো, দিদিমণি তোমায় ডেকেছেন।

এই কথা কয়েকটি পড়ে প্রাণে একটা আঘাত পেলাম। কিছুক্ষণ সেই পত্রের উপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবতে লাগলাম—এই সুনীলা জীবনে কতই না কষ্ট পেয়েছে। ছেলেবেলায় তার বিয়ে হয়েছিল। তারপর যখন সে সংসারের সমস্ত জিনিষ বুঝতে পারলে, ভালবাসা জিনিষটি কি তার প্রাণের মধ্যে বয়ে গেল তখন তার সমস্ত আশা ভরসা শিউলির মত ঝরে গেল। তার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করলে কুপথে গিয়ে। তারপর সে আশ্রয় নিলে আমার বৌদিমণির কাছে, তার দিদিমণির নিকট।

সেই হতেই সে আমাদের সংসারে আছে। ছোট-খাটো কাজ নিয়েই সে তার ব্যথাভরা দিনগুলি অতি কষ্টে কাটিয়ে দিচ্ছে।

সেদিন ভাদরের ব্যথাতুর আকাশ কাঁদছিল। সেই জলে ভিজতে ভিজতে আমি এসে পৌছালাম বাঙলা মায়ের শান্তিগ্রামে। যখন আমি বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালাম তখন আমার গায়ের কাপড় চোপড় সব ভিজে সপ্ সপ্ করছে। আমি নীচের বারান্দায় ঢুকে 'বৌদি' বলে ডাকলাম। বৌদি বোধ হয় উপরে ছিলেন, আমার স্বর শুন্‌তে পেয়ে ছুটে এলেন আর তার পিছনে এসে দাঁড়াল সুনীলা। একটু থেকেই সে সেখান হতে ছুটে চলে গেল। বৌদি বল্লেন, এই জলে কখনও ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে আসে, একটু কোথাও দাঁড়াতে নেই! কাপড়টা এনে দি ছেড়ে ফেল। পিছন ফিরতেই সাম্‌নে সুনীলার হাতে কাপড় দেখে তাঁর আর যাওয়া হল না। সুনীলা আমার হাতে কাপড় দিয়ে হেসে বল্লে, আচ্ছা ত পাগল!

আমি তার হাত থেকে কাপড় নিয়ে চলে গেলাম। ভাবতে লাগলাম—কেন ভগবান মানুষকে এত কষ্ট দেয়!

রাত্রি এল। আমার অশান্ত হৃদয় কিছুতেই শান্ত হোল না। কিসের একটি অভাব আমি যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করছিলাম। সত্যি করে যে সে জিনিষটি কি, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ ধরে খোলা-জান্‌লার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম।

সুনীলা এল; হাতে তার খাবার ও চা। আমি যখন চায়ে শেষ চুমুক দিলাম তখন সুনীলা বলে উঠ্‌ল, আচ্ছা অমর-দা তোমার সে দিন যে কবিতাটি বেরুল, কৈ একবার ত দেখালে না? কেবল খবরই দিয়েছিলে।

আমি বল্লাম, দেখ সুনীলা, প্রথম্ প্রথম ঐ জিনিষটি খুবই ভাল লাগে কিন্তু কিছু দিন পরে আর তত উৎসাহ থাকে না। তখন ক্রমশ ভাঁটা পড়ে যায়, বিশেষত আমাদের মত লোকের। আগে এ দিকে উৎসাহ ছিল। তখন মনে করতাম, আমি একজন কি না কি হব। এখন দেখছি, আমি বোধ হয় সাহিত্যিক ক্ষেত্রে স্থানই পাব না। দিন দিন আমার মনের ভাব অন্যদিক দিয়ে যাচ্ছে। এদিকে আর ঘেঁসতেই চায় না।

সুনীলা আর কিছু উত্তর দিলে না। সে তার সুন্দর গ্রীবাটিকে বাঁকিয়ে নিজের আঙুলে আঁচলের প্রান্তটি জড়াতে লাগ্‌ল। ভাঙ্গা মেঘের পাশ হতে করুণ আঁখির দৃষ্টির মত চাঁদের ক্ষীণ কিরণ ঘরের মেঝের উপর এসে পড়ছে। এক ঝলক মিঠা বাতাস সুনীলার ললাটের উপর গুচ্ছ কেশগুলিকে দুলিয়ে দিলে আর আমার প্রাণের মধ্যে কিসের প্রবাহ বয়ে গেল। আমি নিশ্চল নিস্তব্ধ বক্ষে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমি তখন বুঝ্‌লাম, সুনীলা এখনও আশা পরিত্যাগ করতে পারে নি। তার মনের কোণে এখনও একটু স্থান রেখেছে তার স্বামীর জন্য। সে তাই ভগবানের নিকট বার বার প্রার্থনা করে, যেন সে তার স্বামীকে তেমনি ভাবে ফিরে পায়।

সুনীলার সঙ্গে অনেক কথা হোল। সে কথায় মাঝে মাঝে আঘাতও করেছি, সেও আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করতে চেষ্টা করেছে। শেষে যখন আমার সুটকেস্ খুলতে গিয়ে তারই হাতের তৈরী রুমালখানা বেরিয়ে পড়ল তখন তার মুখের চেহারা বদ্‌লে গেল।

কোথায় পেলাম রুমালখানা জিজ্ঞাসা করাতে আমি যখন বল্লাম, কিনেছি, তখন সে আরও ক্ষুব্ধ হোল।

সে এত কষ্ট পাবে তা' আমি জানতাম না, কিন্তু আঘাত সে আপনি ডেকে এনে যেন গ্রহণ করল।

সুনীলার চোখ ছলছলিয়ে উঠ্‌ল। ঠিক সেই সময় বৌদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বল্লে, কি হয়েচে রে সোনা?

সুনীলা বৌদিমণিকে দেখেই কেঁদে ফেল্লে। আমি তার কান্না দেখে বুকে বড় আঘাত পেলাম। তার সেই ভাঙাবুকে কেন আমি আঘাত দিলাম? কেন আমার তাকে এমনি করে আঘাত দিতে বড় ভাল লাগে?

বৌদিমণির সঙ্গে যখন সুনীলা চলে যাচ্ছে তখন সে তার বড় বড় কালো চোখ দুটো আমার দিকে ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতের মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেল।

প্রাতে যখন ঘুম থেকে উঠ্‌লাম, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা; কারণ সমস্ত রাত ধরে জ্বরের যন্ত্রণায় ছটফট করতে হয়েছিল। বিছানা হতে ধীরে ধীরে উঠে আমার জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিচ্ছি এমন সময় সুনীলা চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে বল্লে, অমর দা, চা খাও! সকালে উঠেই ওসব আবার কি হচ্ছে?

আমি বল্লাম, আমি আর এখন চা খাব না। আমায় এখুনি কলকাতায় যেতে হবে, বড় দরকার।

সুনীলা কিছু না বলে আস্তে আস্তে ঘর হতে বেরিয়ে গেল। আমি জামা কাপড় পরে জুতো পরছি সেই সময় বৌদিমণি এসে বল্লেন, এ কি অমর, তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

কলকাতায় বড় দরকার আছে।

কৈ কাল ত কিছু বল্লে না! তাহ'লে আমি সমস্ত জোগাড় করে রাখ্‌তাম। নিশ্চয়ই তোমার মনে কিছু হয়েচে! কি হয়েচে ভাই? এ কি? তোমার গা এত গরম কেন? জ্বর হয়েচে নাকি?

আমি আমার ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, মাথা ঘুরে উঠ্‌ল, সমস্ত অন্ধকার দেখতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল যেন এক্ষুনি আমি পড়ে যাব,—তাই তাড়াতাড়ি বসে পড়ে বল্লাম, না বৌদি, আর আমার যাওয়া হবে না। তুমি কেন আমার এমন করে বাধা দিলে?

বৌদিমণি আমাকে ছেলের মত জড়িয়ে ধরে বল্লে, ছি ভাই! শেষকালে এমনি করেই কি বোনটিকে আঘাত দিতে হয়? এত দিনের সঞ্চিত ভালবাসা কেবল দুটি কথায় সব শেষ হয়ে যাবে! নিজের ছেলের মত দেখেছিলাম তার বুঝি এই প্রতিদান! মনে বড় আঘাত পেলাম অমর। তুমি এ রকম করে যে আমায় আঘাত করবে তা আমি জীবনে কখনও ভাবি নি। অমর, ভাই! মনে প'ড়ে ছেলেবেলাকার কথা? সেই ছোট্ট ভাইটি হয়ে তুমি আজ কি করলে?

বৌদিমণির চোখে জল দেখে বড় আঘাত পেলাম। ভাবলাম, আমার জীবনটাই কি কেবল পরকে আঘাত দেবার জন্যে হয়েচে! তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বল্লাম, দেখ বৌদি, ছোট ভাইটিকে কি ক্ষমা করতে নেই। তোমাদের মনটি যে কি' দিয়ে তৈরি—তা বলতে পারি না। একটুতেই কতখানি না কষ্ট পেলে। যাক, একটু জল দাও, বড় কষ্ট হচ্ছে।

জল খেয়ে সেই যে বিছানায় গিয়ে শুয়েছিলাম তারপর আর কোনই জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান হল তখন অনুভব করলাম আমার মাথার শিয়রে কে বসে। মনে করছিলাম, যার প্রাণে মমতা নেই, যার মনে দরদ বলে কিছু নেই, তাকে কেন এ আদর! মাথাটি যেমন কোলের কাছ হতে সরিয়ে নিতে যাব সেই সময় বৌদিমণি বলে উঠ্‌ল, অমর, বড় কি কষ্ট হচ্ছে ভাই?

আমার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হোলাম। এত কষ্টের উপর তাকে কেন আমার মনে বার বার জেগে ওঠে। যতই ভাবি সুনীলার সঙ্গে আর কোন আমার সম্বন্ধ থাকবে না, তাকে আর মনের কোণে স্থান দেব না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার তারই বিষয় চিন্তা করতে বসি। কেন, কেন তাকে আমার বার বার মনে পড়ে! বল্লাম, না বৌদি, তেমন কিছু কষ্ট হয় নি। তবে বুকটায় বড় ব্যথা হয়েচে। মনে হয় আরো কিছু রক্ত উঠল; এগিয়ে যেতে পারব। এ রোগ অনেক দিন হয়েছে।

অনেক দিন? কেন আমাদের বল নি?

বৌদিমণি ব্যথিত স্বরে বল্লেন, ও কি, কাঁদছ? কেন ভাই, তুমি ওসমস্ত মনে করে জীবনের উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছ।

তারপর তাঁর স্নেহের আঁচল দিয়ে আমার চোখ দুটি মুছিয়ে দিয়ে নিজে কেঁদে ফেল্লেন।

আমি বল্লাম, নিজের বেলায় কি হয় বৌদি? বলবার

বুঝি কেউ নেই তাই, নয় ? কিন্তু তোমার ভাইটি যে এখনও বেঁচে রয়েছে বৌদি !

বৌদিমণি একটি বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, আচ্ছা অমর, তুমি সত্য করে বল দেখি নিজের উপর কেন এমন করে প্রতিশোধ নিচ্ছ ?

আমি এই কথা কয়েকটির বেশ গুছিয়ে উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম এমন সময় ভয়ানক কাশি এল। ঝলকে ঝলকে রক্ত। আমি মূর্চ্ছার কোলে আশ্রয় নিলাম।

আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে ডাকলাম, বৌদি !

কি বল্‌ছ অমর-দা ?

চম্‌কে উঠ্‌লাম। চোখ খুলে দেখি, সুনীলা আমার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। তার সেই মাথা হতে খসে পড়া লাল পেড়ে সাড়ী, চিবুকের উপর হতে ঝরে পড়া মুক্তোর মত অশ্রুকণা, ব্যথিত মলিন মুখখানি আমার বুকে গিয়ে বিঁধ্‌ল। তার উপর আমার যে অভিমান জেগে উঠেছিল সে আর মনে রইল না। আমার বুকের উপর তার যে হাতখানি ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছিল আমি তার উপর হাত রেখে বল্লাম, সুনীলা, তুমি কেন কাঁদছ ?

সুনীলা আকাশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বল্লে, কাঁদছি কেন ? ভাবছি জীবনে আর কতই অপরকে কষ্ট দেব। কি দিয়ে যে ভগবান আমায় সৃষ্টি করেছিলেন তা বলতে পারি না। আমার জীবন ত মরুভূমিই হয়ে পড়ে আছে আর যাদের কাছে আছি তাদের জীবনও মরুভূমি করতে বসেছি। তাই বার বার মনে হয় নিজের পথ নিজেই খুঁজে নি।

আমি বল্লাম, কৈ সুনীলা, আমি কি তোমার মনে কিছু আঘাত দিয়েছি ?

তুমি যে আমার মনে আঘাত দাও নি, সেটি আমি ঠিক করে বলতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাকে নিয়েই তোমার আজ এই অবস্থা। তা নইলে তুমি আজ এমন করে নিজের উপর প্রতিশোধ নিতে পারতে না, এমন করে অপরকে কাঁদাতে না, সোনার সংসার এমন করে ছারখার করে দিতে পারতে না। তাই আমি এই ক'দিনে ভেবে ঠিক করেছি, আমার মধ্যে আমিত্ব থাকলে আর চলবে না। নিজেকে এখন অন্য রকম করে তৈরি করতে হবে; আর সে-তৈরি করেও এনেছি। তোমাকে আমি এমন করে অসময়ে বিদায় দিতে পারব না। তাতে আমার সব যায় যাক্ ! তোমাকে বাঁচতেই হবে ! আমি সব বুঝেছি, শুনেছি।

আমি তার কথায় বাধা দিয়ে ধীরে ধীরে বল্লাম, সুনীলা তুমি বাইরে যাও ! আমাকে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দাও।

সুনীলা চলে গেল। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম— আমি যদি ঐ মেঘ হতাম তা হলে আর এত যন্ত্রণা সহ্য করতে হত না, এমন করে পরের বুক-ফাটা কথা শুনতে হত না। হাওয়ায় ভরদিয়ে আকাশ-আঙিনায় খেলে খেলে বেড়াতাম। আপনা হতেই চোখের কোণ হতে এক ফোটা জল গাল বেয়ে বালিসের উপর ঝরে পড়ল। ভগবানকে ডেকে বল্‌লাম, আর কতদিন এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে প্রভু !

অনেক দিন হল আমি এখন বেশ শরীরে বল পেয়েছি। উঠে হেঁটে বেড়াতে পারি। ফাল্গুনের বাতাস গায়ে ছড়িয়ে পড়তেই মনটি আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। পশ্চিমের খোলা বাতায়নের সামে বসে সূর্য্যের বিদায়পথের দিকে চেয়ে রইলাম। স্বর্ণ মেঘের ছাতি মাথায় দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। আমি নিস্তব্ধ হয়ে ভাবছিলাম,—মানুষের মধ্যে যদি প্রেম বলে কোন বস্তু না থাকত, তা হলে কেমন হত ! আবার পরক্ষণেই মনে হল, প্রেম আছে বলেই মানুষ বেঁচে আছে। এমন সময় সুনীলা ঘরে ঢুকে ক্রন্দন-কম্পিত কণ্ঠে আমায় ডাকলে, অমর-দা !

আমি পিছনে না ফিরে উত্তর দিলাম, কেন ?

আমায় ক্ষমা করতে পেরেছ ?

মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই যে ঐটি সুনীলা !

কিছুক্ষণ পরে পিছন ফিরে দেখি সুনীলা ঘর হতে চলে গেছে। বুঝলাম সেদিন ঝোঁকের মাথায় যে সমস্ত কথা বলে ফেলেছিল তার জন্যে মনে এখন ধিক্কার জন্মেছে।

কিছুদিন পর যখন সুস্থ হয়ে বৌদিমণির কাছে বিদায় নিয়ে নীচে এসে দাঁড়ালাম তখন বার বার এই কথা কয়েকটি মনে হচ্ছিল যে, এবার যখন বাড়ী আসি তখন সুনীলার কি বুকভরা আনন্দ আর আজ বুঝি তারই চরম প্রতিদান। বাড়ীর বাইরে গিয়ে মনে করলাম, জানলায় বোধ হয় একবার তার শেষ দেখা পাব কিন্তু তার বদলে দেখলাম বৌদি-মণির সজল নয়ন। তখন মনে করলাম, সুনীলা ত আমার কেউ নয়।

• • • •

ভাদরের বৃষ্টির সাথে সাথে আমার মন ও কেন অকারণে ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠ্‌ছে ! আজ ঐ সিক্ত ঝরে-পরা বকুলের গন্ধ আমায় ত টেনে নিয়ে যেতে পারছে না। কেন বার বার মরণের কথা আমার মনের কপাটে বসে ধাক্কা দিচ্ছে। পৃথিবী ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। একদিন ভগবানের নিকট মরণের যে প্রার্থনা করেছিলাম তারই বুঝি আজ ডাক এসেছে। তাই বুঝি আমার পৃথিবী ছেড়ে যেতে

যাবে। কিন্তু যাবার আগে যদি একবার তার—না থাক, তার স্মৃতি আর আমার মনের কোণে স্থান দেব না। সে যেমন আমাকে উপেক্ষা করেছে আমিও কেন তাকে সেই ভাবে উপেক্ষা করতে পারছি না!

এমন সময় আমার বন্ধু অমল তার উজ্জ্বল মুখখানিকে মলিন করে আমার সামনে এসে বল্লে, অমর, আবার উঠচে?

আমি তার হাতখানি ধরে নিকটে বসিয়ে বল্লাম, হাঁ ভাই, আরো দুবার উঠেচে। আর তোকে কষ্ট করতে হবে না। এখন দেখ, আমি কেমন ধীরে ধীরে এ জগৎ হতে মুছে চলে যাই।

অমল বল্লে, তুই বড় ছেলেমানুষ অমর। ডাক্তারের চেয়েও তুই বড় পণ্ডিত, না? কালকে আমাদের দার্জ্জিলিঙ্‌ ছেড়ে যেতে হবে, তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

আমি বল্লাম, চল, তবে তোমার এই বন্ধুটিকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না!

আচ্ছা সে এখন পরে বোঝা যাবে। এখন বল ত ভাই, সুনীলা কে?

তার মুখে সুনীলা নাম শুনেই আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। সে কেমন করে সুনীলার নাম জানতে পারলে! তখন মনে হল, কাল রাত্রে বোধ হয় মুখ দিয়ে কোন কথা বেরিয়ে গিছল। বল্লাম, অমল তুই যা' জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস সে কথা বলব কিন্তু আজ নয়।

দার্জ্জিলিঙয়ে এসে দিনকতক বেশ ভাল ছিলাম। কিন্তু আজ বুঝি আর কেউ আমায় বেঁধে রাখতে পারবে না। তাই বার বার বৌদিমণির মুখখানি মনে পড়ছে। মনে করছিলাম, দুদিন আগে যদি বৌদিমণিকে একখানি টেলিগ্রাম করতাম, তা হলে জীবনের শেষে তার মুখখানি দেখে যেতে পারতাম। কিন্তু তা আর হল কৈ? একজনের জন্য বৌদিমণিকে আর শেষ দেখা দেখতে পেলাম না।

অমলের সঙ্গে যে ডাক্তার আমার ঘরে প্রবেশ করলে তাকে দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে বলে যেল্লাম, দেখ ত ডাক্তার, আরো কিছুদিন আমি বেঁচে থাকতে পারব কি না?

অমল কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘর হতে বেড়িয়ে গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অমল দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করতেই দেখতে পেলাম তার পেছনেই বৌদিমণি। আমি 'বৌদি' বলে ড'কতে যাব আর অমনি সুনীলা তার পেছনে ঘরে প্রবেশ করল। আমি বিছানায় শুয়ে পড়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরালাম।

বৌদিমণি ডাক্তারকে দেখে মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। সুনীলা আমার মাথার শিয়রে বসে চোখের জল ফেলতে লাগল।

আমি কখন জ্ঞান হারালাম জানি না। যখন জ্ঞান হোল তখন পাহাড়ের গা বেয়ে সূর্য্য এপারে আসছে নবজীবনের প্রভাতের মত মনে হোল।

কালকের কথা একে একে মনে পড়ল। ডাক্তার—বৌদির মূর্চ্ছা—সুনীলার কান্না—তার পর? প্রাণটা যেন হুতাশে খালি হয়ে এল।

বৌদি বোধ হয় কাছে ছিলেন, বললেন, দুধটা খাবে, বেশ গরম ছাগলের দুধ, খেয়ে ফেল ত ভাই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অমল কোথায়?

অমল বোধ হয় পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। আমার কথা শুনেই বোধ হয় তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে এসেছে। বেচারা—দিন রাত্র আজ ক'দিন থেকে জাগছে।

অমল ত এলো। কিন্তু তাকে যার কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই সে কোথায় আছে?

অমলকে একটা বাজে কথা জিজ্ঞাসা করলাম, অমল, আজ আর ডাক্তার আসবে না—সেই কালকের ডাক্তার?

অমল কি বলতে যাচ্ছিল, বৌদি চোখ পাকিয়ে তাকে বারণ করলেন, আমি তা' দেখলাম।

একটু পরেই স্নান ক'রে কতগুলি ফুল হাতে করে সুনীলা এসে আমাকে প্রণাম করল।

অন্য সময় হ'লে আমি বাধা দিতাম, কিন্তু সেদিন বড় ভাল লাগল। আমার জন্য নয়, সুনীলার জন্য। মেয়েদের স্নানের পর প্রণাম করতে দেখলে বড় ভাল লাগে। ঐ প্রণামেই মানুষকে দেবতা করে দিতে পারে! আমার ত আর পাপ নেই! আমি ত পাপ তাপ ফেলে চলেছি!

ডাক্তার এলেন। সুনীলা আমার পায়ের কাছে বসে রইল। ডাক্তার আমাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ সুনীলার দিকে তাকিয়ে যেন কেমন হয়ে গেলেন।

বৌদি আবার হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন। আমার মনে হোল, সুনীলার স্বামীও যদি এমনি ধারা সুনীলাকে এতদিন পরে দেখত তাহলে ডাক্তারের মতই তার অবস্থা হোত!

পরের দিনের প্রভাত বড় দেখতে পেলাম না, চোখের আলো তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে, মনের কোনও দিশা নাই, কারুর কথা মনে পড়ছে না। নিশ্বাসগুলো যদি আর একটু সহজে পড়ত! এক একবার দেখছিলাম যেন সকলে কাঁদছে কিন্তু আমার ত কারুর জন্য কান্না পাচ্ছিল না। একটু কষ্ট হচ্ছিল অমলটার জন্য—ও বড় একলা পড়ল।
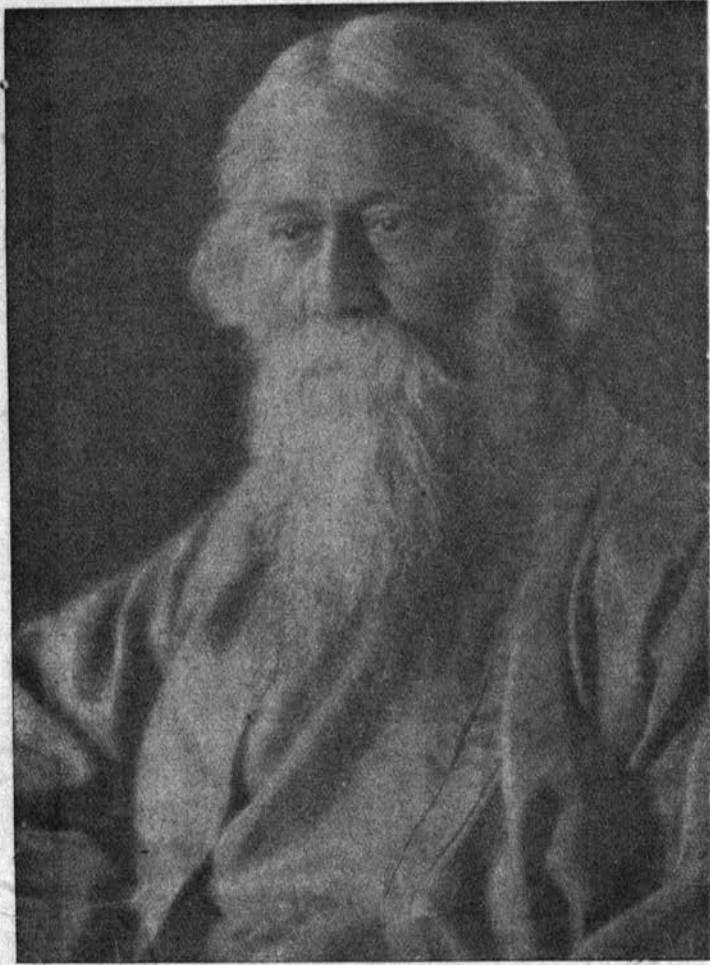
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৫ তম জন্মতিথি, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৩

মোর আঁখিজল

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

মোর আঁখিজল
কাহাদের লাগি আজ উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে আকুল, চঞ্চল!
জীবনে পায় নি যারা স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা,
যাহাদের মঙ্গলেতে উষাহীন অমা
জাগিয়াছে দুশ্চর দুস্তর,
যাহাদের মৌন চোখ—অশ্রু সকাতর
চাহিয়াছে বার বার আকাশের পানে
তুচ্ছতম আলোর সন্ধানে!
—আঁধারের আবর্ত্তের তলে
প্রেত সম যাহাদের প্রাণ ভেসে চলে
শ্মশানের শেষে!
কোন্ ক্রূর পিশাচের অবিজ্ঞেয় অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
যাহারা ঝরিয়া পড়ে পতঙ্গের প্রায়
লক্ষ কোটি অন্যায়ের অনলশিখায়!
যাহাদের দ্বারে
প্রেয়সী আসে না কভু স্মিতহাস্যে মাল্যের সম্ভারে;
প্রেমের সন্ধানে
যাহারা ছুটিয়া গেছে প্রেতপুরে, নরকের পানে!
—মেটে নাই তৃষা,
অসম্বৃত কামনার কারাগারে বারবার হারায়েছে দিশা!
পৃথিবীর নিঃসহায় শৃঙ্খলিত প্রাণ,
লক্ষ লক্ষ আর্ত্ত ম্লান পিষ্ট ভগবান,
আজ মোর বুকে কেঁদে ওঠে!
—নিখিলের ব্যথা আজ অশ্রু হয়ে মোর চোখে ফোটে!

———

পাথেয়

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরেশ্বরের সব চেয়ে বড় সখ ছিল গান এবং থিয়েটার করা। হাজারিবাগে বেড়াইতে আসিয়া তিনি এই লইয়াই দিনরাত মাতিয়া থাকিতেন। সকালে চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের সঙ্গে থিয়েটারের আলোচনা করিতেন, একটু বেলা হইলে সঙ্গীত চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং ভিতর হইতে চার পাঁচ বার তাগাদার পর স্নানাহারের জন্ম উঠিতেন। আহার এবং ধূমপানের পর নিদ্রা। তৎপরে অধিক রাত্রি অবধি ক্লাবে কাটান, ইহাই ছিল তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকা।

তাঁহার কন্যা শান্তির কিন্তু এই প্রবাসে সময় কাটাইবার উপায়ের বড়ই অভাব ছিল। পিতা সঙ্গীত এবং থিয়েটার লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহার সহিত সে কথা কহিতে পাইত না; মাতা গৃহকর্ম্ম লইয়া থাকিতেন, তাঁহারও গল্প করার সুযোগ মিলিত না; দাদা পিতার নিকট বসিয়া সঙ্গীত চর্চ্চা ও আলোচনা শুনিত, বা অবসরকাল বন্ধু-বান্ধবের সহিত কাটাইত, সুতরাং বেচারা সেখানেও যাইতে পাইত না। তাহার একটিমাত্র গল্প করিবার সঙ্গী ছিল তাহার দাদার বন্ধু অমিয়। তাহার দাদার এই বন্ধুটি অল্পদিন হইল হাজারিবাগে তাহাদের বাড়ী অতিথি হইয়া আসিয়াছে এবং এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ীর ছেলের মত হইয়া গিয়াছে। মাত্র তিনদিনের জন্ম সে আসিয়াছিল, কিন্তু বীরেশ্বর ছেলেটিকে যাইতে দেন নাই; বলিয়া রাখিয়াছেন সকলে এক সঙ্গেই সেখান হইতে যাইবেন।

সকালে বাহিরের দালানে বীরেশ্বর যখন সদলে সু-উচ্চ-ধ্বনিতে নানা প্রকার ওস্তাদী-সঙ্গীত সাধন করিতেন, তখন এক একদিন শান্তি অমিয়র নিকট আসিয়া বলিত, অমিয়-দা, তোমার এ রকম গান শুন্‌তে ভাল লাগে?

অমিয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিত, নাঃ, মোটেই না।

শান্তি প্রশ্ন করিত, তবে শুন্‌ছ কেন?

অমিয় একটু হাসিয়া বলিত, কানে তুলো চাপা দিয়ে রাখ্‌বো?

শান্তি একটু ভাবিয়া বলিত, তার চেয়ে চল আমরা বেড়িয়ে আসি।

শান্তি যত সহজে বলিত, অমিয় তত সহজে স্বীকার করিতে পারিত না। বলিত, এইমাত্র তাহারা বেড়াইয়া আসিয়াছে, এখন রৌদ্র উঠিয়াছে, ফিরিতে দেরী হইবে, ইত্যাদি।

সকালে ও বিকালে অমিয়, শান্তি এবং তাহার মাকে লইয়া বেড়াইতে যাইত। বীরেশ্বর কোনদিনই বাড়ীর স্ত্রীলোকদের লইয়া বেড়াইবার অবসর পাইতেন না, শান্তির দাদা বিশ্বেশ্বর বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের লইয়া যাইত। সুতরাং নারী দুইটির ভ্রমণ-ইচ্ছা প্রত্যহ সফল হইতে পাইত না। অমিয় এখন তাঁহাদের এই ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোমন্দিরে বেশ উচ্চ স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। বেড়াইতে বাহির হইয়া সে প্রায়ই জানাইত, বিশ্বেশ্বরের বন্ধুবর্গের সংসর্গ তাহার মোটেই ভাল লাগে না, তাঁহারা সঙ্গে না গেলেও তাহাকে একাই বেড়াইতে হইত।

বীরেশ্বর সহরের বাহিরে বাংলো ভাড়া করিয়াছিলেন। সেখান হইতে হ্রদ বেশীদূরের পথ নহে। বেড়াইতে বাহির হইয়া তাহারা অধিকাংশদিন এই হ্রদের ধারেই আসিত। সূর্য্য ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পশ্চিমের বন্ধুর বিস্তৃত মাঠের দিগন্তে ঢলিয়া পড়িত, দূরে অনুন্নতশীর্ষ পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি হ্রদের স্বচ্ছ জলের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিত, ও-পারের ধূলি-রক্তিম পথটির পার্শ্বস্থিত বাঁশ-ঝাড় হইতে পক্ষীর সম্মিলিত কোলাহল ম্লানায়মান দিবসান্তের রহস্যের মতই মিলাইয়া যাইত। এই মোহাচ্ছন্ন গোধূলিকালে মুগ্ধ দুইটি প্রাণীকে যেন সচেতন করাইবার জন্যই বীরেশ্বরের স্ত্রীকে প্রায়ই স্মরণ করাইয়া দিতে হইত, বাবা অমিয়, সন্ধ্যে হ'য়ে গেল যে।

অমিয় বলিত, যাচ্ছি মাসি-মা।

শান্তি অনুরোধ করিয়া বলিত, আর একটু থাক না মা।

বীরেশ্বরের স্ত্রীর বাঘের ভয় একটু অধিকমাত্রাতেই ছিল। তিনি বলিতেন, বাড়ী যেতে রাত্রি হ'য়ে যাবে। সহরের বাইরে এই নির্জ্জন স্থান সন্ধ্যের পর মোটেই নিরাপদ নয়।

তর্ক উঠিলে তিনি শ্রুত ও কল্পিত নানা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া নিজ বিবেচনাশক্তির প্রমাণ দেখাইতেন।

ফিরিবার পথে চলিতে চলিতে তিনি আগাইয়া যাইতেন। তাঁহার পশ্চাতে অমিয় ও শান্তি পাশাপাশি চলিত। কোনদিন তাহারা গল্প কল্পিত, সেই অবিচ্ছিন্ন গল্পসূত্র গৃহে আসিয়াও ছিন্ন হইত না; কোনদিন বা তাহারা নীরবে পথ চলিয়া যাইত, নির্জ্জন পথের উপর তাহাদের লঘু পদক্ষেপ যেন নীরবতার গভীর প্রদেশে তালে তালে ঘা দিতে থাকিত।

বীরেশ্বরের স্ত্রী কখনও কখনও কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, তোরা হঠাৎ চুপ্ চাপ্ হয়ে গেলি যে?

অমিয় অপ্রস্তুত হইয়া বলিত, কি বল্‌বো তাই ভাব্‌ছি মাসি-মা।

শান্তি ঈষৎ হাসিয়া বলিত, সব সময় কি কথা বল্‌তে ভাল লাগে মা? অমিয়-দা বোধ হয় মিছে কথা বল্লেন। বলিয়া সে স্মিতদৃষ্টিতে একবার অমিয়র প্রতি চাহিত। আব্‌ছায়া অন্ধকারের স্তর ভেদ করিয়া সেই ক্ষণোন্নতদৃষ্টি অমিয়র অন্তরে অনেকখানি বিদ্ধ করিয়া যাইত। নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের তাহার ইচ্ছা ও উৎসাহ ওই দুটি দৃষ্টির মাধুর্য্য হরণ করিয়া লইত। সে আবার চুপ্ করিয়া চলিত।

বাঘের ভয়ে আলো জ্বালিবার পরই বাড়ীর দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। শুধু বাহিরের ঘরের একটা লোহার জাল ঘেরা প্রকাণ্ড জানালা খোলা থাকিত। এই জানালার ধারটিতে সকলে বসিয়া গল্প করিতেন। গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় বীরেশ্বরের স্ত্রীর গল্প-মজ্‌লিশে যোগদান প্রায়ই সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। কোন কোন দিন বীরেশ্বরের ক্লাব হইতে ফিরিতে রাত্র হইয়া যাইত। বিশ্বেশ্বর ইদানীং উপন্যাস-সাহিত্যচর্চ্চায় বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিল। সে অদূরে আলোর নীচে বসিয়া পুস্তক হস্তে সেই সাধনায় সমাহিত হইয়া থাকিত। সে-দিন নিরালায় অমিয় ও শান্তির কথার শেষ হইত না। শান্তি বার বার বলিত যে, তাহাদের আতিথ্যে থাকিয়া অমিয়র কোনরূপ কষ্ট হইলে তাহা সে জানাইতে যেন দ্বিধাবোধ না করে। এই নিতান্ত তুচ্ছ কথা লইয়া উভয়ের অশ্রান্ত তর্ক-বিতর্ক চলিত, পরে আবার মিটিয়া যাইত। অমিয় নিজের বাড়ীর গল্প করিত; মায়ের কথা বলিত, ভায়ের কথা বলিত, ভগিনীর কথা বলিত,—কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে কবে তাহাদের মাতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য লইয়া যাইবে, সে কথাও বলিত, চাঁদিনী রাত্রে জ্যোৎস্না বাতায়ন-পথ দিয়া তাহাদের পদতলে লুটাইয়া পড়িত, এবং তাহারা সেই জ্যোৎস্নাধারার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কথা-কওয়া ও কথা-না-কওয়ার কথা কহিত। নিদ্রালসচক্ষে দৃষ্ট নিশীথ-জ্যোৎস্না যেমন স্মৃতি-পটে একটি আব্‌ছায়া অথচ গভীর ছাপ মারিয়া দেয়, তেমনিই এই দুইটি তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে তাহাদের প্রতিদিনের কথা-বার্ত্তার ও আকার-ইঙ্গিতের ভগ্নবাণী ও অস্পষ্ট ছবি গ্রথিত হইয়া থাকিত; কোন কোন কর্ম্মহীন দিবস হৃদয়ের এই অফুরন্ত মধুভাণ্ড হইতে মধু ক্ষরিত হইয়া মধুময় হইয়া উঠিত।

* * *

শান্তি বলিল, একটা কিছু করতে হবে, অমিয়-দা!

অমিয় হাসিয়া বলিল, কি করবে?

একটা কিছু করার কথা লইয়া মধ্যাহ্নের এই সভাটি জমিয়া উঠিল। রৌদ্র-সমুজ্জ্বল, উদাস ও অবশ দ্বিপ্রহরে বৃক্ষ-নিম্নে দুইটি নর-নারী এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে কি যে একটা করিবে, তাহার কোন সন্ধানই খুঁজিয়া পাইল না। কোথায় পাখী তাহার চির-অভিমানী মৌন সাথীটিকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছিল, 'বৌ কথা কও', তাহার আবেগ কম্পিত ব্যাকুল স্বর সাথীর পাষাণ-হৃদয়ে আহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আকাশে, বাতাসে, বনান্তে, দিগন্তে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, সাথী কথা কহিল না। এই নিভৃত আলোচনা-সভাটিকে ঘেরিয়া কোন এক অনাদি, অনন্ত, আকুল স্বর কেবলই বলিতে লাগিল, 'বৌ কথা কও!'

শান্তি হঠাৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, ওর বৌ কথা কয় না কেন?

উত্তর দিতে গিয়া অমিয়র মনে লজ্জারক্ত নববধূর মৌনতার একটি চিত্র ভাসিয়া উঠিল ; কোন উত্তর দিল না, কয়েকমুহূর্ত্ত শান্তির মুখের দিকে চাহিল।

শান্তি বলিল, এখনও ঠিক হল না কি করবো ?

সভা পুনরায় গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল।

অনেক আলোচনা ও গবেষণার পর স্থির হইল, ক্যানারী পাহাড়ের ধারে 'পিকনিক' করা হইবে। পিকনিক কিরূপ-ভাবে হইবে, কি কি জিনিষ-পত্র সেখানে লইয়া যাইতে হইবে ইত্যাদির আলোচনা যখন সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় অদূরে বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তি দেখা গেল। আলোচনা বন্ধ করিয়া অমিয় বলিল, আলোচনা আর একদিন হবে, বিশু উঠেছে।

অমিয় উঠিতে যাইতেছিল, শান্তি তাহার জামার একটা কোণ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বস না অমিয়-দা। দাদা এইখানেই আসবে।

বিশ্বেশ্বর তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাহাদের নিকট গিয়া বসিল। শান্তি সোৎসাহে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে সেও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সভায় গুঞ্জনের পরিবর্ত্তে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল, এবং বিশ্বেশ্বর গলার জোরের দ্বারা নিজ মত বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তর্ক-বিতর্ক অবশেষে বিবাদে পরিণত হইল এবং বিবাদান্তে শান্তি রাগ করিয়া সভাত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অমিয় ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, কেন মিছে ঝগড়া করে ওকে তাড়ালে ?

বিশ্বেশ্বর বলিল, গেল ত ভারী বয়ে গেল! ওকে বাদ দিয়ে আমরা অনায়াসে পিকনিক করতে পারি। পরে বুঝাইয়া দিল, পিতা অত্যধিক আদর দিয়া কিরূপে শান্তিকে খারাপ করিয়া দিতেছেন, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত বড় ভাইয়ের প্রাধান্য অস্বীকার করা।

পরে পিকনিক কিরূপভাবে হইবে, কি কি দ্রব্যাদি আবশ্যক হইবে, কখন যাত্রা করিতে হইবে ইত্যাদি স্থির হইল। আর কোন বিবাদ উঠিল না, তর্ক-বিতর্ক হইল না, বিশ্বেশ্বরের মতই বজায় রহিল।

সেইদিন বিকালে বেড়াইতে গিয়া শান্তি অমিয়কে বলিল, তোমাদের পিকনিকের কি রকম বন্দোবস্ত ঠিক হল ?

অমিয় বলিল, আমাদের কেন ?

শান্তি বলিল, তোমাদের না ত কাদের ? তোমার আর দাদার।

অমিয় কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

শান্তি পুনরায় কহিল, আমরা কেউ যাব না। আমি নয় মা নয়, বাবাও নয়, তুমি যাবে, দাদা যাবে, আর তোমাদের বন্ধুরা যাবেন।

অমিয় বলিল, তুমিও চল। পিকনিক বোধ হয় হবে না, শুধু বেড়িয়ে আসাই হবে।

শান্তি বলিল, আমি তাও যাব না। তুমি আমার জন্যে কি কর যে আমি তোমার অনুরোধে সেখানে যাব ?

অমিয় বলিল, তুমিই বা আমার জন্যে কি কর ?

শান্তি অমিয়র মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, তোমার জন্যে কিছু করি না ? একটু থামিয়া বলিল, সকালে শুধু তোমার জন্যে অত তাড়াতাড়ি চা করি। বিকালে ঘুম থেকে উঠবার আগে আমি চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।—

অমিয় বলিল, আমিও তেমনি তোমাকে রোজ দুবেলা বেড়াতে নিয়ে আসি।

শান্তি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, ওঃ তোমার আমাদের বেড়াতে নিয়ে আসতে বড় কষ্ট হয়, না ? দাদার সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে যেতে পান না,—কথাটা শেষ না করিয়াই মাকে ডাকিয়া বলিল, মা শুনছো, আমাদের রোজ বেড়াতে নিয়ে আসায় অমিয়-দা'র কষ্ট হয়।

অমিয় অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া কি বলিবে হঠাৎ স্থির করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল, না মাসি-মা, আমার মোটেই কষ্ট হয় না, ও মিছে কথা বলছে। এখানে কাউকে আমি চিনি না, বিশুর সব বন্ধুদেরও চিনি না, কাজেই একা বেড়াতে আসতে হত। কথা শেষ করিয়া আবিষ্কার করিল, তাহার মাসি-মা তাহার এবং শান্তির, কাহারও কথাটিই মনোযোগ দিয়া শুনেন নাই ; তখন মনে হইল কৈফিয়ৎ না দিলেও চলিত।

যাইবার সময় সমস্ত পথটাই খুঁটি-নাটি কথা লইয়া শান্তি

ও অমিয় তর্ক করিতে করিতে চলিল। কিন্তু ফিরিবার সময় তর্কের অবসান ঘটিল। স্থির হইল, পিকনিক ইত্যাদি কিছুই হইবে না, সকলে মিলিয়া ক্যানারী পাহাড়ে বেড়াইতে যাইবে।

রাত্রে বীরেশ্বর সব শুনিয়া বলিলেন, পাহাড়ে বেড়াইতে যাওয়া হইতে পারে, কিন্তু পিকনিক ইত্যাদি হইবে না, কারণ আগুন লইয়া সেখানে ছেলেমানুষী করা উচিত নহে।

বিশ্বেশ্বর অনেক যুক্তি-তর্ক করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

পরদিন মোটরে করিয়া সকলে ক্যানারী পাহাড়ে বেড়াইতে গেলেন। পথ বেশী দূরের নহে, শীঘ্রই সেখানে পৌছিয়া গেলেন। চারিধারে অসমতল মাঠ, পাহাড়ের পশ্চাতে অনতিদূরে শালবন আরম্ভ হইয়াছে। উপরে উঠিবার জন্য বৃথা পথ অনুসন্ধান করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল, উপরে ওঠবার কোন ভাল পথ নেই। এই পাথরের ধার দিয়ে উঠতে হবে!

বীরেশ্বর ও তাঁহার স্ত্রী নীচেই রহিলেন, বিশ্বেশ্বর, অমিয় ও শান্তি একটা পাথরের পাশ দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। শান্তিকে বার বার হাত ধরিয়া উপরে টানিয়া তুলিতে হইল। পাহাড়ের প্রায় অর্দ্ধেকটা উঠিয়া আর পথ পাওয়া গেল না। যে পথে যাওয়া হইতেছিল, সে পথের উপর একটা বৃহৎ পাথর ঝুলিতেছিল, সেটা পার হইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। অমিয় ও শান্তিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বিশ্বেশ্বর অন্য কোন পথ খুঁজিতে গেল। শান্তি অতিশয় জোরে জোরে হাঁপাইতেছে দেখিয়া অমিয় তাহাকে বসিতে বলিল। শান্তি বসিলে সে নিজেও তাহার পার্শ্বে বসিল। চারিদিকে একটা স্তব্ধভাব। তাহাদের পায়ের নীচে পাথরের উপর কে নাম লিখিয়া রাখিয়াছে, অমিয় সে দিকে দৃষ্টি পড়াতে বলিয়া উঠিল, শান্তি, আমরাও নাম লিখে যাব।

শান্তি উৎসাহিত হইয়া বলিল, বেশ ত।

অমিয় একটা নুড়ি লইয়া একটা প্রকাণ্ড পাথরের গায়ে ঠুকিয়া ঠুকিয়া নাম লিখিতে লাগিল। আঁকা বাঁকা অক্ষরে নিজের নাম লিখিয়া বলিল, এবারে তোমার নাম লিখি, শান্তি?

শান্তি বলিল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বিশ্রী আমার নাম। এর কোন মানে নেই, শুনতে খারাপ লাগে।

অমিয় পাথরের গায়ে নুড়ি ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, কেন, তোমার নাম ত খুব সুন্দর। সংসারের অশান্তি, যন্ত্রণার মধ্যে শান্তি নামটা শুনতে কেমন লাগে!

নাম লেখা শেষ হইলে অমিয় ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল, নির্জ্জন শৈলগাত্রের একটি কোণে দুইটি নাম খোদিত হইয়া রহিল; হয় ত কেহ এ-পথ দিয়া যাইবার সময় সুবৃহৎ প্রস্তরগাত্রে ক্ষুদ্র অক্ষরে খোদিত পাশাপাশি দুইটি নামের উপর মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিপাত করিবে; নচেৎ এই জনহীন স্থানে দুইটি প্রাণের কয়েকমুহূর্ত্তের আবেগের ইতিহাস এককালে নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে।

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বেশ্বর হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কোথাও পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। পথ খুঁজতে গিয়ে কাঁটায় লেগে আমার কাপড়ই ছিঁড়ে গেছে।

অমিয় বলিল, ওহে, আমরা নাম লিখেছি। তুমি লিখবে?

বিশ্বেশ্বর গম্ভীর হইয়া বলিল, ওসব ছেলেমানুষেরা লেখে, চল নীচে যাই, বাবা বকবেন।

সকলে নীচে নামিয়া আসিল। বিশ্বেশ্বরের ক্লাবে যাইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি এই বিলম্বের জন্য সকলকে একচোট বকিয়া লইলেন। সন্ধ্যার অনতিপরে সকলে বাড়ী পৌছিলেন।

কয়েক দিন পরে এক সন্ধ্যায় বীরেশ্বরের স্ত্রী গল্প-প্রসঙ্গে অমিয়কে বলিলেন, অমিয়, তুমি আমার এ মেয়েটিকে বিয়ে করবে?

ঘরের মধ্যে বীরেশ্বরের স্ত্রী, অমিয় ও শান্তি ব্যতীত আর কেহ ছিল না। দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান আলোর নীচে অন্ধকারস্থানে শান্তি বসিয়া ছিল, অমিয় চকিত দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া লইয়া এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের কি উত্তর দিবে ভাবিতে লাগিল।

বীরেশ্বরের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন, তুমি এতদিন থেকে আমার মেয়ের স্বভাব-চরিত্র ভাল করেই চিনতে পেরেছো।

তবে আমার মেয়ে কালো কিন্তু সেজন্য কি তোমার কোন আপত্তি আছে ?

অমিয় হঠাৎ কিছু চিন্তা না করিয়াই বলিয়া উঠিল, না মাসি-মা আমি এখনও মানুষকে সোনা-রূপার মত দেখতে শিখি নি।

তাহার মাসি-মা বলিলেন, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে কলকাতায় গিয়ে তোমার বাবার কাছে আমরা কথা তুলবো।

অমিয় বলিল, বেশ ত মাসি-মা, আমি গিয়েই আপনাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। দেখবেন, মাকে আপনার খুব ভাল লাগবে, তিনিও আপনার মতনই কতকটা দেখতে।

ইহার পর আর এ আলোচনার কোন আবশ্যক রহিল না। কিন্তু আলোচনা বন্ধ হইলেও অমিয়র মনে একটা নূতন উৎস উন্মুক্ত হইয়া গেল। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় সে নানা কথাই ভাবিত। এক একদিন গভীর রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, এবং মনে হইত যেন একটা সুগোপন সুপ্রচ্ছন্ন বেদনা বনমধ্যস্থিত নির্ঝরের মত অগোচরে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার ক্ষীণ প্রবাহধ্বনি এই নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছে। চারিদিক হইতে ঝিল্লি-ধ্বনি ভাসিয়া আসিত, গাছ-পালা নাড়াইয়া এক একটা বাতাস বহিয়া যাইত, মধ্যে মধ্যে শৃগাল ডাকিয়া উঠিত,—অন্ধকারে চক্ষু মেলিয়া থাকিয়া অমিয় এ সকলই শুনিত। মনে একটি মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিত, দুইটি করুণ অবশ আঁখি দেখিতে পাইত। তারপর এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িত। রাত্রে অনিদ্রাহেতু প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিতে দেরী হইত ; চোখ খুলিয়াই দেখিত, শান্তি স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া সে বলিত, অমিয়-দা, আজকাল তুমি দাদার মত কুঁড়ে হ'য়ে যাচ্ছো। আমি না ডেকে দিলে বোধ হয় আরও ঘুমুতে !

পূজার বন্ধ শেষ হইয়া আসিল। হাজারিবাগ হইতে যাইবার কথা উঠিল। তারপর একদিন সকলে রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

* * *

অমিয়র পিতা গোবিন্দ একজন সংস্কারাপন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দু। দেশে তাঁহার কিছু জমীদারী আছে, কলিকাতায় দুইটি বাড়ী আছে। ইহা হইতেই তাঁহার সাংসারিক ব্যয় চলিয়া যায়। তাঁহার বড় ছেলে অমিয় আগামী বৎসর বি, এ, পরীক্ষা দিবে ; গোবিন্দর ইচ্ছা আছে ইহার পর তাহাকে দেশে পাঠাইয়া জমীদারীর কাজ-কর্ম্ম শিখাইবেন।

একদা রাত্রে তাঁহার স্ত্রী মায়া নানা ভূমিকা এবং অবতরণিকার পর বলিলেন, বীরেশ্বর বাবুর স্ত্রীর বড় ইচ্ছে অমিয়র সঙ্গে তাঁর মেয়েটির বিয়ে দেন।

গোবিন্দ কোন উত্তর করিলেন না ; অন্ধকারে তাঁহার মুখও দেখা গেল না।

মায়া একটা ঢোঁক গিলিয়া পুনশ্চ কহিলেন, মেয়েটির রং একটু ময়লার দিকেই। কিন্তু তা হ'লেও দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী, শান্ত স্বভাব,—মোটকথা বেশ লক্ষী মেয়েটি।

বীরেশ্বরের স্ত্রীর ঘন ঘন যাতায়াত এবং সৌহার্দ্দ স্থাপনার চেষ্টা হইতেই গোবিন্দ এইরূপই একটা কিছু আঁচ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, আমি অমিয়কে হাজারিবাগে যেতে দিতে চাই নি, শুধু তুমিই ওকে পাঠালে। যা হ'ক, কাজটা বড় ভাল কর নি।

বিবাহ-প্রসঙ্গের সহিত এ কথার কি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা একমাত্র মায়াই বুঝিলেন। বুঝিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তোমার তা' হ'লে মত নেই ?

গোবিন্দ শুধু সংক্ষেপে বলিলেন, না।

মায়া আর কথা না কহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন, কিন্তু ঘুম হইল না। ছেলের মনোভাবের কথা তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না। এই নিদারুণ অসম্মতির কথা পুত্রকে কি করিয়া জানাইবেন, জানিলে সে কতখানি আহত হইবে ইত্যাদি নানা চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। বীরেশ্বরের স্ত্রীর সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ বাস্তবিকই ঘনিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাকেই বা কি বলিয়া স্বামীর অসম্মতির কথা বুঝাইবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

পিতার অসম্মতির কথা অমিয় শুনিল, শুনিয়া কিছুই বলিল না। পিতা একদিন তাহাকে ডাকিয়া আসন্ন পরীক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, সে যেন অন্য কোনদিকে মন না দিয়া পড়ায় মন দেয়। গম্ভীর স্বভাব পিতার এই

উক্তির ইঙ্গিত বুঝিতে তাহার দেরী হইল না। সে পড়ায় মন দিল। সারাদিন বই হাতে পড়িবার ঘরে বসিয়া থাকিত, শুধু মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত।

বীরেশ্বরের স্ত্রী অনেকদিন এ বাড়ী আসেন নাই। অমিয় অনেকদিন পরে একদিন তাঁহাদের বাড়ী গেল। তাহার মাসি-মাকে বলিল, মাসি-মা, আপনি যে সম্বন্ধ পাতাবার কথা বলেছিলেন, বিধাতার তাতে ইচ্ছা নেই।

বীরেশ্বরের স্ত্রীর বুকটা হঠাৎ ধক্ করিয়া উঠিল, বলিলেন, তার মানে?

অদূরে বসিয়া শান্তি একটা কি সেলাই করিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া অমিয় এ কথার বিশদ ব্যাখ্যা করিতে ইতস্তত করিতে লাগিল। বীরেশ্বরের স্ত্রী ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি আনিয়া বলিলেন, দিদির বুঝি আমার কালো মেয়েকে পছন্দ হ'ল না?

অমিয় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে আর একটি সুপ্রচ্ছন্ন মনের অপরিসীম সংশয় তাহার চিন্তা-ধারার মূলে অঘাত করিতে লাগিল।

চুপ করে রইলে যে?

অমিয় হাসিয়া বলিল, ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। মা বাবাকে শান্তির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বলেছিলেন, বাবার এতে মত নেই।

কেন?

তা ঠিক জানি না।

নিবিড় নীরবতায় ঘর ভরিয়া উঠিল। শান্তির হাতের কাজ চলিতে লাগিল। বীরেশ্বরের স্ত্রী কোলের দেবর-পুত্রটিকে হাঁটু নাড়াইয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন। আলোর পাশে দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকির শিকার ধরার প্রয়াসের দিকে অমিয় চাহিয়া রহিল। কাহারও যেন কিছু বলিবার নাই, পৃথিবীর সব কথা যেন ফুরাইয়া গিয়াছে।

অমিয় একসময়ে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা মাসি-মা, আমি চল্লুম।

মাসি বলিলেন, যাবে? আচ্ছা এস। একটু নড়িয়া বসিয়া পুনশ্চ কহিলেন, দেখ বাবা, টাকা ইত্যাদির জন্যে বিয়ে কখনও আটকায় না। বিয়েতে মানুষের কোন হাত নেই, ভগবানই জীবনদানের সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

অমিয় চুপ করিয়া শুনিল, তারপর বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। জনহীন প্রান্তরে দূরাগত সঙ্গীতের খণ্ডসুর যেমন মনের মধ্যে এক অখণ্ড সুরের সৃষ্টি করে, তেমনিই এই ক্ষুদ্র বিদায় গ্রহণ তিনটি প্রাণে এক অপূর্ব্ব ও অনন্ত করুণ-কল্পনার সৃষ্টি করিল। গৃহমধ্যে মা ও মেয়ে ছিন্নসূত্র জড়াইতে লাগিল, বাহিরে উন্মুক্ত বাতাসে অমিয় ছিন্ন আশা জোড়া দিতে লাগিল।

সে রাত্রে বীরেশ্বর অনেক দেরী করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। আহারাদির পর গল্প-প্রসঙ্গে স্ত্রীর নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, সেজন্যে ভদ্র-লোককে দোষ দেওয়া যায় না। আমার মেয়ে ত' খুব সুন্দর দেখতে নয়, হয় ত' তাঁর পছন্দ হয় নি। তাতে আর কি? পাত্রের অভাব হবে না। আচ্ছা, কালই আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে পাত্রের চেষ্টা দেখতে বল্‌বো। মেয়ে কি আমার এতই অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে যে, আর একটা বছর তাকে রক্ষা করা যাবে না? কি বল?

স্ত্রী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। হৃদয়ের মধ্যে যে একটা সমুদ্র আছে, ঝড় উঠিলে যে সেখানে প্রলয়ের গর্জ্জন সুরু হয়। এ সকল কথা সরল স্বামীর কাছে বলা যে নিতান্তই বাহুল্য, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহমাত্র ছিল না। তিনি সে চেষ্টাও করিলেন না।

বলিলেন, তা হোক, তবু আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত। আমাদেরই ত' মেয়ে! তুমি একবার কাল যাবে, অমিয়র বাবাকে বল্‌বে। তারপর যদি না হয়, ত' তার কি হ'বে? বীরেশ্বর আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, অমিয় যখন নিজে বলে গেল, তখন— কিন্তু অবশেষে ইহাই স্থির রহিল, কালই হউক বা তাহার পরদিনই হউক বীরেশ্বর অমিয়র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন।

গোবিন্দ বীরেশ্বরকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিলেন, পাশের পূর্ব্বে পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই, তবে বীরেশ্বরের মেয়েটিকে পুত্রবধূ করিতে তাঁহার

কোনই আপত্তি নাই, যদি কোষ্ঠী-বিচারে কোন দোষ না ঘটে, এবং যদি বীরেশ্বর নিজে ততদিন অপেক্ষা করেন।

অপেক্ষা করিতে বীরেশ্বর মোটেই কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু কোষ্ঠীতে মিল হইল না, পুরাতন কাগজে কালির লেখায় এক অলঙ্ঘ্য ব্যবধান আসিয়া গেল।

অমিয় পাঠগৃহে বসিয়া এ-কথাও শুনিল। একবার মনে করিল, সে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। উষ্ণ মস্তিষ্কে সে সমস্ত ঘর ঘুরিয়া বেড়াইল, তারপর হঠাৎ কিছু না ভাবিয়া বীরেশ্বরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরে বিশ্বেশ্বর বসিয়াছিল তাহাকে বলিল, তোমার মা কোথায়?

মা ভেতরে। তোমার চেহারাটা অমন দেখাচ্ছে কেন?

কোন কথা না কহিয়া অমিয় দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। মাঝের ঘরে শান্তি একা বসিয়াছিল। জলবেগ হঠাৎ বাধা পাইয়া যেমন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য গতিরুদ্ধ হইয়া আবর্ত্তনের সৃষ্টি করে, অমিয়র সমস্ত বিদ্রোহ-বেগ অকস্মাৎ আহত হইয়া যেন গুমরিয়া উঠিল। একটু স্থির থাকিয়া শান্তিকে বলিল, তোমার মা কোথায় আছেন?

চোখ তুলিয়া শান্তি বলিল, মা স্নানের ঘরে।

সে দৃষ্টিতে কি দেখিল সেই জানে, হঠাৎ সে যেন সমস্ত ভুলিয়া গেল। কি বলিতে আসিয়াছিল, কি করিতে আসিয়াছিল কিছুই মনে রহিল না, কি বলিবে, কি করিবে কিছুই ভাবিতে পারিল না, নিশ্চেষ্ট, নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শান্তি বলিল, মাকে শীগগীর আস্‌তে বল্‌বো?

অমিয় জড়িতভাবে বলিল, অ্যাঁ,—না।

বসুন না।

হ্যাঁ বস্‌ছি। আমি যাচ্ছি জান?

শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথা যাচ্ছেন?

এইক্ষণেমাত্র অমিয়র মনে হইল তাহাকে কোথাও যাইতে হইবে। স্মৃতির তীব্রদাহ সহ্য করিয়া কলিকাতায় সে বাস করিতে পারিবে না। কিন্তু কোথায় যাইবে, তাহার ত কিছুই স্থিরতা নাই। বলিল, তা এখনও ঠিক করি নি, তবে কোথাও যাব নিশ্চয়।

শান্তি বলিল, বেশ ত যদি আমরা সেখানে যাই ত দেখা হবে।

বলিবার আর কিছুই ছিল না। অমিয় বলিল, আমি যাই।

শান্তি বলিল, মা'র সঙ্গে দেখা করবেন না?

না।

অমিয় অদূরে উপবিষ্ট মূর্ত্তিটির প্রতি একটি ক্ষণেকের দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

* * * *

ইহার পর এই দুই বাড়ীর সম্বন্ধ এক প্রকার রহিত হইয়া গেল।

অমিয়র কোথাও যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। আনন্দহীন একটি পড়িবার ঘর ও কলেজ, ইহা ছাড়া বাহ্যজগতের সহিত তাহার পরিচয় খুব অল্পই রহিল। পাঠগৃহে স্তূপীকৃত পুস্তকের সম্মুখে বসিয়া সে ভাবিত, কি ভাবিত সে নিজেই জানিত না। এই নির্দ্দেশহীন ভাবনা ক্রমে ধারাপাথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল।

সুবৃহৎ পুস্তকের ক্ষুদ্র অক্ষরগুলো পড়িতে পড়িতে সে হাজারিবাগের হ্রদের ধারে চলিয়া যাইত। সন্ধ্যার অঞ্চলনিম্নে জলকূলে বসিয়া বহুদিন পূর্ব্বে শান্তির সহিত যে সকল কথা কহিয়াছিল, সে সকলের পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইত। পর্ব্বত-গাত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে দুইটি নাম দেখিতে পাইত। প্রথম প্রথম সে এ সকল চিন্তার সহিত দ্বন্দ্ব করিত, কিন্তু দ্বন্দ্বের সমস্ত আঘাত প্রতিহত হইয়া তাহার কষ্টক্লিষ্ট চিত্তকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিত। ক্রমে সে পথ ছাড়িয়া দিল। মন তাহার উজানে ভাসিয়া চলিল। কল্পলোকের মধ্য দিয়া হৃদয়ে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে কেবল সে এবং শান্তি ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশাধিকার রহিল না। এই প্রাসাদের মধ্যে বসিয়া সে শান্তিকে প্রশ্ন করিত, আদর করিত, ভালবাসিত। শান্তিকে কোন কোন দিন তিরস্কার করিত, প্রত্যুত্তরে সে কেবল ছলছল আনত আঁখি দুইটি তুলিয়া ধরিত। এক এক সময়ে অমিয় তাহার ভালবাসার পরিমাণ জানাইতে যাইত এবং প্রত্যুত্তরের আশায় মুখ তুলিয়া দেখিত, দুইটি ঢলঢল দৃষ্টি তাহাকে স্নান

করাইয়া দিতেছে। দৃষ্টিতে ভালবাসা যেন উপছিয়া পড়িতেছে।

এমনি করিয়াই দিন যাইতেছিল। অলক্ষ্যে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে মহীরুহে পরিণত হইতে চলিল। একদিন নির্ম্মল সূর্য্যালোকিত মধ্যাহ্ন আকাশ হইতে বজ্র পাতের ন্যায় অমিয় শুনিল শান্তির বিবাহ হইতেছে। পাত্র বড়লোক, কলিকাতায় থাকে, কলেজে পড়ে। আঘাত যখন সাংঘাতিক হয়, অনুভবশক্তি তখন রহিত হইয়া যায়। এই সংবাদ শুনিয়া অমিয়র চিত্তবৃত্তি অসাড় হইয়া গেল।

এই সংবাদের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া গেল একটি লাল চিঠি। সে কলেজ হইতে ফিরিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহার মা একটা লাল চিঠি হাতে আনিয়া বলিলেন, তোকে বীরেশ্বরবাবুর ছেলে ডাকতে এসেছিল। বল্‌ছিল, তিন চার মাস হল তুই নাকি ও-পাড়াই মারাস্ নি। তিনদিন পরে শান্তির বিয়ে, তাই তোকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। বীরেশ্বর বাবুর স্ত্রী এসে আমাদেরও বলে গেছেন।

অমিয় তাড়াতাড়ি খামটা হাতে লইয়া পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। এবং সেখানে গিয়া নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎটা একবার ভাবিয়া লইবার চেষ্টা করিল। অতীতের কতগুলো খণ্ডঘটনা মনে পড়িতে লাগিল, ভবিষ্যৎ একটা অন্ধকারে লুকাইয়া রহিল। লাল খামটা খুলিতেই একটা ছোট সোনালি জলে ছাপান চিঠি বাহির হইল, এবং তাহার একটি অক্ষরও না পড়িয়া কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

পরের দিন অমিয় পিতাকে বলিল, কলেজ সাতদিন বন্ধ আছে। আমার ইচ্ছে এই ক'দিন দেশে গিয়ে থাকি।

পিতা তৎক্ষণাৎ সম্মতিদান করিলেন। সে সেইদিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে দেশে রওনা হইল।

পল্লীর ছায়া-শীতল নীরবতার মধ্যে কবি-কথিত শান্তির এতটুকু আভাসও অমিয় দেখিতে পাইল না। সকালে গ্রাম্যপথ ধরিয়া অনেকদূর বেড়াইয়া আসিত। দুইদিন পরে তাহা আর মোটেই তাহার ভাল লাগিল না। সন্ধ্যার পর চারিদিকে শৃগাল ডাকিতে থাকিত; দূরের বন-জঙ্গল গভীর অন্ধকারে জড়াইয়া যাইত। এ সমস্ত দেখিতে দেখিতে সে এক একবার হাঁপাইয়া উঠিত। সন্ধ্যার পর ঘরে একটি কেরোসিনের আলোর সম্মুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিল; কাল এতক্ষণ বীরেশ্বরের বাড়ীতে কিরূপ ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের একটি গৃহকোণে বসিয়া সে কলিকাতার কোন বিবাহবাটীর ব্যস্ততা, কোলাহল, লোক-জন, বর, বধূ, বিবাহ প্রভৃতি প্রত্যেকটি স্পষ্ট চোখের উপর দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার হৃদয়-মন এক তীব্র মাদকতায় ভরিয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতে সে নায়েবকে বলিল, আমি আজ কলকাতা যাব।

নায়েব বলিলেন, সে কি দাদাবাবু, তুমি যে বলেছিলে সাতদিন থাক্‌বে? পাড়াগাঁ বুঝি আর ভাল লাগছে না?

সংক্ষেপে 'না' বলিয়া অমিয় চলিয়া যাইতেছিল, নায়েব পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার নাকি একটা চিঠি এসেছে দাদাবাবু। কাল ডাক-মাষ্টারের বাড়ী তামাক খেতে গিয়ে এনেছি। ব্যাটারা ত' আর বারটার আগে চিঠি দেবে না। দাঁড়াও আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।

তিনি একটা খাম আনিয়া অমিয়র হাতে দিলেন। খাম খুলিতেই প্রথমে একটা বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র বাহির হইল। তাহার সঙ্গে আর একটা চিঠি; পড়িয়া দেখিল তাহার বন্ধু সুরেশের বিবাহ; সে বিশেষ করিয়া তাহাকে যাইতে লিখিয়াছে। তাহার পিতার নিকট বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া এই পত্র লিখিয়াছে। নিমন্ত্রণপত্রের কয়েকটা ছত্র পড়িতেই সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সুরেশের বিবাহ বীরেশ্বরের কন্যা শান্তির সহিত; এবং লগ্ন আজই সন্ধ্যার পর!

নায়েব অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন, কোন কুসংবাদ এসেছে কি দাদাবাবু?

অমিয় বলিল, না; আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিতে হবে।

নায়েব বলিলেন, পঞ্চাশটা টাকা ত হবে। কিন্তু—কর্ত্তা-বাবু বুঝি কিছু লিখেছেন?

চলিয়া যাইতে যাইতে অমিয় বলিল, হ্যাঁ। আমি আর এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরুবো।

গাড়ীতে চড়িয়া অমিয়র প্রথম ভাবনা হইল, সে কোথায় যাইবে! মনে পড়িল রাঁচিতে এক আত্মীয় আছেন, তিনি

কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্থির করিল, রাঁচিতেই যাইবে। কিন্তু রাঁচির গাড়ী রাত্রে ছাড়ে, সমস্ত দিনমানটা কোথায় কাটাইবে ভাবিয়া পাইল না। বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কলিকাতার অন্য কোন স্থানে এই কয়ঘণ্টা কাটাইবার ইচ্ছাও তাহার হইল না। স্থির করিল, কলিকাতায় অপেক্ষা না করিয়া অন্য কোন বড় ষ্টেশনে রাত্র পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। ষ্টেশনে নামিয়াই শুনিল একটা গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, গাড়ীটা খড়্গপুরের দিকে যাইবে। সে তৎক্ষণাৎ বিনা টিকিটেই গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। গাড়ী শব্দ করিতে করিতে আস্তে আস্তে ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

অগ্নিস্পৃষ্ট ব্যক্তি যেমন যতই ছটফট করে, কিছুতেই তাহার দাহের যন্ত্রণার উপশম হয় না, তেমনি অন্তরের দাবানল লইয়া অমিয় যতই ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিছুতেই সে অনল নিবিল না। রাঁচিতে আসিয়া মাতাকে একটি সংবাদ দিয়াছিল। তাহার কিছুদিন পরে মাতার এক পত্র পাইল। তাহার আকস্মিক অন্তর্ধানে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, কর্ত্তা তাহার আচরণে বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন, সে যেন পত্রপাঠ চলিয়া যায়। চিঠির একটি কথা পড়িয়া সে বড় আহ্লাদিত হইল, পিতা রাগ করিয়াছেন। পত্রের উত্তর দেওয়ার কথা একটিবারও তাহার মনে আসিল না। পত্রখানা পাকাইয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

এক সপ্তাহ পরে মাতার নিকট হইতে দ্বিতীয় পত্র আসিল। সমস্ত পত্রটাই দুঃখ ও মিনতি করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার শরীর খারাপ, সে যেন তাঁহাকে দেখিতে যায়। পত্র পড়িয়া অমিয় কয়েকঘণ্টা ভাবিল, পরে বাড়ীতে জানাইয়া দিল সে পরদিন কলিকাতা যাইবে।

কলিকাতার বাড়ী গিয়া দেখিল, পিতার মুখ আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর। সে পিতার সহিত কোন কথা না কহিয়া মাতার নিকট গেল। দেখিল, তিনি শায়িতা, অসুখ বিশেষ কিছু নয়, তবে বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সেই সন্ধ্যায়-মাতা ও পুত্রের অনেক কথা হইল। কিন্তু কেহই একবারও শান্তির কথা বা তাহার বিবাহের কথা তুলিলেন না।

অমিয় সহজ ভাবেই দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার অন্তর মধ্যে যে অগ্নি হৃদয়-প্রাসাদটিকে ভূমিসাৎ ও ভস্ম করিয়া দিয়া ধিকি ধিকি করিয়া নিবিয়া আসিতে লাগিল তাহার তীব্র তাপ ক্রমে বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। পিতা মাতা চিন্তিত হইলেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে মায়া পুত্রকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অমিয় মাতার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, আলো জ্বালো নি কেন মা?

মা বলিলেন, মনটা আজ ভাল নেই বাবা। আয় কাছে আয়।

অমিয় মাতার কোল ঘেঁসিয়া বসিল। মায়া বলিলেন, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না অমি।

অমিয় বলিল, কেন মা? তা হ'লে আমিও আর বেশী দিন বাঁচবো না।

মায়া পুত্রের মস্তকে হাত রাখিলেন, বোধ হয় মনে মনে আশীর্ব্বাদই করিলেন। একটু পরে সহসা সচেতন হইয়া বলিলেন, একটা কথা রাখ্‌বি বাবা?

কি কথা, মা?

মায়া বলিলেন, বল্ আগে রাখ্‌বি। আমার গায়ে হাত দিয়ে বল্।

পুত্র মাতার পায়ে হাত রাখিয়া বলিল, তোমার জন্যে যদি প্রাণপাত করতে হয় তাও করবো।

মায়া বলিলেন, তবে শোন্। একটি ব্রাহ্মণের জাত রক্ষা কর্। আমি কথা দিয়েছি। তারা বড় গরীব লোক।

অমিয় সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল, কথা দিয়ে ফেলেচ মা? তার আগে আমাকে একবার বল্‌লে ভাল করতে। বলিয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্ধকারে জননীর চক্ষু দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

সে রাত্রে অমিয়র নিদ্রা হইল না। নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নি আর একবার দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, এবং তাহারই তীব্র জ্বালায় সমস্ত রাত্র ছটফট করিয়া কাটাইল। ভাবিল, জীবনে আর একটিবার শান্তিকে দেখিতে হইবে। শুধু

একটিবার মাত্র। যে বারিরাশি তাহার দুকূল প্লাবিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ বর্ষার বিদায়ে সে জলপথ মরু হইয়া রহিয়াছে। সে আর একবার সেই জলধারার উৎসমুখের সন্ধানে যাইবে বলিয়া স্থির করিল, যদি এক ফোঁটা বারিও ছিটাইয়া পড়িয়া তাহার মরুজ্বালার বিন্দুতম অংশ ক্ষুদ্রতম সময়ের জন্যও নিবাইয়া দেয়! পরদিন প্রাতেও এ আগুন নিবিল না। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বন্ধু সুরেশের বাড়ী যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল।

* * * *

সুরেশ সবেমাত্র উপরের ঘর হইতে নীচে আসিতেছিল, দূর হইতে অমিয়কে দেখিয়া ভাল চিনিতে পারিল না, কাছে আসিয়া তাহাকে চিনিতে পারিতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আরে অমিয় যে! এতদিন তোমার দেখা শুনো নেই কেন? তোমার কি কোন অসুখ করেছিল? চেহারা ভয়ানক বিশ্রী হয়ে গেছে। চল চল, ভেতরে চল।

অমিয় চাহিয়া দেখিল সুরেশের মুখ ভরিয়া পরিপূর্ণ আনন্দের চিহ্ন বিদ্যমান। একটা তপ্ত নিশ্বাস ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, তোমরা সব ভাল আছ ত?

'তোমরা'র অর্থ সুরেশ বুঝিল। বলিল, শুনলুম্ আমার শ্বশুরবাড়ীর সকলের সঙ্গে তোমার খুব পরিচয় আছে। জান ত আমার বিয়ে হয়েছে? তুমি ত' এলেই না। আমার বৌ অনেকবার তোমার কথা বলেছে। তোমাকে ডাকতে গিয়ে শুনেছিলুম তুমি দেশে চলে গিয়েছ। এখন আমার সঙ্গে উপরে এস, বৌকে একটু আশ্চর্য্য ক'রে দেওয়া যাবে। বলিয়া সে অমিয়কে একপ্রকার টানিয়া উপরে লইয়া চলিল।

শান্তি পিছন ফিরিয়া বোধ হয় শয্যা পরিষ্কার করিতেছিল, পদশব্দে ফিরিয়া স্বামীর সহিত আর এক পুরুষকে দেখিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেল এবং ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া অমিয়কে চিনিতে পারিয়াই একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

অমিয় একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, ভাল আছ ত? আগেকার চেয়ে হঠাৎ বড্ড বড় হয়ে গেছ দেখছি।

শান্তির বিস্মিত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, এ কি অমিয়-দা, আপনি এত রোগা হয়ে গেলেন কি করে? কোন অসুখ ক'রে নি ত'?

অমিয় হাসিয়া বলিল, অসুখ? না, তেমন কিছুই হয় নি।

সুরেশ বলিল, তবে কেমন হয়েছে?

অমিয় বলিল, কেমন হয়েছে ভেবে পাই নি। পরে প্রসঙ্গকে চাপা দিয়া বলিল, কিন্তু তুমি বেশ মোটা হয়েছো।

সুরেশ একবার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল, ম্যারেজ টনিক, ম্যারেজ-টনিক! তোমরা কথা বল, আমি মুখ ধুয়ে আস্‌ছি। বলিয়া সে চটি জুতার শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

জুতার শব্দ যতক্ষণ না মিলাইয়া গেল, ততক্ষণ অমিয় মনোযোগের সহিত সে শব্দের অনুসরণ করিল। পরে ঘাড় ফিরাইলেই যাহাকে দেখিবে এবং একমাত্র যাহাকে দেখিবার আশায় প্রাতে এতখানি পথ আসিয়াছে তাহার সহিত এত-দিন পরে কিরূপে চোখে-চোখে চাহিয়া কথা কহিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

শান্তি ডাকিল, অমিয়-দা?

অমিয় ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া বলিল, কি শান্তি? কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল নাম ধরিয়া ডাকিবার অধিকার আর তাহার নাই। আবার মাথা হেঁট করিয়া জুতাটা ঘসিতে লাগিল। শান্তি ক্ষণপরে বলিল, একটা কথা রাখবে দাদা?

অমিয় নির্ব্বাক বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল।

শান্তি পুনশ্চ কহিল, রাখবে?

কণ্ঠে সমস্ত বল আনিয়া অমিয় বলিল, রাখবো, নিশ্চয়ই রাখবো।

শান্তি একটু ভাবিয়া বলিল, তুমি বিয়ে কর। আমাকে বৌ-দিদি দেখাবে, আমার দেখতে বড্ড ইচ্ছে হ'য়েছে।

অমিয়র সারা অন্তর একবার শীতের বাতাসের মত হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্তরের ক্রন্দন অন্তরেই রহিল, মুখে বলিল, এরই মধ্যে বিয়ে করবো? পাশটা বা ফেলটা হই!

শান্তি বলিল, পাশ ফেল পরের কথা। আমি মাসি-মা'র সঙ্গে দেখা করতে গিছলুম্; তুমি মা'র একান্ত আগ্রহ পূর্ণ কর।

অমিয় বুঝিল তাহার অনুপস্থিতে শান্তি বিবাহের পরও

তাহাদের বাড়ী গিয়াছিল এবং মায়া সে কথা পুত্রের নিকট গোপন করিয়াছেন।

অমিয় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বসিল, আচ্ছা সম্বন্ধ ত হোক্। আজ না হয় কাল বিয়ে করতেই ত হবে।

শান্তি বলিল, সম্বন্ধ হয়ে আছে।

অমিয় সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, সেই কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের মেয়ে বুঝি? মা যার কথা বলেছিলেন?

শান্তি বলিল, হ্যাঁ। আমার একটি অনুরোধ—

অমিয় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার অনুরোধ রাখবো শান্তি। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি।

শান্তির মুখ উজ্জ্বল হওয়ার পরিবর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু অমিয়র তাহা লক্ষ্য করিবার মত অবস্থা ছিল না।

এক মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া শান্তি বলিল, মেয়ে দেখবে?

অমিয় শুধু বলিল, না।

সে যেন স্বেচ্ছায় এক গুরুদণ্ড গ্রহণ করিল, এবং সেই ভবিষ্যৎদণ্ডের কথাই ভাবিতেলা গিল।

সিঁড়িতে চটির আওয়াজ পাওয়া গেল এবং অনতিপরেই সুরেশ প্রবেশ করিয়া বলিল, কি হে, কথা ফুরুলো?

অমিয় হাসিয়া বলিল, হাঁ ফুরুলো। এইবারে নটেগাছ মুড়িয়ে আমি চললুম।

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, যাবে কি হে? খেয়ে দেয়ে যাবে। তুমি এসেছ ব'লে ভাবছিলুম আজ মড়া-চেরা কামাই করব।

অমিয় বলিল, তার দরকার নাই। বাড়ীতে ব'লে আসি নি।

শান্তি বলিল, এ-বেলাটাও খেয়ে যাবে না অমিয়-দা?

অমিয় বলিল, সকালে না হয় খাবার খেয়ে যাব। কিন্তু ভাত খাওয়া আজ আর ভাগ্যে হয়ে উঠবে না। এবার থেকে খাওয়ার অত্যাচার প্রায়ই করবো। বলিয়া সে হাসিতে গেল কিন্তু কণ্ঠ ঠেলিয়া হাসি আর বাহির হইল না।

শান্তি মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং বলিয়া গেল, খাবারের আয়োজন করিতে যাইতেছে। সুরেশ বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিল কিন্তু অমিয়র তাহা মোটেই ভাল লাগিল না। এই শয্যা উপাধান আসবাব, এমন কি গৃহটা পর্য্যন্ত তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

জলখাবারের পর অমিয় আর একদিন আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া উভয়ের নিকট বিদায় লইল। রাস্তায় চলিতে চলিতে অনেকখানি পথ সে কিছুই ভাবিতে পারিল না। পরে তাহার মন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাবনাপথ দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিল, তাহার অভিযোগে অনুযোগ করিবার কিছুই নাই। জগতের সমস্ত দেনা-পাওনা যেন সে সবেমাত্র মিটাইয়া আসিতেছে। কাহারও বিরুদ্ধে কিছুই তাহার বলিবার নাই। এ পৃথিবীতে তাহার আশা করিবার কিছুই নাই, অভাব বুঝিবারও কিছুই ছিল না।

মায়াদেবী সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সারিয়া সবেমাত্র আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন, অমিয় ঠাকুর-ঘরের দ্বার হইতে ডাকিল, মা!

তিনি সমস্ত কাজ কর্ম্মের মধ্যে পুত্রের কথাই বার বার ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, বলিলেন, কি রে? এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

অমিয় বলিল, যাব মা? পা ধুয়ে এসেছি।

মা বলিলেন, আয়।

অমিয় ঘরে ঢুকিয়া মায়ের নিকট হইতে একটু দূরে বসিল। মায়া বুঝিলেন সে কিছু বলিতে চায়। বলিলেন, কিছু বল্‌বি?

একটু ইতস্তত করিয়া অমিয় বলিল, তোমার আর অবাধ্য হব না, মা।

মায়া একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তার মানে?

অমিয় দ্বিধাজড়িত স্বরে বলিল, তুমি যে মেয়ের কথা বলেছিলে, তার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ কর। আমি বিয়ে করবো!

পুত্রকে ঠিক এই সুমতি দিবার জন্য কাল সন্ধ্যায় মায়া ঠাকুরের পদে মিনতি জানাইয়াছিলেন, কিন্তু আজ যখন ঠাকুর সুমতি দিলেন, মায়া এতটুকুও আনন্দিত হইতে পারিল না। পুত্রের কণ্ঠস্বরের কম্পন তাঁহার পাঁজরের অস্থিতে অস্থিতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং সমস্ত বুকটা যেন বেদনাতিশয্যে অবশ করিয়া তুলিল। তিনি পুত্রের কথার কোন উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি আচমন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ—

গাব আজ আনন্দের গান

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

—:০:—

মৃন্ময় দেহের পাত্রে পান করি' তপ্ত তিক্ত প্রাণ,
গাব আজ আনন্দের গান।

বিশ্বের অমৃত-রস যে আনন্দে করিয়া মন্থন,
লভিয়াছে নারী তার সুখোদ্বেল তপ্ত পূর্ণ স্তন ;
লাবণ্য-ললিত তনু যৌবন-পুষ্পিত পূত অঙ্গের মন্দিরে,
রচিয়াছে যে আনন্দ কামনার সমুদ্রের তীরে,
সংসার-শিয়রে ;—
যে আনন্দ আন্দোলিত সুগন্ধ-নন্দিত স্নিগ্ধ চুম্বন-তৃষ্ণায়,
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জঙ্ঘায়,
লীলায়িত কটিতটে ললাটে ও কটু ভ্রূকুটিতে,
চম্পা-অঙ্গুলিতে ;—
পুরুষ-পীড়নতলে যে আনন্দে কম্প্র মুহ্যমান,
গাব সেই আনন্দের গান।
যে আনন্দে বক্ষে বাজে নব নব দেবতার পদনৃত্যধ্বনি,
যে আনন্দে হয় সে জননী।

যে আনন্দে সতেজ প্রফুল্ল নর, দম্ভদৃপ্ত, নির্ভীক, বর্ব্বর,
ব্যাকুল বাহুর বন্ধে কুন্দকান্তি সুন্দরীরে করিছে জর্জ্জর,
শক্তির উৎসব নিত্য যে আনন্দে স্নায়ুতে শিরায়,
যে আনন্দ সম্ভোগ-স্পৃহায় ;—
যে আনন্দে বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে গড়িছে সন্তান,
গাব সেই আনন্দের গান।

যে আনন্দে ঝটিকার নগ্ন অভিসার,
সমুদ্রের কল্লোল-উদ্গার ;
যে আনন্দে আকাশের মাতৃদেহ জর্জ্জরিয়া প্রসব-ব্যথায়,
অন্ধকার-গর্ভ হ'তে তারা বাহিরায় ;
যে আনন্দে জ্যোতির্ম্মঞ্চে সূর্য্য চন্দ্র নীহারিকা নিত্য নৃত্যশীল,
যে আনন্দে এ মত্ত নিখিল
ছুটে চলে ক্ষ্যাপা, দিশাহারা ;
যে আনন্দে কদম্ব-জাগানো নব শ্রাবণের ধারা
আনে ডাকি' কাজল-মেঘের সনে সজল-সলীল নীল
নয়নের মোহ,
আনে তৃণ-মঞ্জরীর প্রাণ-সমারোহ ;—
যে আনন্দে ঋতুতে ঋতুতে এত বর্ণ-বিলাসিতা,
সে আনন্দে রচিব কবিতা!

যে আনন্দে পিঞ্জরের দ্বার টুটি' মুক্তি পায় বন্দী বিহঙ্গম,
শিবের তপস্যা ভাঙ্গে যে আনন্দে মন্মথের মিলিলে সঙ্গম ;
যে আনন্দে ভস্ম করে অগ্নি যত সম্ভারের স্তূপ,
যে আনন্দে গন্ধ দেয় দগ্ধ ম্লান ধূপ ;—
নিরানন্দ বন্দরের অন্ধকার ছাড়ি'
যে আনন্দে দেয় দীর্ঘ পাড়ি
ছিন্নপাল ভগ্নহাল জীর্ণ তরী কাণ্ডারী-বিহীন,
শুধু জানে মৃত্যু সম্মুখীন ;—
যে আনন্দে সৈন্যদল জিঘাংসু লোলুপ মাতে শত্রুর হত্যায়,
শোণিতের প্রস্রবণ প্রবাহিত যে আনন্দে কৃপাণ-কৃপায় ;—
মদিরার পাত্র ভরি' যে আনন্দ নিত্য টলমল
সৌরভ-বিহ্বল,
দ্রাক্ষা আর রমণীর বক্ষ হতে যে মদিরা হয় নিষ্কর্ষণ ;—
যে আনন্দে বৃদ্ধ পিতা করেছিল ভিক্ষা হায়, সন্তানের
প্রফুল্ল যৌবন ;
যে আনন্দ পূর্ণ হয়ে অশ্রুজলে আপনারে করি' যায় দান,
গাব সেই আনন্দের গান।

যে আনন্দে পতঙ্গেরা পাখা মেলি' আগুনেরে করে আলিঙ্গন
যে আনন্দে চঞ্চরীরা গুঞ্জরিয়া করে পুষ্প-মঞ্জরীর
মদিরা ভুঞ্জন,
যে আনন্দে উপবাসী, পতিতার শুষ্ক ওষ্ঠে করে
লুব্ধ ক্ষুধার্ত্ত চুম্বন,
যে আনন্দে প্রেয়সীর নব অবগুণ্ঠনের লজ্জা উন্মোচন,
যে আনন্দে পত্রে পত্রে দীপ্ত করতাল,
সে আনন্দে হইব মাতাল !

যে আনন্দে সন্ন্যাসীরা দেহ হ'তে জীর্ণ বস্ত্র
ফেলে দেয় টানি ;
স্কন্ধে বহে বৈরাগ্যের একতারাখানি ;
যে আনন্দে ভিখারিণী আপনারে নগ্ন করি' দিয়াছিল চীর,
যে আনন্দে মৃত্তিকার গর্ভলীন তৃণদল প্রকাশ-অস্থির ;
যে আনন্দে মানুষেরা নিজ নিজ ভাব দিয়া গড়ে ভগবান
গাব সেই আনন্দের গান ।

ঘেন্নার কথা

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

১

কেতু তার যে ভগিনী-পতিটার কথা উঠ্‌তে বস্‌তে হামেসা বল্‌ত সে-ই দুবার ভেদ আর একবার বমির পর তিন ঘণ্টা থেকেই মারা গেল। দশ-বিশটা গ্রামের লোকের যেখানে যে ভগিনী-পতি ছিল, কেতুর ভগিনী-পতি অশ্বিনী তাদের সকলের উপরকার টেক্কা, এই সিদ্ধ কথাটা কেতুর মুখে শুনে কেউ বিশ্বাস কর্‌ত, কেউ কর্‌ত না। মুখের কথায় যাদের সে প্রত্যয় করাতে পার্‌ত না তাদের কেতু বল্‌ত, একবার আন্‌ব তাকে বাড়ীতে, তখন দেখবি হ্যাঁ কি না। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাগ্রস্তের মত বাঁ হাতের দুই আঙুল দিয়ে চিবুক টিপে ধরে বল্‌ত, কিন্তু সে কি আস্‌বে! একটি দিন কি তার কামাই হবার যো আছে! দিন গেলে সে সাত আট টাকা কামায়!—বলে সে ভুরু তুলে থাকৃত।

যাবতীয় ভগিনী-পতির সেরা কেতুর ভগিনী-পতি সেই অশ্বিনী হঠাৎ মারা গেল। মৃত্যু-সংবাদ শুনে কেতু ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল। বুদ্ধদেব অন্তরের খিল এঁটে দিয়ে মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন; কেতু ঘরের খিল এঁটে দিয়ে যে সত্যটা আবিষ্কার করে ফেল্‌ল সেটা যেমন মৌলিক তেম্‌নি অবাক্-করা! কেতু খিল খুলে' গাঁয়ে বেরিয়ে প'ড়ল; মানুষের সঙ্গে দেখা করে' কেঁদে কেঁদে শুনিয়ে বেড়াতে লাগল, শুনেছ, ভাই, ভগিনী-পতিটা মারা গেছে। ভগিনী-পতি মানেই অশ্বিনী, এর মধ্যে কষ্টকল্পনা কিছু নেই।

—সেই অশ্বিনী ত? আ হা হা! কি হয়েছিল? মৃত্যু-সংবাদের পিঠপিঠ পরের প্রশ্নই ঐ।

প্রত্যুত্তরে কেতু সাদমাঠা কলেরার কথাটা মুখেও আনিল না। কলেরা অত্যন্ত সাধারণ ব্যারাম; কলেরায় মানুষের সাধারণভাবে মরার কথা সবাই জানে। কেতু চোখ মুছে' বলল, সে যে কি ব্যারাম তার নাম নেই। সে ব্যারাম নাকি বিলেত থেকে নতুন এসেছে। দশ হাজার টাকা মাইনে পায় এক সায়েব মরেছে ঐ ব্যারামে, তার পরেই আমার ভগিনী-পতি অশ্বিনী। জরজারি ওলাউঠো বসন্তে মরবার লোক সে ছিল না। অতবড় জোয়ান আর রোজগেরে মন্দ কি তোমাদের মত আটপৌরে পিলে বেড়ে মরে?—বলে' কেতু নাক আকাশে তুলে' পিলের প্রতি অপার ঘৃণা প্রকাশ ক'রল।

পিলে-বড় কেতুর গ্রামের ছেলেবুড়ো প্রায় সকলেরই ছিল; পিলেকে খাটো করায় তারা বড় অপ্রীত হ'ল—বিশেষ ক'রে ভুবন দত্ত এল্, এম্, পি। ভুবন দত্ত বহুদিন থেকে আবালবৃদ্ধবণিতার পিলে টিপে খাচ্ছে—পিলেকে সে রাজ-যক্ষ্মার চাইতে বড় করে' জাহির করে' এতদিন মানুষকে ভয়

দেখিয়ে এসেছে ; এই গণতন্ত্রের যুগে মর্‌তে হয় ত মর্ পিলে বেড়ে।—কিন্তু পিলে বেড়ে মরার প্রতি কেতুর হঠাৎ এই প্রকাশ্য অশ্রদ্ধায় ভুবন দত্ত জোয়ান আর রোজগেরে মানুষের উপরে চটে গেল।

পার্ব্বতী তার ডাগর পেটটার উপর হাত বুলিয়ে বল্‌লে, পাড়াগাঁয়ে আমাদের চিরকাল বাস, আমাদের গেঁয়ো পিলেই ভাল ; দু এক বছর দেখে শুনে একটা ব্যবস্থা করে' মরা যায়। তোমার বিলেতী ব্যামোর ছোঁ-মারা আমরা চাই নে। কি বল, ছিচরণ ?

ছিচরণ তার হরিদ্রাবর্ণ চোখ দুটো উল্টে ফেলে বলল, আমিও তাই বলি। পিলে বাড়ায় সুখ কত—একটু পুরনো হ'য়ে গেলেই ব্যস্ নিশ্চিন্দি ; তখন আর খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচের নাই ; আস্তে আস্তে কেমন সব সয়ে আসে ; রোগের দুঃখুই থাকে না।

অদ্বিতীয় ভগিনী-পতি অশ্বিনীর মৃত্যুতে কেতু মর্ম্মে আঘাত যতই পাক্ সান্ত্বনার কথাও দু' একটা ছিল না এমন নয়। এক কথা এই যে, মরা-মানুষকে যতই বাড়াও তার নিজে এসে নিজেরই বিপক্ষে সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়াবার ভয়টা একেবারেই থাকে না ; দ্বিতীয় কথা, অশ্বিনীর হাতে টাকা ছিল—টাকাটা এসে পড়েছে ভগিনী ফুলির হাতে।

শোভাযাত্রার আগে আগে উঁচুতে যেমন নিশানা চলে তেম্‌নি করে ভগিনী-পতিকে সকল কথার আগে আগে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে কেতুর একটা ভাবনা ধরে গেল—অশ্বিনী ঢের টাকা রেখে গেছে, টাকাটা বে-হাত হ'য়ে না যায়, ফুলি বিধবা হ'য়ে কষ্টে না পড়ে, মানুষ চক্রান্ত করে ভগিনীকে ফাঁকি না দেয় ইত্যাদি ভাবনা খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই বড় হ'য়ে কেতুর অভ্রভেদী ভগিনী-পতিকেও ছাড়িয়ে উঠ্‌ল।

অশ্বিনী মেজ ভাই ; বড় তারিণী, বড় ধূর্ত্ত—যত ভয় তাকেই ; ছোট বিপিন, নাবালক। কেতুর ভগিনী ফুলি অশ্বিনীর দ্বিতীয় সংসার, প্রথম সংসারের এক্‌টি ছেলে আছে, ক্ষুদে' ; জ্যাঠাই তাকে মানুষ করে।

চারিদিক বিবেচনা করে কেতু ফুলির কাছে খবর পাঠালে—বিশেষ কথা আছে, পরশু তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছি ; ইতিমধ্যে খুব সাবধানে থাক্‌বে।

অতিশয় ভারাক্রান্ত মনে কেতু ভগিনীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে বেরুল। মানুষের যে বিপদের বড় বিপদ নাই সেই বিপদের সময় অশ্বিনীর কোনো উপকারে সে লাগে নাই, পৃথিবীর কেউ লেগেছিল কি না সন্দেহ ; অশ্বিনী মারা যায় বিদেশে কিন্তু মৃত্যু ঘটে গেলেই যে বিপদের বিকার বেরিয়ে যায় তা নয়।—যে মরে সে মরে' যে বিপদের সূত্রপাত করে রেখে যায় সে বিপদভোগের চাইতে কখন কখন জীবিতের মৃত্যুই ঢের ভাল। এম্‌নি ধারা বিপত্তির আশঙ্কা করে কেতু ভগিনীর পাশে ছুটে এল, কিন্তু এসে দেখল যে, বিপদ এসে বেরিয়ে গেছে, সে দেরী করে এসেছে।

কেতুর ভগিনী ফুলি বড় চাপা মানুষ। ফুলি কেতুর অনেক ছোট, তবু ছোটর কাছে সে ছোট হয়ে পড়ে—ছোটরই এমন রাশভারি চেহারা যে কেতু যেন থই পায় না।

কিন্তু দাদাকে দেখে এবার ফুলি কেঁদে ভাসাল—অল্প বয়সের বৈধব্য তার বড় বেজেছে। কেতুও ভগিনীর সাধ আশা-বিবর্জ্জিত শূন্য নিরাভরণ মূর্ত্তি দেখে কেঁদে উঠল। উভয়ত কান্নাকাটির পর চোখের জল মুছে ফেলে কেতু টাকার কথাটা তুলতেই ফুলি বলল, সে অনেক কথা, দাদা, এখন থাক্ ; এখন খাও দাও ; টাকার কথা পরে হবে 'খন্।

ফুলির আলাদা ঘর, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি সবই আলাদা ; ভাসুর তারিণীর সঙ্গে তার কোনো দিক্ দিয়েই স্পর্শ নেই।

কেতু খেয়ে উঠলে ফুলি তার তামাকের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতেই কেতু বল্‌ল, তুই খে গে যা' আমিই—

ফুলি বল্‌ল, আজ একাদশী।

কথাটা হঠাৎ শুনে' কেতু ছাঁৎ করে সত্যিকার একটা ব্যথাই পেল। আজকার তিথিটা সে জান্‌ত না ; জান্‌লে আজকার দিনটা সে বাদ দিয়েই আস্‌ত। একাদশীর কথাটা উচ্চারণ করতে সদ্য বিধবার স্বর কেঁপে' উঠল না বটে, কিন্তু ঐ দু'টি শব্দের মধ্যে সর্ব্বস্ব হারান'র যে নিত্য হাহাকার

থাকে সে যে সকলের পরিচিত—তাকে অস্বীকার করবার উপায় অবোধেরও নাই, ছোট বোন্‌টির কণ্ঠে আজ তাই ধ্বনিত হইল। ব্যথায় নিরতিশয় ম্লান চোখ তুলে ভগিনীর মুখের দিকে কেতু চেয়ে দেখল; তার মনে হ'ল, বৈধব্যের মত কষ্ট নারীর বুঝি আর কিছু নাই—একটি লোকের মৃত্যুতেই সংসারের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন সামান্য এই কয়দিনেই তার এমন শিথিল হয়ে গেছে, আর তা এমনই সুস্পষ্ট যে তার দিকে চাহিলে চোখে জল আসে; বিসর্জ্জনের ঢাক বাজলে দেবীমূর্ত্তির দিকে চাইলে যেমন আপনিই চোখে জল আসে ঠিক্ তেমনি।

ফুলি দাদার প্রাণের ব্যথা আর চোখের জল তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল, কিন্তু তার নিজের চোখে জল এল না। যার অল্পসল্প হারায় সেই বেশী করে কাঁদ্‌তে পারে, কিন্তু যার সর্ব্বস্ব যায় সে তা পারে না; তার কান্নাও অকূলের মধ্যে হারিয়ে যায়।—অন্তত আমরা জানি ফুলির এখনকার শুষ্কচক্ষুর কারণ তাই।

যা হোক্, খানিক অপেক্ষা করেই কেতু আসল কথাটা তুলল, যা হবার তা ত হ'য়ে গেছে ফুলি! ভগবান যা নিয়েছেন শত কাঁদলেও তিনি তা ফিরিয়ে দেবেন না। তবু মন বোঝে না, তাই আম্‌রা কাঁদি। তা সত্ত্বেও নিজেকে বাঁচবার উপায় ত দেখতে হবে। তার কি করব?

ফুলি বলল, আমি অবলা মানুষ দাদা; আমি উপায়ের কি জানি! তোম্‌রা যা বলবে তাই আমি করব।

ফুলির এই নির্ভরতা কেতুর বেশ মিষ্ট লাগল। বলল, পরস্পর এর-ওর মুখে শুনেছি, অশ্বিনী ঢের টাকা রেখে গেছে। সেগুলো কি হ'লো? আছে ত?

জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তরের প্রতীক্ষায় কেতু ঘাড় উঁচু করে রইল।

কিন্তু এবার ফুলির চোখের কোণ ভিজে' এল। বলল, না, দাদা, নেই।

অবলম্বনের শেষ কুটোটা কে যেন আচম্‌কা টেনে নিল এম্‌নিভাবে চম্‌কে' উঠে' কেতু বলল, নেই?—তার মানে?

নেই দাদা। ভাসুর নিয়ে নিয়েছেন।

নিয়ে নিয়েছেন কি রকম? আমরা কিছু বিন্দুবিসর্গ জান্‌লাম না শুন্‌লাম না, আর খাম্‌খা সে নিয়ে নিয়েছে কি রকম? কোথায় সে?

ফুলির ভাসুরকে পেলে তখনই গ্রাস করে এমনি কেতুর ভাব।

ফুলি বলল, বেরিয়েছেন কোথায় ছাতি চাদর নিয়ে।

কেতুর আর কিছুমাত্র ধৈর্য্য রইল না; মাটি চাপড়ে' বলল, চুলোয় যাক্ সে। তুই-ই বা কেমন নির্ব্বিবাদে দিয়ে দিলি?

নির্ব্বিবাদে দেই নি, দাদা। ঘটনা হ'ল কি তা' শোনো। খবর যেদিন এল তারপর তিনদিন ত' আমি বেহুঁস হয়ে পড়ে। চারদিনের দিন ভাসুর এসে বললেন, যা' হবার তা' ত' হ'ল, মেজবৌ। এখন তোমাদের নিয়ে হয়েছে আমার মস্ত ভাবনা।

কেতু মুখ খিঁচিয়ে বলে' উঠল, ভাবনা? ভারি ভাবনা তার। আমরা আছি কি ক'রতে?

ফুলি দাদার রকম দেখে' একটু কষ্টের হাসি হেসে বল্‌ল, ভাসুর বল্‌তে লাগলেন, কষ্ট হলেও বল্‌তে হবে যে, সে অভাবে তোমাদের দেখাশোনার ভার পড়ল' আমার উপর। এখন খরচ-পত্রের একটা দিন আসছে তার কি করতে চাও? আমি ক্ষুদেকে দিয়ে বলালাম, তিনি মুখে কিছু বলে' যান্ নি, আর বল্‌বার সময়ই বা তিনি পেলেন কই; তা' না বলে' গেলেও আমাকে তিনি আপনাদের হাতেই সমর্পণ করে' গেছেন।—

কেতু বলে উঠল, ঐখানটাতেই মস্ত ভুল করে বসেছিস্ তুই। তখন আমার নামটা কর্‌লি নে কেন?

করেছিলাম; শোনোই আগে।

দেড়বছরের ছেলেটা ফুলির পিঠের উপর উবুড় হয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে মায়ের মুখ খুঁজছিল; তাকে সাম্‌নের দিকে টেনে এনে ফুলি বল্‌তে লাগল, আমি বল্‌লাম, তবে আপনারা যদি বিধবাকে তাই না দেন, আমার দাদা আছেন, তিনি আমাকে আর নাবালক ভাগনে দুটিকে দুবেলা দুমুঠো ভাত দিতে কাতর হবেন না; হাজার হলেও তিনি মায়ের পেটের ভাই; তিনি আমাকে ফেল্‌তে পার্‌বেন না। তাতে

ভাসুর বল্‌লেন, ঝগড়ার মত কথা কয়ো না, মেজবৌ। তোমার দাদা সেই কেতু ত? তার নিজেরই ভাত জুটে না, সে আবার খাওয়াবে পরাবে তোমাদের! বলেই ভাসুর হা হা করে হেসে উঠলেন।

কথাটা শুনে কেতু চোখ ফিরিয়ে একটা ঢোক গিল্‌ল। বললে, হাঁ। তারপর?

তারপর ভাসুর বলতে লাগলেন, মেনে নিলাম তোমার দাদা খাওয়াবে পরাবে সব করবে, কিন্তু আমি যদি এখন তোমাকে যেতে দি তবে লোকে আমাকে কি বলবে! অমানুষ বলবে না? ছি ছি করবে না? বলবে না যে, ভাইটা মরতে না মরতে বৌটাকে তাড়িয়ে দিল? কাজেই দাদা-টাদার কাছে তোমার যাওয়া হয় না। তারপর তোমার বড় ছেলেটা আছে; তুমি তার সৎমা হ'লেও সে তার জ্যাঠাইয়ের কাছেই মানুষ। তাকে নিয়ে যাবে না রেখে যাবে? রেখে যেতেই হবে—তাতে তোমার বড় দুর্নামই হবে, লোকে তোমাকে ভাল বলবে না। আর এক কথা, তুমি আমাদের পর ভাবতে পার, কিন্তু আমরা তা ভাবি নে, অন্ততঃ তোমার ছেলেরা ত আমার পর কিছুতেই নয়। কাজেই তোমাকে এই বাড়ীতেই থাকতে হবে, সুখে হোক দুঃখে হোক। তুমি আমাদেরই আপনজন, তোমাদের সব ভার আমাদেরই, কেতুর নয়। এ বাড়ী যেমন আমার বাড়ী তেম্‌নি তোমারও বাড়ী। সে বহুদিন আলাদা খেয়েছে, কিন্তু সে অবর্ত্তমানে তোমাদের ত আমি ভাসিয়ে দিতে পারি নে। দাদা হাজার আপন হ'লেও দাদার সংসার পরেরই সংসার; আমরা হাজার পর হলেও এই সংসারই তোমার আপন সংসার—এ কথা তুমি না বোঝো এমন নয়। এখন কি ক'রবে তা' বল, দাদার ঘরে যাবে, না নিজের ঘরে থাকবে?

ফুলি থামিল।

তুই কি বললি? প্রশ্ন করে' কেতু হা পিত্যেশীর মত হা করে চেয়ে রইল।

আমি বললাম, নিজের ঘরেই থাকব।

ফুলির উত্তর শুনে' কেতু একেবারে দপ করে নিবে গেল।

তাই বললি? বললি নে কেন যে দাদার ঘরেই যাব; দাদা ত আমার পর নয়!

ফুলি যেন অপ্রস্তুতে প'ড়ে বলল, তখন কি রকম মনে হল দাদা, সে কথাটা মনের আগে এল কিন্তু মুখে ফুটল না।

যাক। তারপর?

তারপর ভাসুর ওঁর নাম করে বললেন, সে কি টাকা-কড়ি কিছু রেখে গেছে? আমি বললাম, রেখে গেছেন এই পর্য্যন্তই জানি কিন্তু কোথায় রেখে গেছেন তা' জানি নে। জান্‌তাম, কিন্তু ভয়ে ভয়ে মিছে করেই বললাম, কোথায় রেখে গেছেন তা' জানি নে।

এখানে কি একটা প্রশ্ন করতে উদ্যত হয়েই কেতু থেমে গেল। ফুলি দাদার রুষ্ট মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, ভাসুর তা' বিশ্বেস না করে চলে গেলেন, আবার তখনই ফিরে এলেন এক কোদাল নিয়ে।

কেতু ফুলির ভাসুর তারিণীর উদ্দেশে চাপা দাঁতের ভিতর দিয়ে দুটি শব্দ উচ্চারণ করল—শালা ডাকাত্‌!

তারপর, ভাসুর আমাকে সরিয়ে দিয়ে সেই কোদাল দিয়ে ঘরের মেঝে, ঐ যে হাড়িটি উপুড় করা আছে, ঐখান থেকে, খুঁড়তে সুরু করে দিলেন—

শুনে রাগে কেতুর সর্ব্বাঙ্গ ফুলে চোখ রাঙা হয়ে উঠল। —বলল, তুই থানায় কেন খবর দিলি নে?

আমি অবলা মানুষ, দাদা, কাকে দিয়ে থানায় খবর পাঠাব? কত জনের হাতে পায়ে ধর্‌লাম, ওগো তোমরা কেউ আমার দাদা কেতুকে একটা খবর দেও; তা অবলার কথা কে শোনে, কেউ শুন্‌ল না।

কেতু বলল, সব শালাই চোর।

তা হবে। তারপর ভাসুর আমার ঘরের মেঝে কোদাল মেরে মেরে খুঁড়তে সুরু করলেন, আমি বৌমানুষের লজ্জাসরম ত্যাগ করে হায় হায় করতে লাগলাম; তিনি তা ভুলেও কানে তুললেন না—হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙ্গে, খাট বাক্স উল্টে ফেলে, ধানের জালা, কলাইয়ের ডোল উপুড় করে ছিটিয়ে ছড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করে একেবারে ডাকাত-পড়ার মত তিনি টাকা খুঁজতে লাগলেন। সেইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে

আমার আর সহ্য হ'ল না ; হঠাৎ কেমন মাথা গোলমাম হয়ে কোদালখানা তুলে নিয়ে ভাসুরকে—

মারলি ? বলেই কেতু শিউরে উঠে চোখ বড় করে ফেল্‌ল ; তার চোখের সাম্‌নে যেন তারিণীর তাজা রক্ত ঢেউ খেলতে লাগ্‌ল।

না ; কোদালখানা তুলে নিয়ে ভাসুরকে বললাম, হাঁড়ি খুঁড়ি ভেঙ্গে ঘর চষে আর কি হবে, মাটি পিটে দুরস্ত করে ঘর আবার নেপ্‌তে হবে ত আমাকেই—ঐ কাঠের সিন্দুকটা সরিয়ে খুঁড়ে দেখ যা খুঁজছ তা ওখানেই আছে। বলে কোদাল তাঁর দিকে ফেলে দিলাম।

কেতুর আশা যা ধরে ঝুলে ছিল, ফুলি কোদাল ফেলতেই তার শেষ আশাটাও ছিঁড়ে গেল। বলল, বেশ করুলে ; আহাম্মক আর বলে কাকে ; স্ত্রীবুদ্ধিতে পৃথিবী ছারেখারে গেল—তোর আক্কেলকে কি আর বলব বল্‌।

ফুলি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌ল, তখন কি আমার হুঁস ছিল, না জ্ঞান ছিল ! ছেলের কথা, নিজের কথা, আমার কিছুই তখন মনে ছিল না—সে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। বিধবা হওয়া যে কি কষ্ট তা' তোমরা বেটাছেলে তার কি বুঝবে ! ভাসুরের দস্তিপনা দেখে আমার তখন কেবলি মনে হচ্ছিল, যায় যাক টাকা, আমার যা অদৃষ্টে আছে তা হবে—ঐ লোকটা এখন সামনে থেকে গেলে বাঁচি।

কেতু সোজা সাম্‌নের দিকে চেয়ে রইল, কথাটি কইল না।

ফুলি বলতে লাগল, ভাসুর তাই শুনে ছুটে এসে এক ধাক্কা দিয়ে বাক্সটা সরিয়ে ফেলে, ষণ্ডা ত' কম নয় একটা, এক ধাক্কা দিতেই বাক্স সরে গেল ; কোদালের কোপ সেখানে দু' তিনটা মারতেই মাটির নীচে ঠন্‌ করে—

সঙ্গে সঙ্গে কেতুর আত্মাও বেজে উঠল। কিন্তু ভিন্ন সুরে।

ফুলি বলতে লাগল, বেজে উঠল। আমি ঘেন্নায় পিছন ফিরে চোখে আঁচল দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ; ভাসুর মাটা খুঁড়ে টাকা তুলে নিয়ে চলে গেলেন—টাকা এক কল্‌সী ছিল, কি এক ডেক্‌চি ছিল, কি এক ঘটি ছিল, চোখটা মেলে আমি তা-ও দেখলাম না।

কেতু বল্‌ল, শুনে কিতার্থ হলাম।

কেতুর প্রাণ যেন তুষের আগুনে পুড়তে লাগল। ছুঁড়ি এত বড় নির্ব্বোধ !—ভবিষ্যতে যে দাবি করবে তারও পথটা নিজের হাতেই এমন করে মেরে দিল ! দু' হাজার টাকার ডেক্‌চি সরিয়ে তারিণী এখন ত অক্লেশেই বলতে পারে, টাকা ছিল বটে কিন্তু একটা দু'সেরী ঘটিতে শ' খানেক ছিল, তার বেশী এক আধলাও না। এক কথাতেই উনিশ-শো টাকা লাভ ! ইস্‌।—ফুলি নিজের চোখে পাত্রটা ত দেখেই নাই ; যে জায়গায় পাত্রটা পোঁতা ছিল সেখানকার গর্ত্তটা পর্য্যন্ত সে নিজের হাতেই বন্ধ করে লেপে মুছে বেমালুম করে রেখেছে !

আপশোষে কেতুর ইচ্ছা হতে লাগল, নিজের মাথা নিজে চিবিয়ে খায়। জিজ্ঞাসা করল, পরে তুই জিজ্ঞেসা করিস্‌ নি কত টাকা ছিল ? আর কেউ সেখানে ছিল না ?

ছিল।

তারা কেউ কিছু বল্‌ল না ?

না।

সব শালা ঘুষ খেয়েছে। কত টাকা জিজ্ঞেসা করেছিলি ?

করেছি বৈ কি, তা আর করি নি। তাতে তিনি বল্‌লেন, যা ভেবেছ তা নয়, হাজার দশবিশ কিছু ছিল না, এক-শো বিয়াল্লিশ টাকা ছিল—দশজনের সাম্‌নে আমি তা তখনই গুণে গেঁথে শ্রাদ্ধের খরচ বলে সেই ঘটিতে করেই তুলে রেখেছি স্বতন্তর করে ; সে ভয় ক'রো না, মেজবৌ, বাটপাড় আমি নই। বলে একটু বাঁকা হাসি হাসলেন। শুনে আমি চুপ করে রইলাম, অবলা মানুষ আমি—

বলতে বলতে ফুলির কণ্ঠস্বর বুজে এল।

কেতু বল্‌ল, আসুক আগে তারিণী—

তারিণী এলে সে কি করবে তা সে প্রকাশ করল না ; তবে ভয়ঙ্কর সঙ্কল্পের ঐটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। তারিণী এলে তার ব্যবস্থা তখন হবে—কাজেই কেতু তাকে ততক্ষণের জন্য মন থেকে বিদায় দিল ; কিন্তু উপস্থিত সম্মুখে উপবিষ্ট এই অবলা মানুষটিকে খুন করে সে নিশ্চিন্ত হবে কি নিজে

খুন হ'য়ে মরবে, ভাবনার এই দোটানার মধ্যে সে মনে মনে কেবলি দোল খেয়ে মরতে লাগল।

অবস্থা এম্‌নি সঙ্গীন—এমন সময় উঠানের প্রান্ত থেকে প্রবল কণ্ঠের প্রশ্ন এল, ও-ঘরে কথা কয় কে?

কেতু দোটানার টান ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাহিরে এসে বল্‌ল, আমি, কেতু।

তারিণী বল্‌ল, কখন এলে? বোন্‌কে নিতে এসেছ বুঝি?

না, নিতে ত আমি আসি নি।

তবে কি মনে করে হঠাৎ?

একগাল হেসে কেতু বল্‌ল, কি আশ্চয্যি! বিপদে আপদে আস্‌ব না?

তা আস্‌বে বৈ কি। চল, আমার ঘরে বসি গে, কথা-বার্ত্তা কই গে।

তারিণীর কথার সুরটা কেতুর কেমন যেন লাগ্‌ল। তার বহরে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের দিকে চেয়ে কেতু পরম আপ্যায়িত হয়ে বল্‌ল, চল, চল, উত্তম কথা, তাই বসা যাক গে, গল্প গুজব হবে 'খন।—বলেই সাহ্লাদে ফর্‌ ফর্‌ করে নেমে গেল, যেন তারিণীর ঘরে বসে তার সঙ্গে' গল্পগুজব করার বাড়া কামনা কেতুর হতে পারে না।

কেতু তারিণীর সঙ্গে তার ঘরে উঠতেই দেখল, আরো পাঁচ সাতটা লোক নিঃশব্দে দাওয়ায় বসে আছে—অত্যন্ত বেকায়দা গুণ্ডার মত তাদের চেহারা। কেতু তাদের দিকে একপলক চেয়েই নিরতিশয় ব্যস্তভাবে হুঁকোর মাথা থেকে কল্‌কেটা নামিয়ে নিয়ে তামাক-রাখা চোঙ্গাটা হাতের উপর উপুড় করতেই তারিণী হেসে বল্‌ল, কেতু কি ক্ষেপে গেলে না কি? কুটুম-বাড়ী এসে নিজে হাতে তামাক সেজে খাওয়া! রাখো রাখো, ওঠো।

তাতে কি, তাতে কি? এ ত আমার নিজের বাড়ীই একরকম—বলতে বলতে কেতু কল্‌কে রেখে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তার মনে হল, তারিণী যেন তার ঘাড় ধরে তুলে দিল।

তারিণী বল্‌ল, বাড়ীর সব ভাল ত?

হ্যাঁ, একরকম সব ভালই।

বসো এই পাটিটাতে। দিনকতক আছ ত এখানে?

না, থাকতে আর পারলাম কই, ভাই! সন্ধ্যার পরই ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাব ভাবছি।

তা বেশ। বোনের সঙ্গে কি কথা হল?

কথা আর বিশেষ কি হবে। তবে বেচারী বড় কান্না-কাটি করল; তার টাকাগুলো—

আমার কাছে আছে, একশো বেয়াল্লিশ টাকা থোকে। এই এরা সব জানে, একশো বেয়াল্লিশ টাকা এদের সাম্‌নে আমি গুণে তুলে রেখেছি। টাকাটা তুমি হাতে নিতে পার, কেতু, যদি ইচ্ছে কর। শ্রাদ্ধের খরচটা তোমার হাত দিয়েই হোক। কি বল?

কেতু কি বল্‌ল তা ঠিক স্পষ্ট হল না, তবে অনুমান হল এই যে, তা যদি হয় তবে নেহাৎ মন্দ হয় না।

তারিণী বল্‌ল, তুমি যদি হাতে নেও তবে ত ভালই হয়, আমার অনেক ঝঞ্ঝাট বাঁচে। তোমার হাতে টাকাটা দিচ্ছি, কেন তার মতলবটাও তা হলে তোমাকে বলি। মেজবৌ আমাকে পর ভাবেন—

বল কি? ব'লে কেতু এমন আশ্চর্য্য হ'য়ে রইল যার উপমা নেই।

হ্যাঁ, পরই ভাবেন। এখন তোমার হাত দিয়ে টাকাটা খরচ হ'লে আমি তাঁর কাছে চোর হবার দায় থেকে বেঁচে যাব। কিন্তু একটা কথা ভাই। ফর্দ্দ আমরা করে দেব; কারণ, আমাদেরই ভাই, তার শ্রাদ্ধের কাজ আমাদেরই মুনাসিফ্‌ মত হওয়া দরকার। অশ্বিনীর স্ত্রীকেও আমি তাই বলেছি যে, শ্রাদ্ধে একটু বিশেষ আয়োজন হওয়াই দরকার, সেও রাজি আছে। এখন সেই ফর্দ্দ ধরে কাজ করতে গেলে যদি ঐ টাকায় ব্যাপার শেষ না হয় তবে নাজায় টাকা, ভাই, তোমাকেই দিতে হবে; কারণ কর্ত্তা হবে তুমি। ভাল করে রাজি হও, দাদাটি, আমি বাঁচি।

কেতু মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ তুলে বল্‌ল, কিন্তু আমি জান্‌তাম, টাকা তার একশো বেয়াল্লিশের ঢের বেশী ছিল।

তারিণী হেসে বল্‌ল, শোনো তোমরা, উনি জান্‌তেন! কি করে জান্‌তে তুমি? তোমার কাছে আমরা কোনদিন ত বলি নি। মেজবৌ বলেছে?

না।

তবে? লোকে বলেছে, তুমি তাই শুনেছ আর ভেবেছ তাই ঠিক্। তাই না? তোমার শোনা কথা বড়, না এতগুলো লোকের চোখে দেখা বড়? তোমরাই বল।—বলে তারিণী উপস্থিত সবাইকে সালিশ মান্‌ল।

তাদের একজন বল্‌ল, শোনা কথা মুখে মুখে বাড়ে কত! পরের টাকা আর নিজের আয়ু কি কেউ কম দেখে? তা দেখে না। শোনা কথা, তা আবার পরের টাকার কথা, শুনে যে বিশ্বেস করে সে ত আহম্মক নম্বর এক।

কেতু এক নম্বর আহম্মক বলে একেবারে চুপ করে গেল।

তারিণী বল্‌ল, হ্যাঁ, তারপর যে কথা পথে আস্‌তে আস্‌তে হচ্ছিল—চন্দরের কি হ'ল শেষে?

বেকায়দা গুণ্ডার মত চেহারার একজন বল্‌ল, তা' জানি নে ঠিক; চন্দর সেদিন থেকে একেবারে নিরুদ্দেশ। কিন্তু লোকে বলে তাকে খুন করে লাশ গুম্ করে ফেলেছে।

কি সর্ব্বনাশ! বলে তারিণী মুখ টিপে একটু হাস্‌ল।

কেতুও গুম্ হ'য়ে বসে ছিল, ঘাড় তুলে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছিল ঘটনাটা?

বক্তা বল্‌ল, এই গাঁয়েরই চন্দর চাকি সুদ আদায় করতে গিয়ে আর ফেরে নি; সেই কথা হচ্ছিল। চন্দরের টাকার সুদ দিয়ে দিয়ে তিন গাঁয়ের লোক একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছিল; এদিকে অজন্মা ভুঁই, কারু পেটে নাই ভাত; ওদিকে চন্দরের সুদের দায়। বামুনগাঁয়ের লোক তৈরী হয়েই ছিল—ছুতোনাতায় ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে দিল তার সুদ খাওয়া শেষ করে সেই জলচৌকির উপরেই।

শুনে কেতু আঁতকে উঠল।

তারিণী বল্‌ল, সে গাঁয়ের লোক ভারি খুনে ত!

কে একজন বল্‌ল, এ গাঁয়ের লোকই বা কম যায় কি? চিনি ত তোমাকেও। . . .

* * *

সেইদিন রাত্রি দেড় প্রহরের সময় ফুলির ঘরের পেছন দিক্‌কার বেড়ায় অতি সাবধানে তিনটি টোকা পড়ল।

ফুলি চাপা গলায় বলল, কে?

আমি।

ফুলি উঠে নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল, বাইরের লোকটা ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, কেতু চলে গেছে?

হ্যাঁ, খাইয়ে দাইয়ে বিদেয় করে দিয়েছি।

তোমায় নিয়ে গেল না যে?

টাকাগুলো দিলে না তা নেবে কি!

তারিণী ফুলির থুৎনিটা দু' আঙুল দিয়ে নেড়ে দিয়ে বলল, ক্ষেপী!

———

রৌদ্র

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

ছায়া আসে ঘনতর হ'য়ে জাগো জাগো হে রুদ্র সন্তান,
দীপ্ত তব প্রহরণ আনি' দৃঢ়পদে হও আগুয়ান্।
তীব্র তব বেগময়ী বাণী দিকে দিকে দাও প্রসারিয়া!
ওষধির পত্রময়শাখে, তরুশিরে পড়ুক্ আসিয়া!
বনচ্ছায়া ম্লানতর হ'লে, সুসরল রশ্মিরেখাপাতে,
করো দূর তমোময়ী গ্লানি পরিপূর্ণ শান্তির প্রভাতে।

সূর্য্যসখ, ধীরে এস নামি' ধরণীর সভাগৃহতলে ;
স্বর্ণচূড় মেরুশির 'পরে উষ্ণভাস ! প্রদীপ্ত অনলে
পূত হবি-আহুতির লাগি' কল্যাণের ধ্রুবহাসি হেসে,
উত্তরিয়া এস বীর আজি দীপ্ত দেব-সেনাপতিবেশে।
উদয়ের তীর্থপদ হ'তে উষসীর মলিন আলোকে,
হে প্রমত্ত, সঞ্চরিয়া এস রশ্মি ব্যাপি' দ্যুলোকে ভূলোকে।

শূন্যপথে হও অগ্রসর জ্যোতির্ম্ময়, কনককিরীটি,
মেঘলোকে উঠ' ঝলসিয়া দগ্ধ করি সর্ব্বলোকদিঠি!
তারপরে এস ধীরে নামি' ধরিত্রীর মায়ালোক 'পরে ;
তরুকুঞ্জে কন্দরের ছায়ে অন্ধকার যেথা থরে থরে,
সেথা এস মৃদু হাসি হেসে পরিস্ফুট শুভ্র কুন্দোপম
করস্পর্শে দূর করি' দাও অবিচ্ছিন্ন, বিমলিন তম।

জরা হ'তে ধরারে উদ্ধারি' প্রদানিলে নবীন যৌবন !
শ্যামলতা সঁপি' দিলে তা'রে দূরে গেল অনন্ত ক্রন্দন।
তরুউর্দ্ধে মেলে তা'র শাখা, ফুটে উঠে কোরক, গোপন ;
প্রাণে জাগে করমপ্রেরণা, রূপ ভাসে নয়নশোভন।
সৃজনের ইন্দ্রজালভার বহ' তুমি হাসিতে হাসিতে,
মরুভূর বক্ষ 'পরে রহ' অগ্নিবাণ হানিতে নাশিতে।

তব ক্রোধে কাঁপি' উঠে ধরা হে প্রখর. প্রদীপ্ত ভীষণ,
মহানলে দগ্ধ হয় ভূমি ; কর দর্পে সাগর শোষণ।
ঘূর্ণীবায়ু জাগি' উঠে বেগে ; প্রলয়ের মত্ত অট্টোল্লাসে ;
হাহাকারে পূর্ণ কর দিশা ; ভরে প্রাণ গভীর হুতাশে।
একাধারে বিরাজিছ তুমি সুকোমল, কুলিশ কঠোর,
বিধাতার বজ্রহস্ত তুমি, তুমি পুনঃ সৃষ্টিলীলাডোর।

ছেয়ে' যায় দিশে দিশে যবে বন্ধহারা নীরন্ধ্র, আঁধার,
হিমশীত নিঃস্ব পৃথ্বী ঘিরে জাগি' উঠে মত্ত হাহাকার।
বেদনার বিপুল নিঃশ্বাসে, অবিরাম মৃত্যুর লীলায়,
মহোদ্বেগে কাল যাপে ধরা প্রলয়ের তামসী নিশায়,
নিখিলের প্রার্থনার মাঝে, সুবিপুল প্রাণস্পন্দমান,
ঘনতর বেদনার ছায়ে জাগো জাগো হে রুদ্র সন্তাপ !

(উপন্যাস)

[তৃতীয় ভাগ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাড়ী-মুখো হয়ে আসনের জন্য মন ক্রমেই প্রস্তুত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

সে-দিনের কথা মনে ক'রে আজো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। বিরাট-শক্তির কাছে আত্ম-নিবেদন ক'রে বল্লুম, তুমি জান, আমার বুকের ব্যথা, তুমি জান, কোথায় আমি নিজেকে হারিয়ে ব'সে আছি ; কিন্তু সে কথা প্রকাশ ক'রে বলার আমার সাহস নেই। চারিদিকের বাধা পর্ব্বত-প্রমাণ—সেগুলোকে দু'হাতে দূর ক'রে স্ব-প্রতিষ্ঠিত হবার শক্তি ত আমার নেই!—তাই হে বিরাট, তোমার কাছে দেহ-মন-প্রাণে আত্মোৎসর্গ করচি—তুমি আমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে চল।

মনের এককোণ থেকে যে কি তীব্র-কঠোর বিদ্রূপের অট্টহাসি বেজে উঠ্‌লো—তা কেমন ক'রে বলি।—

ওরে কাপুরুষ, আজ যে দেখ্‌চি ঈশ্বর-ভক্তি তোর প্রকাণ্ড কাজে লেগে গেল!

তখন ইলার কথা মনে পড়্‌লো—মানুষ কত অসহায়—এই জীবনে পরিপূর্ণ আত্ম-নির্ভর ক'রে সে বুঝি চলতেই পারে না ; জীবনের আদিতে রহস্য, অন্তে রহস্য!—কোথা থেকে আস্‌চি—কোথায় চ'লে যাচ্চি—কিছুই জানি নে আমরা। কতটুকু দেখতে পাই—আর কতখানি অদৃষ্ট! বৃহতের কাছে আত্ম-নিবেদন ছাড়া অন্য গতি কৈ?

বাড়ী পৌছলাম যখন—সবে ভোর হচ্চে। প্রণাম ক'রে যাব পায়ের ধূলো নিয়ে উঠার সময় তিনি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে মাথার উপর চুমু দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন—শেষ ক'টি কথা কানে গেল,—সুখী হও,… দীর্ঘজীবি হও …

বুকের ভিতরে রুদ্ধ-বাষ্প যেন নিমেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে' বুকটা ফাটিয়ে দেবার মত ক'রে দিয়ে গেল। চোখের কোলে কোলে কি যেন ভারি হ'য়ে এলো।

বিছানার উপর বসিয়ে দিয়ে মা বল্লেন, বাছা রে আমার।

বুঝলাম, মনের গোপন-ব্যথাটির কথা মা আগা-গোড়া বু'ঝে ব'সে আছেন।

প্রচণ্ড লোভে মনটা কেঁপে উঠলো। মাকে সব কথা বলি, বলি যে, কেমন ক'রে আমার সত্য-আমিকে সমুদ্রের উপকূলে রেখে এসেছি!—এ-আমি, আমি নই, তার ছায়া মাত্র ; কিন্তু একটা উদ্দাম উচ্ছ্বাসে আমার গলা যেন চেপে এলো, একটি কথাও মুখ দিয়ে বার হলো না।

মা বল্লেন, গাড়ীতে ভিড় ছিল বুঝি, সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিস্ নি?

নাঃ।

তুই বোস্, এক মিনিটে চা করে আন্‌চি।

মা চ'লে গেলেন। কি ক'রে সব কথা প্রকাশ ক'রে বলি তাই ভাবচি ;—বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি সকালে বেড়াতে গিয়েছিলেন—তাই এই প্রথম দেখা।

নানা কথার পর বল্লেন, ভারি ইচ্ছে ছিল একবার এদের নিয়ে পুরী যাই ; কিন্তু দাদা অকাল ব'লে ঘোর আপত্তি করলেম।

আমি অবাক হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে চাইতে বল্লেন, তীর্থস্থানে প্রথমবার, অকালে যেতে নেই, গেল বছরটা অকালে গেছে কিনা!

তাঁর মুখে একটা অবিশ্বাসের চাপা হাসিও ছিল।

তারপর তিনি বল্লেন, এ-বছরটা, তুমি আস্‌বে আস্‌বে মনে ক'রে ক'দিন ত কেটেই গেল।

একটু ইতস্তত ক'রে বাবা বল্লেন, একদিন সময় ক'রে ক'নেটি দেখে এসো···

চা হাতে ক'রে মা ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বল্লেন, তাতে লাভ? ও যদি অপছন্দ করে ত বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে নাকি?

অপছন্দ হবেই—এমন কথা তুমি এর মধ্যে ভাব্‌তে বস্‌লে কেন? আমাদের সকলের পছন্দ ছাড়িয়ে ওরই বা অপছন্দ হবে কেন?

মা গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন, সকলের, মানে—ঠাকুর-পো'র ত? তার কথা ছেড়ে দাও। কচি সুন্দর মুখখানি দেখে তার মন গ'লে গেছে—ছবি পর্য্যন্ত এঁকে ব'সে আছে।

বাবা হাস্‌তে লাগলেন, ছবিও আঁকা হ'য়ে গেছে? বটে!

আমার দিকে চেয়ে মা বল্লেন, তবে আর কি, কিরণ, আর কারুর কি অপছন্দ হতে পারে?

মা'র এই কথাগুলো বলার ভঙ্গীর ভিতর একটা চাপা যুদ্ধ-ঘোষণা ছিল। বাবা বোধ করি বেগতিক বুঝে আস্তে আস্তে বাইরের দিকে চলে যেতে যেতে বল্লেন, তোমাদের যা অভিরুচি হয় কর; কিন্তু দাদার কোন অসম্মান না হয় সেটাও দেখতে হবে।

মা বল্লেন, তাঁর সঙ্গে আমি বোঝা-পড়া ক'রে নেব।

বাবা চ'লে যেতেই মা'র হাসি বার হলো। বল্লেন, দেখেছিস্ এঁদের অপরাধ-বোধটা আছে; কিন্তু অভ্যাসকে ছাড়িয়ে উঠতে কিছুতেই পারেন না।

বল্লুম, তোমার ভয়ে বাবাকে যেন একটু ব্যতিব্যস্ত দেখচি মা, খুব বুঝি ধম্‌কাধম্‌কি করেছ?

সতেজে মা বল্লেন, কর্‌বো না? সেই সুরু থেকে বলচি, ওগো তোমরা একটু সবুর করো—আস্‌তে দাও তাঁকে যে বে করবে। ঠাকুর-পো'র আর দেরী সইল না। একেবারে আশীর্ব্বাদ ক'রে ফিরলে।

মা একদণ্ড চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারেন না। বল্লেন, দেখি, তোর চাবিটা, কত কি নোংরা-ভোংরা আছে, সব পাঠিয়ে দি ধোপার বাড়ী।

বাক্সের উপরেই ছিল সেই হারের বাক্সটা; খু'লে দে'খে বল্লেন, এ বুঝি তোর মাসি-মা দিয়েছেন! চমৎকার পছন্দ ত! বড়লোক, জমিদার বুঝি তাঁরা?

বল্লুম, বোধ হয়, এককালে ছিলেন, এখন সাধারণ অবস্থা দেখি।

মা খুব জোর ক'রে বল্লেন, নিশ্চয় তুই জানিস্ নে, কিরণ। আমি বুঝতে পেরেছি।

তা হবে, ব'লে চুপ ক'রে রইলুম

আজকাল কেমন আছেন তিনি?

অনেকটা ভাল, সেরেই উঠচেন।

খুব যত্ন করেন তোকে, না?

বুঝতে পারলুম, মা এমনি ক'রে ধীরে ধীরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন দিয়ে আমার মনটা পরিষ্কার ক'রে বুঝে নিতে চান। তাই হঠাৎ যেন সাবধান হয়ে ছোট ছোট উত্তরে,—হাঁ-না—দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে লাগলুম।

কিন্তু মা'র হাত থেকে সহজে রক্ষা পাবার উপায় ছিল না। একেবারে সোজা প্রশ্ন ক'রে বসলেন, তুই বুঝি নীলমণিকে খুব ভালবাসিস্?

নিমেষে মনটা তোল-পাড় ক'রে গেল। অতিকষ্টে আত্ম-গোপন ক'রে বল্লুম, তাঁদের সঙ্গে আমার খুব আত্মীয়তা হয়েছে মা।

তা ত বুঝতেই পারচি রে—এ বাক্স ত নীলমণি গুছিয়ে দিয়েছে, এ কি তোর কাজ!

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মা বল্লেন, কি কপাল আমার, তাই ভাবচি!

কেন?

কতবার ওঁকে বল্লুম, চলো কিরণকে দেখে আসি গে একবার। তা কি উপায় আছে? অকাল অকাল!—

পোড়া অকাল কি আর ফুরোয় না! . . . একবার গিয়ে পড়লে, সব ঠিক ক'রে আস্তুম।

কি ঠিক ক'রে আস্তে মা?

ব্যঙ্গের হাসি হেসে মা বল্লেন, আমার নেকা ছেলে—নীলিমার সঙ্গে তোর বিয়ে রে! অতো বোকা সত্যি আমি নই।

হঠাৎ কেমন অপ্রস্তুতের মত হয়ে গেলুম। মনে হলো, সে সৌভাগ্য ক'রে কি এসেছিলাম এ পৃথিবীতে?

মা জিজ্ঞাসা ক'রলেন, চুপ ক'রে রইলি যে বড়?

যা হয় নি, হবে না, তা নিয়ে মনকে চঞ্চল করায় ফল কি? তাই ভাবচি।

হবে না? কেন হবে না? আমি সব উল্টে দিয়ে, স্রোত ফিরিয়ে দিচ্ছি,—দেখ্ না।

ভিতরে প্রলুব্ধ মন দু'হাত তুলে নেচে উঠলো; মুখে বল্লুম, তাই কি হয় মা? জ্যেঠামহাশয়ের যে অপমান হবে; কাকা ভীষণ মর্ম্মাহত হবেন।

মা দু'চোখ বিস্ফারিত করে অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

দম্‌কা হাওয়ার মত কাকা আমাকে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকলেন, কিরণ, চল্ চল্—দেরি করিস্ নে, ওঁরা এসেচেন—তোকে আশীর্ব্বাদ করতে।

মা'র দিকে ফিরে বল্লেন, মেজবৌঠান্, আর দেরী করবেন না—ওকে ফর্সা কাপড় পরিয়ে শীগ্‌গির বাইরে পাঠিয়ে দিন্।

আশীর্ব্বাদও হয়ে গেল; বাঁধনের উপর বাঁধন পড়ল। এখন শুভস্য শীঘ্রম্।

বাবা এসে ঘরে ঢুকতেই মা বল্লেন, কিরণের ক'নে দেখার আগেই যে আশীর্ব্বাদ শেষ হয়ে গেল?

মাথা চুলকে তিনি বল্লেন, গোবিন্দ আজকে দিন-স্থির ক'রে এসেছিল, তাঁরা একেবারে প্রস্তুত হ'য়ে এসে পড়লেন; কি ক'রেই বা বন্ধ ক'রে দেওয়া যায়!

তবে বিয়ে স্থির?

তাই ত দেখচি।

বেশ, বলে মা ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। তাঁর রাগ যেন আর কিছুতেই চেপে রাখা যাচ্চে না।

বাবার সাম্‌নে কতকটা অপরাধীর মত নিজেকে মনে হতে লাগলো। যে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল সেটা যে তাঁর অনেকখানি ইচ্ছাকে অতিক্রম করে—তা মাও যে বুঝেন্ নি তা নয়; তাই মা'র রাগটা তাঁর পক্ষে উচিত প্রাপ্য নয়—কতকটা অযথা লাঞ্ছনার মত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি যদি পাল্‌টা রাগ দেখাতেন্ তাহলে জিনিষটা অনেকটা সহজ হয়ে যেত কিন্তু বাবা অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে সবটা স'য়ে চলেছিলেন; তাই একটা করুণ ব্যথা যেন আমার মনকে স্পর্শ ক'রে বিষাদ-মন্থর ক'রে তুলেছিল।

বাবা মৃদু হেসে বল্লেন, এই সংসারে সকল দিক রক্ষা ক'রে চলা একান্ত সুকঠিন। বুঝি, তোমার মা'র দাবি খুব ন্যায্য; কিন্তু তার পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তির সকল দিক মুক্ত নয়; দাদা যা করচেন, গোবিন্দ যা করচে, তাকে অস্বীকার করাও সম্ভবপর নয়।

ধীরে ধীরে বল্লুম, তা আমি বুঝিছি বাবা! মা'র কথায় আপনি দুঃখ করবেন না।

দুঃখ আমার, বাবা বল্লেন, তাঁর কথায় নেই; দুঃখ যে তাঁর ইচ্ছামত কাজ ক'রে উঠতে পারা গেল না।

আমি কোন কথা কইলুম না।

খানিক চুপ ক'রে থেকে বাবা বল্লেন, আমি দেখেছি, এমনি একটা অসামঞ্জস্য নিয়ে কাজ করলে কাজের শেষ ফলটা ভাল হয় না। তাই ভয় করে।

অপরিসীম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে এই কথাগুলি ব'লে বাবা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, দেখি কি দাঁড়ায়।

মা কিন্তু এবার হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরে ঢুকলেন। আমরা দুজনেই তাঁর মুখ দেখে খুশী হয়ে উঠলুম।

মা বল্লেন, ঠাকুর-পো'র সঙ্গে এক-শ টাকার বাজি ফেলে এলুম। তাকে বল্লুম, যতই কেন চেষ্টা কর না তোমরা, তিন ভায়ে মিলে—আমি একাই এক-শ। কিরণের অমতে এ বিয়ে আমি হতেই দেব না। ঠাকুর-পো বল্লে, কিরণের মত সে ক'রে দেবে। আমি বল্লুম, যদি তা পার ত এক-শ টাকা বাজি হারচি। ঠাকুর-পো বল্লে, বেশীদূর যেতে হবে না—

আমার ছবি দেখেই সে নেচে উঠবে। তাতেও যদি না হয়—আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে তার মত ক'রে আন্‌বোই আন্‌বো।

বাবা হাস্‌তে লাগলেন, তাহলে দেখ তোমার জেদ্‌ অনেকটা বজায় করেছ।

মা জবাব দিলেন, আমি কি সহজে ছাড়বার পাত্তর!

বাবা বল্লেন, এ বাড়ীতে সে সুনাম ত তোমার আছেই।

কাকা চীৎকার করে আমাকে ডাকৃতে ডাকৃতে ঘরে এসে ঢুকলেন।

২

কাকার ছবি-আঁকার ঘরে গিয়ে দেখি চায়ের টেবিলে প্রচুর জল-খাবার। কাকি-মা তার হেফাজতের কাজে নিযুক্ত।

কাকা বল্লেন, তোর সঙ্গে আমার 'সিরিয়াস' কথা আছে। আয় আগে খেয়ে নে। বাক্‌-যুদ্ধ করতে হলে খালিপেটে সুবিধে হয় না।

কাকিমা বল্লেন, ও কথা শুন্‌লে আমারো যুদ্ধে যোগ দিতে ইচ্ছা করে।

গোঁফ জোড়া সরিয়ে দিয়ে কাকা বল্লেন, এই সহজ-কথাটা কিন্তু আমাদের দেশের নেতারা কিছুতেই বুঝেন না। সরকারের সামরিক-ব্যয় কমিয়ে দেবার জন্যে এত হাল্লা!—আরে, খ্যাটের জুৎ না থাকলে আসবে কেন লোকে লড়াই করতে।

আমরা দুজনেই হাস্‌তে লাগলুম।

চা খেতে খেতে দেখলুম, কাকার সেই অসমাপ্ত ছবিখানি রয়েছে। পাতার গুচ্ছের মধ্যে থেকে একটা বড় গোলাপের কুঁড়ি ফুটে সবে মাত্র উঠছে। সেই গোলাপটা কিন্তু একটি ছোটমেয়ের মুখ। অসীম লাবণ্য তার মুখের উপর ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চিত্রকর করেছেন।

ছবিটির ইতিহাস আমার জানা ছিল, তাই খুব সহজ করে দেখতে পারছিলুম না। কিন্তু দেখার লোভও সম্বরণ করতে পারি নে। তাই দেখে কাকি-মা মুখ টিপে হাসছিলেন—তাও বুঝতে পারচি।

চা-পান সমাপ্ত ক'রে কাকা বল্লেন, দেখ্‌, কিরণ, তুই পালাস্‌ নে—আমি এখখুনি আস্‌চি—আধ ঘণ্টার মধ্যেই। তোরা ততক্ষণ দুজনে কথা ক।

কাকি-মা'র দিকে ফি'রে বল্লেন, না হয় তুমি একটু সেতার শুনিয়ে দাও না।

কাকি-মা বল্লেন, না—আমরা এখন ছবির সমালোচনা করি।

সর্ব্বনাশ! তবেই হয়েছে—বলতে বলতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কাকি-মা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, সে-দিন আমাদের মহা-তর্ক হয়ে গেছে—বিষয়টা শুন্‌লে তুমি আশ্চর্য্য হবে।

কিসের বিষয় কাকি-মা?

প্রশ্ন উঠলো, তুমি কোন্‌ ফুল ভালবাস, পদ্ম না গোলাপ? আমি বল্লুম, নিশ্চয়ই তুমি পদ্ম বেশী ভালবাস—উনি বল্লেন, হতেই পারে না—গোলাপ তুমি বেশী ভালবাস। আচ্ছা বল ত ঠিক ক'রে সবচেয়ে কোন্‌ ফুল তোমার পছন্দ?

বল্লুম, দু-ই ভালবাসি কাকি-মা, সৌন্দর্য্যে ত কেউ কম নয়।

কাকি-মা বল্লেন, হয়েছে, তোমাকে আর মন-রাখা কথা কইতে হবে না। মন-খুলে কথা কও, বল সব চেয়ে কোন্‌ ফুল তুমি ভালবাস।

বল্লুম, পদ্ম?

আমার সঙ্গে দুষ্টুমি আবার?

তবে কি বল্‌বো? গোলাপ?

ফের!

মন খুলতে হলে যে দু' জনেই বাদ যান্‌।

তাতে ক্ষতি কি? বল না বলচি, লক্ষ্মীটি আমার!

সে কথা শুনলে ভারি আশ্চর্য্য বোধ হবে কিন্তু বলচি।

বেশ ত—বল না, বল না।

অপরাজিতা!

মা গো! ছেলের আমাদের কি পছন্দ!

হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম, মন-খোলার এই ত মুস্কিল কাকি-মা, কারুকে খুশী করতে পারা যায় না।

কাকি-মা যেন একটু অপ্রস্তত হয়ে গেলেন। তারপর

বল্লেন, নামটি কিন্তু বেশ! তোমার কাকা কিন্তু এ-কথা শুনলে খুব জব্দ হবেন।

বল্লুম, কাকা খুব ভাল ক'রেই জানেন, লোকের রুচি ভিন্ন; তাতে কারুর কোন অপরাধ হয় না।

কিরণ, বল না, অপরাজিতা তোমার কেন ভাল লাগে?

তা কি বলা যায় কাকি-মা! ওর রং, ওর ফু'টে থাকার ভঙ্গী ভারি মিষ্টি লাগে। বাগানে যেদিকে অপরাজিতা ফু'টে আছে সেদিক যেন মেঘ-মেদুর আকাশের মত স্নিগ্ধ-শ্যাম!

কাকি-মা বল্লেন, ঠিক্ ঠিক্ ওর রং কৃষ্ণ ঠাকুরের মত…

বল্লুম, অসীমতার, অন্তরের রং নীল, কাকি-মা।

নীলিমা…নীলমণি, ব'লে কাকি-মা মুখ টি'পে হাসতে লাগলেন।

বুঝতে বাকি রইল না যে, কাকি-মা আমার সব চিঠিগুলিই প'ড়ে ব'সে আছেন।

বল্লুম, হয় ত শুনে আশ্চর্য্য হবে কাকি-মা; কিন্তু একথা লুকিয়ে রাখাও যায় না! বাড়ী থেকে দূরে গিয়ে—আমি বাড়ীর লোকদের মতই আরো কয়েকজনকে ভালবেসেছি—নীলিমা তার মধ্যে একজন।

তাকে তুমি বিয়ে করতে চাও, না?

এই সোজা প্রশ্নের কি কঠিন উত্তর তা মনে করলে আজো আমার মন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

ঠিক কথা বল্‌বো কাকি-মা?

বলবে বৈকি, সেই কথা শুন্‌তেই ত তোমাকে ডেকেছি আজ।

বল্লুম, নীলমণিকে পাবার আকাঙ্খা ক'রে তার কাছে যাই নি কোন দিন। যেমন আকাঙ্খা না করেও মানুষে সূর্য্যের আলো পায়, মা'র ভালবাসা পায়—এও ঠিক তেম্নি কাকি-মা। . . . প্রবাসের বহুদিন বড় আনন্দেই কেটেছে তার সঙ্গে; বহু সেবা পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে। যা-কিছু সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে আমাদের মধ্যে—সবই, কাকি-মা, বিনা প্রয়োজনে। দেওয়া-নেওয়ার অপেক্ষা-প্রতীক্ষা ক'রে একদিনও আমরা পরস্পরের প্রতি চাই নি। . . . এ কি! কাকি-মা, তোমার চোখে জল!

না কিরণ, ও আনন্দের অশ্রু, আমার কি আনন্দ যে হয় নীলিমার কথা শুন্‌তে, তা আমি ব'লে শেষ করতে পারি নে। তারপর?

তারপর আর ত কিছুই বলবার নেই।

তুমি কি একটি বারও নীলিমাকে আমাদের ঘরে আন্‌বার জন্যে অনুরোধ পর্য্যন্ত করতে পার না?—কতকটা অভি-মানের সুরে তিনি যেন এই কথাগুলো ব'লে একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

বল্লুম, এই দুরাশা করার সাহস আমার নেই, সত্যি বলচি কাকি-মা। তাছাড়া তাঁদের এ-কথা কেমন ঠেকবে তাও আমি জানি নে।

তবুও নীলিমা কি বলে তা ত তুমি জান?

তার সঙ্গেও আমার এ-কথা কোন দিন হয় নি।

আশ্চর্য্য কিন্তু! . . . সত্যি বলচি কিরণ, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কেন কাকি-মা?

তা জানি নে বাপু।

সে-দিন আমারও বিস্ময়ের অবধি ছিল না; কিন্তু আজ বুঝতে পারি কেন আমাদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারেন না এবং বিশ্বাস করেন না।

কাকি-মা'র জীবনে একমাত্র পুরুষ কাকা, তাই স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ যে আর দুজন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে থাকতে পারে, এ কল্পনা করা অন্তত কাকি-মা'র পক্ষে সুকঠিন ছিল।

কাকি-মা বল্লেন, বেশ তোমাদের মধ্যে যদি বিয়ের কোন কথাই না হয়ে থাকে ত তোমার অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করতে কি আপত্তি?

আপত্তি কি আমি করেছি?

তবে মেজদি আপত্তি করচেন কেন?

তার উত্তর মা-ই ত ব'লে দেবেন।

আচ্ছা আমি মেজদিকে ডেকে আনি।

মা এলেন।

মেজদি, কিরণের ত নীলিমাকে ছাড়া অন্য মেয়ে বিয়ে করতে আপত্তি নেই।

নেই ত তাতে কি ?

তবে তুমি বিয়েতে আপত্তি কেন করচ ?

মা তাঁর বড় ছুটো চোখে কাকি-মা'র দিকে চেয়ে বল্লেন, অবাক করলি তুই কিন্তু—এই সহজ কথাটাও তোকে বুঝিয়ে দিতে হবে ?

কি সহজ মেজদি ?

কিরণ নীলমণিকে ভালবাসে তা বুঝেছিস্ না, না ?

তা বুঝেচি।

তবে কি আমাদের উচিত নয় যে, তাদের মিল করে দেওয়া।

তা ত উচিতই বটে।

তার কোন চেষ্টা হয়েছে কি ?

না, তা ত হয় নি।

এখন বুঝতে পারিস্ কোথায় ত্রুটি হচ্ছে আমাদের ?

কাকি-মা বল্লেন, আচ্ছা যদি ধ'রে নি যে, নীলিমার সঙ্গে কিরণের বিয়ে হবার নয়, তা হলে কি হবে ?

হবে না, অন্ত জায়গায় হবে। এ ত খুব সহজ কথা বোন্।

কাকি-মা বিষণ্ণ হ'য়ে বল্লেন, কিন্তু বড়কর্ত্তাকে কে ফেরাবে ?

মা বল্লেন, সঙ্গে যে ছোটকর্ত্তা সুগ্রীব হয়েচেন কি না।

হাস্তে হাস্তে কাকা পিছন থেকে বল্লেন, কিন্তু সীতা-উদ্ধারে সুগ্রীবের খুবই দরকার হয়েছিল মেজবৌঠান !

এই যে তুমি এসেছ।

এখন তোমরা আজ্ঞা কর—কি করতে হবে।

মা হেসে বল্লেন, একজনের হুকুম তামিল করতেই তুমি হয়রান ঠাকুর-পো—আবার 'তোমরা' !

গণ্ডস্য পরি পিণ্ডকম্—যাকে বলে, বোঝার উপর শাকের আঁটি !

এত বড় অপমান ?—ব'লে হাস্তে হাস্তে মা ঘর থেকে বার হ'য়ে গেলেন।

কাকি-মা বল্লেন, এই বুঝি তোমার আধ-ঘণ্টা ?

কাকা লঘু চাপল্যের সঙ্গে বল্লেন, আমরা অকেজো শিল্পী, আমাদের নেই সময়ের ঠিক্-ঠিকানা, কবি বলেছেন—

কাকি-মা বল্লেন, মাথায় থাকুন তোমার কবি, আমি কোন কৈফিয়ৎ চাই নি গো।

কবি, কবি ? জান না তুমি ? কবিরাও নিরঙ্কুশ ! ব'লে কাকা হাস্তে লাগলেন। তারপর ? তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রফা হয়েছে।

কাকি-মা বল্লেন, আপাতত বিয়ে মুলতুবি রাখতে হচ্ছে তোমাদের গো মশাই।

মুলতুবি ! 'ইম্‌পসিবল' !

কিসের 'ইম্‌পসিবল' ? এবার আমি বলি, কে যেন বলেছেন, ঐ কথাটাকে অভিধান থেকে তুলে দিতে ?

কে তাঁর কথা মান্‌চে—তাঁকে পচতে দাও গিয়ে 'সেণ্ট হেলেনা'-তে।

কাকি-মা এবার অনুনয়ের সুরে বল্লেন, না, না, তোমাকে আমাদের অনুরোধ রাখতেই হবে।

তবে আমাকে 'কন্‌ভিন্স' কর।

তা আমি করবো।

কাকা বল্লেন, বেশ, তাহলে আমি এই প্রস্তুত।

কাকি-মা বল্লেন, কিরণের বিয়ের আর এক জায়গায় প্রায় সব ঠিক ; তাদের জবাব না দিলে কি এখানে এগোনো চলে ?

ঠিক্ ! কে করলে ঠিক ? শুনি ?

যে করুক, হয়ে আছে, এই কথা জেনে রাখ।

অমন বাজে কথা আমি ধরে নিই নে—জান্‌তে চাই কে ঠিক করেছে ?

মেজদিদি।

বাপরে, মেজবৌঠান ? তবে ত কঠিন ঠাঁই—এতদিন তিনি বলেন নি !

বলবেন কি ?—তুমি কি কারুর অপেক্ষা রেখেছ ? মেয়ে দেখেই আশীর্ব্বাদ ক'রে এলে !

ইস্ তাই ত ! ভারি ভুল হয়ে গেছে—এখন কি করা যায়—আরে দুই পক্ষেই ত কাজ শেষ হয়ে গেছে ! এখন উপায় ?

উপায় একমাত্র তুমি। যে গড়তে জানে—সে ভাঙ্গতেও জানে।

মাথা নেড়ে কাকা বল্লেন, উঁহুঁ জান না তোমরা—বিষ-বৃক্ষকেও রোপন ক'রে ছেদন করতে বড় কষ্ট হয়—এ ত কবির বাক্য! তাই ত—কি করা যায় এখন!

কাকি-মা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, এ গোলাপও নয়, পদ্মও নয় . . .

তবে কি?

অপরাজিতা!

টেবিলের উপর লজ্জায় চোখ বুঁজে মাথা নীচু করতেই আমার চোখের উপর সমস্ত আকাশের, অসীম সমুদ্রের নীলিমা ঘনীভূত হ'য়ে যেন কোন্ বাস্তব মূর্ত্তি ধারণ করার আগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো!

—ক্রমশ

লিপি

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

ঐ আকাশের ভাঙা চাঁদের কোণে
আমার মনের একটি কথা হারিয়ে গেল আজ্‌কে অকারণে।
যেই কথাটি সাঁঝ-সকালে আমার মনের গোপনতম দেশে
স্বপ্নসম জড়িয়েছিল নানান্‌তর বেশে,
আজ্‌কে যেন ঐ দ্বিতীয়ার চাঁদে
সেই কথাটি রুদ্ধ হ'য়ে কাঁদে;
আজ্‌কে তারে হায়
চিত্ত আমার ব্যাকুল হ'য়ে জান্‌তে যে গো চায়!

আজ্‌কে যেন পড়্‌চে মনে ছায়ার মত কাহার হাসিমুখ,
কোন্ জনমে প্রেমের দানে যে-জন আমার ভরিয়েছিল বুক,
সে-যেন আজ এই জগতের একটি তনুর মাঝে
কুসুম-দলে বদ্ধ মধুর গন্ধ-সম সঙ্গোপনে রাজে,
মৃদুল হাওয়ার সনে
আজ যেন তার সৌরভেরি আভাষটুকু পাই গো আমার মনে

তার পরিচয় আমার মনে ছিলই যে গো লেখা,—
নানান্ কাজের কোলাহলে সেই লিপিটি হয় নি আজো দেখা;
আজ্‌কে যখন জান্‌তে তারে চাই,
দেখি' সে আর নাই;—
আজ দ্বিতীয়ার উদাস হাওয়ার সনে
সেই লিপিটি হারিয়ে গেছে ভাঙা চাঁদের কোণে।

রমাঁ রলাঁ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রভাত

[শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী কর্ত্তৃক অনূদিত]

দিন যায়, বর্ষামুখর রাত্রি যায়—মিশেল-এর কবরের উপরকার মাটি এখনও যেন কাঁচা। মেলশিয়র প্রথমটা খুব কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহ শেষ হইতে না হইতেই ক্রিস্তফ্ শুনিল, তার বাবা বেশ হাসিতেছে! পরলোকগত বৃদ্ধের নাম শুনিবামাত্র মেলশিয়র-এর মুখ গম্ভীর হয় কিন্তু খানিক পরেই সে হাত-পা নাড়িয়া মহা-উৎসাহে কথা বলিতে শুরু করে। দুঃখে সে সত্যই কাতর হইয়াছিল কিন্তু বেশীক্ষণ বিষণ্ণ হইয়া থাকা তার আসে না।

লুইসা যেমন সব জিনিষ সহিয়া যায় তেমনি এই নূতন দুর্ভাগ্যটা সহিয়া চলিতে প্রস্তুত হইল। সে তার প্রাত্যহিক উপাসনায় বৃদ্ধকে স্মরণ করে, নিয়মিত তাঁর কবরটি দেখিতে যায় এবং তার উপরকার ঘাসগুলির যত্ন করে—যেন সেগুলি তাঁর ঘরের আসবাব।

গড্‌ফ্রিড্ও বৃদ্ধের ছোট কবরটির যত্ন করে; সে-পাড়ায় আসিলেই কিছু স্মৃতিচিহ্ন লইয়া আসে, কখনও একটি ক্রস্ কখন কিছু ফুল যাহা বৃদ্ধ ভাল বাসিত, এটি কখনও বাদ যাইত না; কয়েক ঘণ্টার জন্য শহরে আসিলেও গড্‌ফ্রিড্ গোপনে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া যাইত।

লুইসা মধ্যে মধ্যে ক্রিস্তফ্‌কে গোরস্থানে লইয়া যাইত। সেই পুরু মাটির চাবড়া যার নিষ্ঠুরতা ফুলে-গাছে কোন রকমে যেন লুকাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে—সেটা দেখিলেই তার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। সাইপ্রেস গাছের সোঁ সোঁ আওয়াজের সঙ্গে একটা কড়া গন্ধ মিশিয়া কেবলই সূর্য্যের দিকে উঠিতেছে—ক্রিসতফের মন কেমন যেন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যাইত কিন্তু সেটা প্রকাশ করিতে সাহস পাইত না, কারণ মনে মনে সেই ভাবটা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও কাপুরুষতাপূর্ণ বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল। তার অস্বস্তির অন্ত ছিল না, বৃদ্ধের মৃত্যু-স্মৃতি তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত; মৃত্যু কি তাহা সে অনেক দিনই ত বুঝিয়াছে, তার ভয়ে অস্থির হইয়াছে কিন্তু ইহা সে পূর্ব্বে স্বচক্ষে দেখে নাই; যাহারা জীবনে প্রথম মৃত্যু দেখিয়াছে তাহারা অনুভব করিয়াছে যে, সে পর্য্যন্ত তাহার জীবন বা মরণ কিছুই ভাল করিয়া বুঝে নাই। একটি আঘাতে সব যেন চূর্ণ হইয়া যায়, জ্ঞান বুদ্ধি কোনই কাজে আসে না, মানুষ ভাবিয়াছে সে বাঁচিয়া আছে—তাহার খানিক অভিজ্ঞতা আছে; হঠাৎ সে দেখে যে সে কিছুই জানে না; সে শুধু যেন বাস্তবের নিষ্ঠুর মুখখানা চাপা দিবার জন্য একটা মনগড়া মায়ার আবরণ সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। যে মানুষ বুকের রক্ত পাত করিতেছে—ব্যথায় ছটফট করিতেছে, তার সঙ্গে চিরন্তন দুঃখবোধের যেন কোনই যোগ নাই! যে মানুষ মরণোন্মুখ, যার দেহ ও আত্মা শেষ সংগ্রামে নিযুক্ত তার সঙ্গে শাশ্বত মৃত্যুবোধের যোগ কোথায়? মানুষের ভাষা, মানুষের জ্ঞান যেন এই

নিষ্ঠুর বাস্তবের বীভৎস লীলার সম্মুখে কলের পুতুলের মত বোধ হয়। রক্ত ও মাটিতে গড়া এই নগণ্য হতভাগ্য জীব যেন প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছে জীবনকে একটু স্থায়ী করিবার জন্য, আর সেই জীবন পলে পলে পচিয়া গলিয়া যাইতেছে!

ক্রিস্‌তফের দিবারাত্রি এক চিন্তা—মৃত্যু। মৃত্যুযাতনার স্মৃতি যেন সর্ব্বদা তাকে ঘিরিয়া থাকে; সে রাতে যেন দাদা মশাইকে দেখে, তার শ্বাসের আওয়াজটা শোনে। সারা প্রকৃতি যেন বদলাইয়া গিয়াছে—তার মুখে যেন তুষারের আবরণ। সে যে দিকেই চায় যেন দেখে ঐ সর্ব্বজয়ী মৃত্যু নিষ্ঠুর অন্ধ জানোয়ারটার মত তার পানে তাকাইয়া আছে, তার মরণভরা নিঃশ্বাস যেন গায়ে পড়িতেছে। তার ভীষণ কবলের মধ্যে যেন ক্রিস্‌তফ্‌ পড়িয়া ভাবিতেছে—কিছুই করিবার নাই। কিন্তু ক্রিস্‌তফ্‌ ইহাতে দমিয়া না গিয়া ক্রোধে ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিত। হাল ছাড়িবার পাত্র সে নয়, অসম্ভব হইলেও তার বিরুদ্ধে সে মাথা ঠুকিতে যাইত—না হয় মাথা ভাঙ্গুক—না হয় মানিতে হইবে মৃত্যুরই বেশী জোর—তবু বেদনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে সে ছাড়িত না। এই সময় হইতে তার জীবন নিয়তির ক্রূরতার বিরুদ্ধে যেন এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম—এই নিষ্ঠুর নিয়তিকে সে কিছুতেই স্বীকার করিবে না।

* * * *

এই একটানা চিন্তা হইতে ক্রিস্‌তফ্‌কে উদ্ধার করিত তার জীবনের হাজার কঠিন সমস্যা। পরিবারটিকে এতদিন ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল একমাত্র বৃদ্ধ মিশেল—এখন তার অবর্ত্তমানে বুঝি সব ভাঙ্গিয়া পড়ে! ক্রাফ্‌ট-দের সব চেয়ে বড় অবলম্বন সরিয়া গিয়াছে—দুঃখ আসিয়া ঘরে আসন পাতিয়া বসিল।

মেলশিয়র সেই দুঃখের আঘাত বাড়াইয়া চলিল। একমাত্র পিতার শাসনই তাকে কর্ত্তব্য পথে চালাইত, এখন সেটা না থাকায় মেলশিয়র যত রকম কদাচারের স্রোতে গা ঢালিয়া দিল—অথচ এখনই তার বেশী করিয়া কাজে লাগিবার কথা। প্রায় প্রতি রাতে সে মাতাল হইয়া বাড়ী ফেরে এবং যা উপায় করে তার কিছুই বাড়ীতে জমা দেয় না। একে একে যে-সব বাড়ীতে শিক্ষা দিয়া কিছু পাইত তারাও দুয়ার বন্ধ করিল, কারণ একদিন ভীষণ মাতাল হইয়া শিক্ষা দিতে গিয়া এক বাড়ীতে কেলেঙ্কারী করিয়া বসিল। শুধু যন্ত্র-সঙ্গতে কোন রকমে লোকে বৃদ্ধ মিশেলের খাতিরে তাহাকে সহ্য করিয়া চলিত কিন্তু সেখানেও কোন্ দিন একটা কাণ্ড করিয়া বিতাড়িত হইবে এই ভয়ে বেচারী লুইসা অস্থির। ইতিমধ্যে তাকে তাড়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ অনেকবার সে সঙ্গতের প্রায় শেষে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। এমন কি, দুই তিনবার সে আসিতে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। তা ছাড়া, নেশার ঝোঁকে সে কথায় কাজে কত রকমই বেয়াড়ামো করিত তার ইয়ত্তা নাই। একবার Valkyrie অভিনয় চলিতেছে, তার মাঝে মেলশিয়র হঠাৎ তার বেহালার আলাপটা বাজাইয়া সর্ব্বনাশ করে আর কি! কত ফন্দি করিয়া বুঝাইয়া তবে তাকে ঠেকান যায়! কখনও আবার সে রঙ্গমঞ্চের উপরকার কিছু একটা দেখিয়া বা আপনার বিকৃত মস্তিষ্কের বশে কাল্পনিক চিত্র দেখিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠে। তার বন্ধুর দল ইহাতে মজা পাইত সুতরাং তার অনেক বেয়াড়ামো সহ্য করিয়া চলিত কিন্তু সেই কৃপামিশ্রিত উপেক্ষার চেয়ে কঠোর শাস্তি ছিল ভাল—ক্রিস্‌তফ্‌ যেন লজ্জায় মরিয়া যাইত।

ক্রিস্‌তফ্‌ এখন যন্ত্র-সঙ্গতে প্রথম বেহালাদার; সে এমন জায়গায় বসিত যে, মেলশিয়র কোন একটা গোলমাল করিতে যাইলেই অনুনয় বিনয় করিয়া তাকে থামাইতে পারে। কিন্তু এটি বড় সহজ ব্যাপার ছিল না; তার প্রতি কোন মনোযোগ না-দেওয়াই ছিল সব চেয়ে ভাল উপায়, কারণ কেহ তাহার দিকে তাকাইতেছে দেখিলেই নির্ব্বোধ মেলশিয়র হয় মুখভঙ্গী করিত, নয় বক্তৃতা দিতে উদ্যত হইত। তখন ক্রিস্‌তফ্‌ ভয়ে মুখ ফিরাইয়া লইত, পাছে তার বাবা একটা বিষম কিছু কাণ্ড করিয়া বসে। মেলশিয়র বকিতেছে, তার বন্ধুর দল হাসিতেছে, সব কানে আসিত কিন্তু ক্রিস্‌তফ্‌ যেন কাজে তন্ময় হইয়া আছে, এমনি ভাব দেখাইত, তার চোখ ফাটিয়া জল আসিত, অন্য যন্ত্রীরা সেটা লক্ষ্য করিত এবং সমবেদনায় ভরিয়া উঠিত; তারা হঠাৎ হাসি থামাইত এবং প্রায় ক্রিস্‌তফের সামনে তার পিতাকে লইয়া আলোচনা

করিত না। তাদের এই কৃপার ইঙ্গিত ক্রিস্তফ্ বেশ বুঝিত এবং জানিত যে, একটু দূরে গেলেই সকলের বিদ্রূপের বান ডাকিবে, কারণ মেলশিয়র সারা শহরে যেন একটা হাসির জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাবাকে সে থামাইতে পারিত না, শুধু অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিত। বাজনা শেষ হইলে সে বাবাকে বাড়ী আনিত, তার হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত, বাবা নেশার ঝোঁকে হোঁচট্ খাইলে ক্রিস্তফ্ সামলাইয়া লইত—যেন সে নেশাটা লক্ষ্য করে নাই; কিন্তু সে কয়জনকে ভুলাইবে? সব রকম চেষ্টা করিয়াও ক্রিস্তফ্ বাবাকে একেবারে বাড়ীতে হাজির করিতে পারিত না। একটা রাস্তার কোণে আসিয়া মেলশিয়র বলিয়া বসিত, কোন এক বন্ধুর সঙ্গে জরুরী কাজ আছে, সে কাজটা করিতে যাইতে বাধা দেওয়া অসম্ভব; ক্রিস্তফ্ বেশী তর্ক বা জেদ করিত না, পাছে পথে একটা কাণ্ড হইয়া যায় অথবা পিতার গালি গালাজে প্রতিবেশীরা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়ায়।

সংসারের টাকা-কড়ি সরিতে আরম্ভ করিল; মেলশিয়র নিজে যাহা উপার্জ্জন করে শুধু সেটা উড়াইয়া সন্তুষ্ট নয়; তার স্ত্রী, তার বালক পুত্র বহু কষ্টে যে-টুকু উপায় করে সেটুকুও সে মদে উড়াইতে লাগিল। লুইসা শুধু চোখের জল ফেলে, তার বাধা দিবার সাহস নাই, কারণ স্বামী নিষ্ঠুর ভাবে মনে করাইয়া দেয় যে, বাড়ীর একটা কুটোও তার নয়; একটা কাণাকড়িও লুইসা যৌতুক হিসাবে আনে নাই! ক্রিস্তফ্ বাধা দিতে চেষ্টা করে; মেলশিয়র তার কান মলিয়া টাকাগুলো কাড়িয়া লয়, যেন সে একটা স্কুলের ছেলে, তাকে দুষ্টামীর জন্য শাস্তি দেয়। ক্রিস্তফ্ এখন বার তের বছরের। সে বেশ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং শাস্তিটা সহ্য করিতে চাহিত না অথচ একেবারে বিদ্রোহীর মত ব্যবহার করিবার সাহসও ছিল না। এ অবস্থায় নূতন নূতন অপমান সহ্য করা অপেক্ষা সে নিজেকে লুণ্ঠন করিতে দেওয়া সমীচিন মনে করিত। লুইসা ও ক্রিস্তফের একমাত্র উপায় রহিল টাকাকড়ি লুকাইয়া রাখা কিন্তু সেই গুপ্ত ধন আবিষ্কার করিতে মেলশিয়র আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখাইত।

শীঘ্রই দেখা গেল, ইহাতে তাহার কুলায় না; মেলশিয়র তাহার পিতার জিনিষপত্র বিক্রি করিতে শুরু করিল। সেই সব অমূল্য স্মৃতি-চিহ্নগুলি—বই, বিছানা, আসবাব, সঙ্গীতজ্ঞদের ছবি—কত জিনিষ একে একে চলিয়া যায়। ক্রিস্তফ্ বেদনায় অধীর হইয়া শুধু দেখে। এক দিন মেলশিয়র ঘরে ঢুকিতে বৃদ্ধ মিশেলের পিয়ানোতে ধাক্কা খাইয়া বলিয়া উঠিল, বাড়ীতে নড়বার জো নেই, সব জঞ্জাল দূর ক'রে দেব।...

ক্রিস্তফ্ আর সহ্য করিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিল; ঘরগুলা জিনিষে ঠাসা তাহা সত্য, কারণ মিশেলের সব জিনিষ এ বাড়ীতে পুরিয়া তার বাড়ীখানি বিক্রয় করা হইয়াছে। সেই বাড়ীতে ক্রিস্তফের কত মধুর শৈশবস্মৃতি জড়াইয়া ছিল। যে পিয়ানো লইয়া আজ গোলমাল সুরু হইল, সেটাও সত্যই পুরান, বেসুরো হইয়াছে এবং বহুকাল ক্রিস্তফ্ সেটা বাজায় নাই। সে ডিউকের অনুগ্রহে একটি নূতন পিয়ানো পাইয়াছে। কিন্তু যতই পুরাতন ও অকেজো হোক, ঐ পিয়ানোটি যে ক্রিস্তফের প্রাণের বন্ধু, ঐটিই ত সঙ্গীতের অসীম জগতে তার নব জাগরণের উপাদান; ধ্বনি ও সুর জগতের বিচিত্র নিয়ম সে ঐ যন্ত্রের জীর্ণ হলদে পর্দ্দার উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়াই ত শিখিয়াছে। তা ছাড়া যন্ত্রটি যে তার দাদামশায়ের হাতের ছাপ বহন করিতেছে; কত দিন খাটিয়া বৃদ্ধ ঐটিকে নাতির জন্য মেরামত করিয়া দিয়াছিল, ভাবিতে গর্ব্বে তার বুক ফুলিয়া উঠিত—যন্ত্রটি যে তাঁর পূতস্মৃতিচিহ্ন; সুতরাং ক্রিস্তফ্ জোরের সঙ্গে বলিল, মেলশিয়রের বেচিবার কোন অধিকার নাই। তার বাবা ধমক দিয়া চুপ করিতে বলিল কিন্তু ক্রিস্তফের গলা আরও চড়িয়া গেল,—ও-যন্ত্রটা আমার, কাউকে আমি ছুঁতে দেব না।

মেলশিয়র একবার কট্মট্ করিয়া তাকাইয়া হঠাৎ যেন একটা শয়তানী হাসি হাসিয়া থামিয়া গেল।

পরদিন ক্রিস্তফ্ সব ভুলিয়া গিয়াছে, শ্রান্ত হইয়া কাজের পর বাড়ী ফিরিয়াছে—মেজাজটা মন্দ ছিল না; কিন্তু ভাইদের দৃষ্টির মধ্যে কি যেন একটা লুকান আছে—ক্রিস্তফ্ লক্ষ্য করিল, তারা পড়িতে যেন মহাব্যস্ত অথচ সমস্তক্ষণ ক্রিস্তফ্কে দেখিতেছে, চোখোচোখী হইলেই

আবার বই-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। ক্রিস্তফ্ বুঝিল, তার বিরুদ্ধে একটা কিছু ষড়যন্ত্র পাকাইতেছে, কিন্তু সেটা তার প্রায় অভ্যস্ত ছিল, সুতরাং ওদিকে বেশী মন না দিয়া স্থির করিল, ধরা পড়িলে ভাইদের কষে মার দিবে। এটা প্রায়ই ঘটিত। বেশী খোঁজ-খবর না করিয়া সে বাবার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল, মেলশিয়র আগুনের ধারে বসিয়াছিল। ক্রিস্তফে্র মুখে বাড়ীর খবর নেওয়া বা কুশলপ্রশ্ন কেমন বেখাপ্পা ঠেকে, তবু যেন একটু ঔৎসুক্য দেখাইয়া সে কথা পাড়িল ; কিন্তু কথার মধ্যে ক্রিস্তফ্ দেখে তার বাবা ছোট ছেলেগুলোর সঙ্গে যেন চাপা ইঙ্গিত ইসারায় ব্যস্ত, ক্রিস্তফ্ হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে কেমন একটা টান বোধ করিল একছুটে তার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ফাঁকা—তার প্রিয় পিয়ানোটি অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিয়া উঠিল, পাশের ঘরে শুনিল তার ভাইগুলা চাপা হাসিতে লুটোপুটি খাইতেছে। যেখানে পিয়ানোটি ছিল সে জায়গাটা খালি! ক্রিস্তফ্ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ; সে শুনিল পাশের ঘরে চাপা গলায় তার ভায়েরা হাসাহাসি করিতেছে—তার যেন খুন চড়িয়া গেল, ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, আমার পিয়ানো!

মেলশিয়র যেন অবাক! একেবারে ভালমানুষের মত শান্ত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল ; তাহাতে ছেলেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, মেলশিয়রও ক্রিস্তফের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া হাসি চাপিতে পারিতেছিল না, সে মুখ ফিরাইয়া কোন রকমে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ক্রিস্তফ একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মত্তের মত তার বাবার ঘাড়ের উপর পড়িল। মেলশিয়র চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতেছিল ; সুতরাং আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, ছেলেটি তাহার টুটি টিপিয়া বলিল, চোর!

চক্ষের নিমিষে এটা ঘটিয়া গেল। মেলশিয়র এক ঝট্কা দিয়া ক্রিস্তফ্কে মেজের উপর ফেলিয়া দিল। যদিও সে যমের মত বাবাকে টিপিয়া ধরিয়াছিল, ক্রিসতফের মাথাটা টালির উপর ঠোকর লাগিল, সে উঠিয়া বসিয়া রাগে নীল হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে আবার বলিল, চোর! তুমি মা'র আমার সর্ব্বস্ব লুঠ করেছ . . . ডাকাত! এখন আবার দাদামহাশয়ের যাকিছু আছে বিক্রি করতে বসেছ . . . চোর!

মেলশিয়র দাঁড়াইয়া ঘুসি পাকাইয়া মারে আর কি! কিন্তু ক্রিস্তফ্ কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল, তার চোখ দিয়া যেন ঘৃণা উপছিয়া পড়িতেছে, রাগে তার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। মেলশিয়র হঠাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িয়া হাতের মধ্যে মুখ চাপা দিল, ছেলেরা চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পালাইল ; ভীষণ গোলমালের পর সব চুপ! মেলশিয়র কেমন যেন গোঁ গোঁ করিতেছে, ক্রিস্তফ্ দেয়ালে ঠেস দিয়া ঘুসি পাকাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে আর বাবার দিকে চাহিয়া আছে। মেলশিয়রের আত্মনির্ব্বেদ শুরু হইল :

আমি একটা চোর! আমি আমার পরিবারের সকলের জিনিষ চুরি করি, বেচি, আমার নিজের ছেলেরা আমায় ঘৃণা করে, আমার মরণই ভাল . . .।

একটু থামিতে ক্রিস্তফ্ একটুও না নড়িয়া কর্কশ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বল, আমার পিয়ানো কোথায়?

মেলশিয়র তার দিকে চাহিতে সাহস পাইতেছিল না, শুধু বলিল, উরস্মেয়ারদের বাড়ী।

ক্রিস্তফ্ এক-পা অগ্রসর হইয়া বলিল, টাকাটা কোথায়?

মেলশিয়র যেন মরমে মরিয়া গেছে ; টাকাটা পকেট হইতে বাহির করিয়া ছেলের হাতে দিল। ক্রিস্তফ্ বাহিরে যাইতেছে, এমন সময় মেলশিয়র ডাকিল ক্রিস্তফ্! ক্রিস্তফ্ থামিয়া গেল। বেদনাকম্পিত কণ্ঠে মেলশিয়র বলিল, বাবা ক্রিস্তফ্! আমায় ঘৃণা করিস্ নি . . .

ক্রিস্তফ্ দুই হাতে বাবার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল—

"না বাবা, আমি তোমায় ঘৃণা করি না আমি ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছি—বাবাগো . . .

দুজনেই কাঁদিতে লাগিল ; মেলশিয়র বলিল, আমি আসলে খারাপ নই রে, আমার দোষ বেশী নেই বাবা ক্রিস্তফ্, তুই বল্ আমি খারাপ নই ত?

মেলশিয়র প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, সে আর মদ

খাইবে না ; ক্রিস্তফ্ সন্দেহের ভরে মাথা নাড়িল ; মেলশিয়র স্বীকার করিল যে, টাকা হাতে থাকিলে সে লোভ সামলাইতে পারে না। ক্রিস্তফ্ একটু ভাবিয়া বলিল, বাবা বুঝছ ত ? আমাদের . . .

কি ?

আমাদের মাথা হেঁট . . .

কার জন্মে ?

তোমার জন্মে।

মেলশিয়রের মুখ ব্যথায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল কিন্তু সে শুধু বলিল, ওতে কিছু এসে যাবে না . . .

ক্রিস্তফ্ বুঝাইতে লাগিল :

"বাবা আমাদের যতটুকু আয় হয়—আমার তোমার—সব একজনের হাতে জমা দিতে হবে ; দরকারমত দিলে একবার বা সপ্তাহে একবার তুমি তার কাছ থেকে টাকা পাবে।

মেলশিয়রকে তখন বিনয় পাইয়া বসিয়াছে—মাথাটাও খুব ঠিক ছিল না, সুতরাং রাজী হইল :

আমি এখুনি গ্রাণ্ড ডিউককে চিঠি লিখছি, আমার পেন্‌সনটা এখন থেকে নিয়মিত যেন ক্রিস্তফের হাতে দেওয়া হয়···

ক্রিস্তফ্ ইহাতে পিতার অপমানের সম্ভাবনা আছে বুঝিয়া আপত্তি করিল, কিন্তু পিতা আত্মবলিদান দিতে একেবারে উন্মুখ! সে জেদ করিয়া লিখিতে বসিল এবং নিজের মহত্বে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

ক্রিস্তফ্ সে চিঠি লইতে রাজী হইল না, এমন সময় লুইসা আসিয়া উপস্থিত। সব ব্যাপারটা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াব, তবু আমার স্বামীর এমন অপমান হতে দেব না ; আমি তাকে বিশ্বাস করি আমি নিশ্চয় জানি স্ত্রী-পুত্রের মুখ চেয়ে মেলশিয়র আবার ভাল হবে···"

এমনি অতি করুণভাবে শেষে সব মিটমাট হইয়া গেল ; মেলশিয়রের চিঠিখানা টেবিল হইতে নীচে পড়িয়া সেখানেই চাপা রহিল।

কিছুদিন পরে ঘর পরিষ্কার করিতে যাইয়া লুইসা সেই চিঠিখানা পাইল, তখন মেলসিয়রের বেয়াড়ামো আবার বাড়িয়াছে—তার চিঠির কথা মনেও নাই—লুইসার মন দুঃখে অবসন্ন ; সে চিঠিখানা না ছিঁড়িয়া রাখিয়া দিল ; বহু যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইলেও সেই চিঠি কাজে লাগাইবার ইচ্ছাটা সে চাপিয়াছে ; কিন্তু একদিন লুইসা দেখিল মেলশিয়র আবার মাতাল হইয়া ক্রিস্তফ্‌কে মারিতেছে ও তার টাকা-কড়ি কাড়িয়া লইতেছে—সে আর সহ্য করিতে পারিল না, ছেলেকে কাঁদিতে দেখিয়া তার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, যা বাবা এবার চিঠিখানা কাজে লাগা।

ক্রিস্তফ্ ইতস্তত করিতেছিল, কিন্তু সে বুঝিল যে সামান্য যেটুকু তাদের আছে সেটা রক্ষা করিতে হইলে অন্য উপায় নাই। চিঠি লইয়া সে প্রাসাদে গেল ; যে পথ সে কুড়ি মিনিটে যায় সেটা হাঁটিতে তার এক ঘণ্টা লাগিল। যে কাজ করিতে সে যাইতেছে সেটা ভাবিতেই যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল, দুঃখ ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে যে আত্মমর্য্যাদা তার বাড়িয়া উঠিয়াছে, তার উপর যেন কে ছুরি চালাইতেছিল—তার পিতার কলঙ্কের কথা সাধারণের কাছে প্রচার করিতে চলিয়াছে সে! সেকথা যে সকলেই জানে সেটা তার অবিদিত ছিল না কিন্তু কেমন একটা অদ্ভুত অথচ স্বাভাবিক অযৌক্তিকতা তাকে পাইয়া বসিয়াছিল—সে স্বীকার করিতে চায় না, সে প্রতিবাদ করিতে পারিলে খুশী হয় সে যেন দেখিয়াও দেখে না—পিতার দোষটা মানিয়া লওয়ার পরিবর্ত্তে যদি কেউ তাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটে সেও ভাল!

কিন্তু এখন ? সে ত নিজের ইচ্ছায় বাবার মাথা হেঁট করিতে চলিয়াছে।

বার বার সে ফিরিতে চেষ্টা করিল ; প্রাসাদের কাছে আসিয়া হঠাৎ অন্য পথ বাহিয়া দুই তিনবার শহরটা ঘুরিয়া আসিল। সে ভাবিতেছে—শুধু সে ত একা বিপন্ন হয় না, মা ভাই সকলের কথা ভাবিতে হইবে, বাবা যখন সকলকে এমন অকূল সাগরে ভাসাইয়াছে তখন বাড়ীর বড় ছেলের মতই কাজ করিবে—বাবার স্থান অধিকার করিয়া সকলকে সাহায্য করিবে ; এখানে দ্বিধা বা গর্ব্বের কোন অবকাশ নাই, সব লজ্জা অপমান হজম করিতে হইবে। ক্রিস্তফ্ প্রাসাদে ঢুকিল, সিঁড়ি হইতেই পালাইবার একটা আবেগ

আসিল ; এখানে সেখানে থম্‌কাইয়া, দরজা ধরিয়া কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া আছে এমন সময় লোকজন আসিয়া পড়িতে তাহাকে বাধ্য হইয়া ভিতরে ঢুকিতে হইল।

সকলেই তাহাকে চিনিত, সে নাট্য-বিভাগের কর্ত্তা ব্যারণের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিল ; একজন রোগা টাকপড়া ছোকরা-কেরাণী গায়ে পড়িয়া তার সঙ্গে আলাপ জুড়িল—কাল রাতে গীতি-নাট্যটা কেমন হল—ইত্যাদি।

ক্রিস্‌তফ্‌ তাহাকে মনে করাইয়া দিল যে, সে ব্যারণের সঙ্গে দেখা করিতে চায়, কেরাণীটি উত্তরে বলিল, মহাত্মা ব্যারণ উপস্থিত ব্যস্ত আছেন, তবে যদি ক্রিস্‌তফের কোন আর্জ্জি থাকে অন্য কাগজ পত্রের সঙ্গে সে পাঠাইয়া দিতে পারে। ক্রিস্‌তফ্‌ তার চিঠিখানা দেখাইল, কেরাণীটি পড়িয়া বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাই নাকি ? খাসা মতলব করেছ ত হে ! বহুপূর্ব্বেই একথা ভাবা উচিৎ ছিল, এ যাত্রায় ভাল কাজ ত আর লোকটা কিছু করলে না। কি নির্ব্বোধ—আচ্ছা এমন দুর্গতি লোকটার হল কি ক'রে হে ? . . .

খুব মুরুব্বিয়ানা করিয়া কেরাণীটি বলিয়া যাইতেছিল—হঠাৎ থামিয়া গেল। ক্রিস্‌তফ্‌ তার হাত হইতে কাগজটা ছিনাইয়া লইয়া রাগে জলিয়া বলিল, খবরদার ! আমাদের অপমান করবে না !

কেরাণীটা দমিয়া গেল।

আরে বাবা, তোমার অপমান করছে কে ? সকলে যা বলে—তুমি নিজেও যা ভাব সেই কথাটাই ত আমি বলেছি হে—এত চট্‌ছ কেন ?

না আমি এরকম ভাবি না !

বল কি হে—তুমি মান না মেলশিয়র মাতাল ?

রাগে পা ঠুকিতে ঠুকিতে ক্রিস্‌তফ্‌ শুধু বলিল, না।

গা ঝাড়া দিয়া কেরাণীটি বলিল, তবে এ চিঠিখানা লিখেছে কেন বাবা ?

কারণ কি বলিতেছে হুঁস না রাখিয়া ক্রিস্‌তফ্‌ বলিল, কারণ আমি যখন মাইনে নিতে আসি সেই সঙ্গে বাবার মাইনেটাও নিয়ে যেতে সুবিধা লাগে, দুবার ক'রে আসবার দরকার কি—বাবার অনেক কাজ…"

নিজের অদ্ভুত জবাবদিহি শুনিয়া ক্রিস্‌তফ্‌ নিজেই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কেরাণীটি কৃপা ও বিদ্রূপমিশ্রিত কটাক্ষে তার দিকে চাহিল ; ক্রিসতফ্‌ কাগজখানা হাতের মধ্যে পাকাইতে পাকাইতে ফিরিয়া চলিল ; এমন সময় কেরাণীটি কেমন যেন সদয় হইয়া উঠিয়া তার হাত ধরিল—

একটু দাঁড়াও—তোমার একটা ব্যবস্থা করে আসছি। এইটুকু বলিয়া কেরাণী নাট্য-বিভাগের অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকিল ! ক্রিস্‌তফ্‌ দাঁড়াইয়া আছে—যত কেরাণীর পাল তাদের চোখ দিয়া যেন তাকে বিদ্ধ করিতেছে ; তার রক্ত গরম হইয়া উঠিল, সে কি করিতেছে কি করিবে, কি তার করা উচিত কিছুই ঠিক করিতে পারিল না ; জবাব আসিবার পূর্ব্বেই সে চলিয়া যাইতে চায় এবং প্রায় বাহির হইয়া পড়িতেছে এমন সময় দরজা খুলিয়া সেই অতিভদ্র কেরাণীটি জানাইল, ব্যারণ মহোদয় তোমায় দেখিতে চান।

ক্রিস্‌তফ্‌কে ভিতরে যাইতে হইল।

একটি ছোট-খাট পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত—চিবুক একটু কামানো—ব্যারণ মহাশয় তাঁর সোনার চসমার উপর দিয়া একবার ক্রিস্‌তফ্‌কে দেখিলেন, তার লেখা বন্ধ হইল না—বালকের বিনীত অভিবাদনেরও প্রত্যভিবাদন দেখা গেল না।

একটু পরেই তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তাহলে—তুমি কি চাও ?

ক্ষমা চাই আপনার কাছে—ক্রিস্‌তফ্‌ ব্যস্তভাবে বলিল, আমি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলাম, আমার চাহিবার কিছু নাই…

ব্যারণ এই আকস্মিক মত পরিবর্ত্তনের কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না ; ক্রিস্‌তফের দিকে একটু ভাল করিয়া চাহিয়া একটু কাশিয়া বলিলেন—

তোমার হাতে যে কাগজখানা আছে একবার দাও ত।"

অজ্ঞাতসারে ক্রিস্‌তফ্‌ দেখিল যে, কাগজখানা সে হাতের মুটোয় পাকাইতেছে তার দিকে ব্যারণের দৃষ্টি।

কোন প্রয়োজন নাই মহাশয়—এখন আর কোন দরকার নাই…

বৃদ্ধ যেন শুনিয়াও শুনেন নাই এইভাবে বলিলেন, ঐ কাগজখানা আমায় দাও।

কলের পুতুলের মত ক্রিস্তফ্ সেই দোমড়ান চিঠিখানা তাঁকে দিল এবং সেই সঙ্গে এলোমেলো কতকগুলো কথা বলিয়া গেল; ব্যারণ কাগজখানাকে সযত্নে চোস্ত করিয়া পড়িলেন এবং ক্রিস্তফের দিকে চাহিলেন; সে হাজার রকম জবাবদিহি করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া তাহাকে থামাইয়া বেশ একটু পেজমী-ভরা দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন—

বেশ ক্রাফ্‌ট্‌, তোমার আবেদন মঞ্জুর করা গেল।

একটু হাত নাড়িয়া বিদায় দিয়া তিনি আবার লেখা শুরু করিলেন; ক্রিস্তফ্ যেন বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া বাহিরে আসিল।

আফিসের ভিতর দিয়া যাইবার সময় সেই কেরাণীটি সদয়ভাবে বলিল, বিশেষ কিছু গোল হয় নি—

ক্রিস্তফ্ চোখ না তুলিয়া তার সঙ্গে করমর্দ্দন করিল এবং প্রাসাদের বাহিরে আসিল। লজ্জায় তার সর্ব্বশরীর যেন হীম হইয়া গিয়াছে। যে যা বলিয়াছে সব তার মনে পড়িতে লাগিল—মানুষের কৃপাকটাক্ষের মধ্যে কতখানি বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে এবং ভিতরে ভিতরে যারা তার দুর্দ্দশায় কৃপালু তারাই বাইরে কেমন শিষ্টাচারের মুখোস পরিয়া কথাবার্ত্তা বলে—সব তার কল্পনায় অতিরঞ্জিত হইয়া দেখা দিল।

বাড়ী ফিরিয়া মা'র প্রশ্নের উত্তর সে দু'চার কথায় সারিল—বেশ একটু বিরক্তির সুর তার মধ্যে বাজিতেছিল, যেন সে এইমাত্র যাহা করিয়া আসিয়াছে তার জন্য লুইসা-কেই সে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে! তার বাবার কথা মনে আসিতেই অনুশোচনায় তার মন ভরিয়া উঠিল। সে স্থির করিল, সব দোষ স্বীকার করিয়া সে বাবার কাছে ক্ষমা চাহিবে। মেলশিয়র বাড়ী ছিল না; তার প্রতীক্ষায় সে অনেক রাত অবধি জাগিয়া রহিল; যতই তার কথা ভাবে ততই তার অনুতাপের মাত্রা বাড়িয়া যায়। ক্রিস্তফ্ তার বাবাকে মনে মনে বেদনা-মণ্ডিত করিয়া দেখিতে শুরু করিল; কত অসুখী তার বাবা! দুর্ব্বল অথচ স্নেহশীল এই মানুষটির প্রতি তার আপনার পরিবারের লোকেরাই কী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে! পিতার পায়ের শব্দে ক্রিস্তফ্ বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল এবং তার বুকে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে গেল। কিন্তু হায়! মেলশিয়র সেদিন এমনই মাতাল হইয়া জঘন্য অবস্থায় আসিয়াছে যে, তার কাছে যাইতেই সাহস হয় না! সুতরাং ক্রিস্তফ্ নিজের কাল্পনিক কারুণ্যটা বেদনাতুর বক্ষে চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছু দিন পরে যখন মেলশিয়র সব কথা শুনিল, সে রাগে আগুন হইয়া প্রাসাদে গোলমাল করিতে গেল—ক্রিস্তফের অনুনয় মানিল না। কিন্তু ফিরিবার সময় একেবারে ল্যাজ গুটাইয়া আসিল; প্রাসাদে কি হইল তার একটা কথাও কাউকে বলিল না। সেখানে মোটেই কেহ তাহাকে সমাদর করে নাই; স্পষ্ট তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, ব্যাপারটা অন্য দিক দিয়া তাকে ভাবিতে হইবে; তার ছেলে ক্রিস্তফের জন্যই ঐ পেন্‌সনটা এখনও দেওয়া হইতেছে কিন্তু যদি আর কোন কেলেঙ্কারীর খবর আসে তখুনি পেন্‌সন্ বন্ধ করা হইবে। সুতরাং ক্রমশ দেখা গেল, মেলশিয়র শান্ত-মানুষটির মত তার হাত খরচ চাহিয়া লইতেছে এবং এই ব্যবস্থার সূত্রপাত যে সে নিজে করিয়াছিল তাহা ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছে! দেখিয়া ক্রিস্তফ্ বিস্মিতও হইল আশ্বস্তও হইল।

কিন্তু তা বলিয়া মেলশিয়র বাইরে প্রতিবেশী মহলে ঘ্যান ঘ্যান করিতে ছাড়িল না—সর্ব্বত্র বলিত, আমার স্ত্রী আমার নিজের ছেলেপিলেরা শেষটা আমার সর্ব্বস্ব লুট করছে! ওদের জন্যই সারাজীবন নিজেকে শুকিয়ে মেরেছি; ওরাই কিনা এখন আমাকে ভিখিরী ক'রে তুললে—আমার সামান্য অভাবে ওদের কাছে হাত পাততে হবে!... সে আবার এমন আজগুবী সব ফন্দি আঁটিয়া ক্রিস্তফের কাছ থেকে টাকা আদায় করিতে চেষ্টা করিত যে, সে হাসিয়া অস্থির হইত, বিশ্বাস করিবে কি! ক্রিস্তফ্ কড়া হইলেই মেলশিয়র আর জেদ করিত না। তার চোদ্দ বছরের ছেলে বিচারকের মত তার দিকে চাহিলেই মেলশিয়র কেমন যেন দমিয়া যাইত কিন্তু পরে নীচ রকম কোন একটা গোলমাল বাধাইয়া প্রতিশোধ লইত। হোটেলে যাইয়া যত খুশী 'খানাপিনা'

করিত এবং দামটা ছেলে দিবে বলিয়া চলিয়া আসিত। ক্রিস্তফ্ বেশী গোলমাল করিতে সাহস পাইত না, পাছে কেলেঙ্কারীটা প্রচার হয়। এই ভাবে মেলশিয়রের ধার শোধ করিতে করিতে মা ও ছেলে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। মাহিনা নিজে না পাওয়ার দরুণ যন্ত্র-সঙ্গতের কাজ সম্বন্ধে সে উদাসীন হইয়া উঠিল এবং তার কামাই এত বাড়িতে লাগিল যে, ক্রিস্তফ অনেক অনুনয় করিলেও মেলশিয়রের জবাব হইয়া গেল! সুতরাং বাবা, ভাইরা ও সমস্ত পরিবারের ভার বালক ক্রিস্তফের ঘাড়ে পড়িল।

চোদ্দ বৎসর বয়সে ক্রিস্তফ্ বাড়ীর কর্ত্তা! —ক্রমশ

একটুকরো রুটী

(গাথা)

শ্রীকণকভূষণ মুখোপাধ্যায়

কাঁদিয়া উঠিল অবোধ বালিকা পাঁচ বছরের মেয়ে
'বাবা গো কি খাব কিছু আর নেই' চোখে জল পড়ে বেয়ে,
'কাঁদছিস্ কেন মা আমার হেমা কেন আঁখি ছল-ছল'
কহিল প্রতাপ, 'আমি তোর বাপ কি মোরে হয়েছে বল'?
রাজার ঝিয়ারি উঠিল ফুকারি লাল হল গাল কেঁদে,
'ঘাসের রুটিটা বেড়ালে নিয়েছে আনো বাবা তারে বেঁধে'।
ছেড়ে দিয়ে হাল ঠুকিয়া কপাল কহিলেন মহারাণা,
'শান্তির কোলে নাও ওগো প্রিয় ব্যথিতের প্রাণ-খানা।
চমকি চাহিয়া দেখেন প্রতাপ আন্‌মনে কাঁদে প্রিয়া,
হাসি-মাখা মুখ হতাশ-মলিন ব্যথায় আকুল হিয়া;
ধৈর্য্যের বাঁধে ধরেছে ভাঙন করিবে কে তার রোধ,
লিখি কি না লিখি ভাবিছেন রাণা জাগিছে আত্ম-বোধ,
চঞ্চল মন নেই কিছু ঠিক করিলেন শেষ স্থির,
মনের বেদনা জানাবেন রাণা নোয়ায়ে 'মোগলে' শির—
ক্ষুৎ-পিপাসায় যার মেয়ে কাঁদে হায় কোথা তার মান
যাক্ মান ডুবে অতল পাথারে যায় যাক্ যদি প্রাণ,

রাণার আদেশে আনিল বাহক কাগজ কলম কালি,
লেখনী-হস্তে নীলাকাশ পানে চাহিছেন রাণা খালি,
লিখিলেন শেষে সাহ্-আকবরে 'ছেলেদের দিও খেতে;—
ডাকে মোরে শ্যাম বনানীর-ছায়া স্নেহের আঁচল পেতে,
রাজার-প্রাসাদ চাহি না আমার চাহি না সিংহাসন
প্রতাপের কাছে তৃণের শয্যা বড় আদরের ধন'।

রুদ্ধ-কণ্ঠে বৃদ্ধ-মন্ত্রী ভাম্-সাহ্ কহে, 'রাণা,
মেবারে'র ভালে এই ছিল লেখা কুমারী পায় না দানা!
'মহারাণা বলি করোনা'ক আর মেবারে'র অপমান'।
কহিছেন রাণা, ভিক্ষুক হয়ে চেয়েছি দয়ার দান,
'রাণা'-কথা মোর বড় বাজে বুকে মনে হয় উপহাস,
জননীর পদ পূজা বিনিময়ে হেনেছি সর্ব্বনাশ।
সিংহের মত পাহাড়ের বুকে কাঁপিলেন তেজে বীর
লক্ষ বেদনা বিঁধিছে বক্ষে শিহরিছে তাঁর শির—
ক্ষণ পরে মনে ভাসিয়া উঠিল একটী করুণ-মুখ
রুদ্ধ ব্যথার হাহাকারে তাঁর কাঁপিয়া উঠিল বুক;
বিছুটির মত হানিছে চাবুক নয়নে জ্বলিছে জ্বালা,
বিদ্রোহী-বীর ভাবেন লিপিকা নিভালো মেবার-আলা।

বন্দিল "ভীল" লিপিকা লইয়া রাণা র চরণ-দুটী
ঝিল্লী-মুখর প্রখর রৌদ্রে চলিল দিল্লী ছুটী।
সভা-মাঝে বসি "সাহ্-আকবর" আলোকি সিংহাসন,
'বীরবল' সবে ছল করি তাঁর করিছে ফুল্ল মন,
এ হেন সময়ে লিপিকা হস্তে কুর্ণিশ করে ভীল,
'মোগল-বাদসা' পড়ে বার বার ভরে না কিছুতে দিল্।
দিল্লীশ্বর আপনার পাশে আঁকিছে মোহন-ছবি—
কৃপার-ভিখারী মেবারের রাণা তাঁহার অঙ্ক লভি।
বাদসাহ-মুখে প্রতাপের কথা শুনিল পৃথ্বীরাজ,
ভাবিল, এখনো নিখিলের পতি হাসিছে পৃথ্বী-মাঝ,—

রাজপুত কবি প্রতাপসিংহে ভরিয়া অগ্নি-বাণী
লিখিলেন, 'বীর তোমার লাগিয়া ধন্য মিবার রাণী,
মানের বাজারে সকল রাজারে রেখেছে বাদসা কিনে,
শুধুই প্রতাপ মিবারের মান একলা রেখেছে চিনে,
কালের প্রভাবে হিমালয়-শির হয় যদি শেষে লয়
চিতানল জ্বালি "বাপ্পা"র নামে জীবন করিও ক্ষয়'।
কবি-লিপি নিয়া চলিয়াছে দূত আরাবলী পথ বাহি—
মেবারের ভূত-গরিমার গানে অনিমিখ যায় চাহি,
রাণার চরণ বন্দিল শেষে কত চলি গিরি-পথ,
সার্থকতার সফল গরবে পুরিয়াছে মনোরথ।

পড়িয়া লিপিকা মেবার গরিমা উজলে রাণার বুকে,
'জানায়ো কবিরে', কহিলেন দূতে, 'প্রতাপ বুঝিবে ভুখে'।
বীর-সন্ন্যাসী হ'ল প্রদীপ্ত নমিল জন্ম-ভূমি
'কবি-পৃথ্বীরে' ধন্য মানিল 'মেবার' চরণ-চুমি।

নারী

শ্রীরাধারাণী দত্ত

পুরুষ সমস্ত জীবন ধ'রে নারীকে শতরূপে দেখেও যখন তার সমস্তটুকু নিঃশেষে বুঝে উঠতে পারলে না, নারীর অনেকটা অংশ যখন সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন ও রহস্যময় থেকে গেল পুরুষের কাছে—তখন তার নারীকে জানবার বাসনা নারীকে বুঝবার আগ্রহ আরও তীব্র—আরও উদ্দাম হ'য়ে উঠলো।

দিশেহারা পুরুষ ছুটে এল নারীরই কাছে তার নারী-হৃদয়ের গোপন তথ্যটুকু জানতে।

চিরাভ্যস্ত আদেশের কণ্ঠে সনির্ব্বন্ধ অনুনয়ের সুর ঢেলে পুরুষ বললে, নারী, আজ তোমায় বলতেই হবে তোমার গোপন রহস্য কথাটুকু ; আমি জানতে চাই তুমি কি-ই? তোমারই নিজের মুখে আজ শুনতে চাই আমি,—কী সে তোমার রহস্য যা পুরুষের জ্ঞানের অতীত—দেবতারও বুদ্ধির অগোচর? আমি শুনবোই সে কথা, তুমি কি-ই নারী? বলো তুমি কি—ওগো—কী তুমি? . . .

শুচিস্মিত আননখানি নারীর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল স্নিগ্ধ নির্ম্মল হাস্যে।

নারী উত্তর করলে, আমি নারী ; আমি সেবিকা, আমি কন্যা, আমি ভগ্নী, আমি পত্নী, আমি মাতা।—এই আমার পরিচয়।

অধীর হয়ে উঠে পুরুষ বললে, জানি জানি,, তোমার ওরূপ, নারী, আমি চাই আজ তোমার অন্তরের পরিচয় ; পুষ্প-পেলব-কোমলা হয়েও কিসে তোমরা এই লৌহকঠিন পুরুষকে শক্তিশালী যোদ্ধাকে তোমার দুর্ব্বল ক্ষীণ শক্তির আয়ত্তে নমিত রেখেছ? শৌর্য্যে বীর্য্যে সুদৃঢ় পুরুষ তার সমস্ত শক্তি, দম্ভ, বিচার, অহঙ্কার লুটিয়ে দিয়ে তোমার পায়ে নতশির হয়ে পড়ে যাতে—কী সে তোমার মোহিনীমায়া, নারী? কোন্ সে তোমার কুহক মন্ত্র?

শুভ্রজ্যোৎস্নার মতো পবিত্রতা ঝরে এলো নারীর সন্ধ্যা তারা তুল্য স্নিগ্ধোজ্জ্বল আঁখি দুটি হ'তে।

শান্তস্বরে সে বললে, শোন তবে। স্রষ্টা নিজহাতে মনের মত করে গড়ে তুললেন তাঁর এই সাধের জগৎ। অভিনব সৌন্দর্য্যে, নব নব বৈচিত্র্যে সৃষ্টির নানা আভরণে সুন্দরতররূপে সাজিয়ে দিলেন তাঁর মানসী তনয়া এই ধরা-রাণীকে! সর্ব্ববিধ সৃষ্টির পর স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য্যের পূর্ণতম বিকাশ হল এই মানব!

সৃজনলীলার জন্য বিধাতা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিণতি মানবকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন—নর ও নারী। কিন্তু তাদের মানবসত্তা মূলতঃ রইল একই। স্রষ্টা নারীর অন্তরে কোমলতা দিলেন অধিক কিন্তু তা সহ ও সংযমে সুদৃঢ়, আর পুরুষের অন্তরে কাঠিন্য দিলেন অধিক কিন্তু অসংযমে সে ভগ্নপ্রবণ!

পুরুষ পেলে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপুল শক্তি,—তার সর্ব্ব অবয়বে সেই শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ সতেজে ফুটে উঠল!—আর স্নিগ্ধসুষমাময়ী নারী—সে যে আনন্দ-স্বরূপিনী, অনন্ত প্রাণশক্তি! তার অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে সেই শক্তির ধারা বেয়ে চল্‌ল অফুরন্ত অক্ষয় প্রবাহে!

গর্ব্বে ও গৌরবে আনন্দিত বিধাতার মনে হল নর ও নারীর এই বিপরীত শক্তি-সমন্বয়ে তাঁর বিশ্ব-সৃষ্টি সার্থক হ'য়ে উঠবে!

পুরুষ আসুরিকতার অনুশীলন করতে করতে তার দৈহিকশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অপব্যবহার করে ফেললে। সে নারীর প্রতি অন্যায় করলে, অনাচার করলে, 'দুর্ব্বলা' ব'লে ঘৃণায় অবহেলার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে অবজ্ঞার হাসি হাস্‌লে!

...দিন যায়...দিন যায়...উৎপীড়িতা নারী অত্যাচারে কাতর হ'য়ে বিধাতার ধর্ম্মাধিকরণে এসে দাঁড়াল পুরুষের বিরুদ্ধে তার পুঞ্জিভূত অভিযোগ নিয়ে!

বিধাতা দুঃখিত হলেন, উন্মনাচিত্তে কি যেন ভাবলেন, তারপর মৌনহাস্যে নারীর প্রতি ব্যথিত দৃষ্টি মেলে ক্ষণেক চেয়ে রইলেন। বুঝলেন, মূঢ় নর এই নারীকে দলিত ক'রে শক্তিউৎসের মুখ্য-পথ রুদ্ধ করতে চায় তার অস্থায়ী নশ্বর শক্তির ক্ষণোত্তেজিত বলের সাহায্যে। তার এই শক্তি-দম্ভ চূর্ণ করতে না পারলে নারীর চেয়ে তার নিজেরই অমঙ্গল যে অধিকতর হবে, শুধু তাই নয়, সৃষ্টিরও মহা অকল্যাণ সাধিত হবে যে!

নারীকে সস্নেহে আহ্বান ক'রে বিধাতা বললেন, নির্ব্বোধ নরের শক্তির গর্ব্ব এমনভাবে খর্ব্ব করা চাই, নারী, যাতে সে নিজেই সব চেয়ে বেশী বিস্ময়ে ও লজ্জায় অধোমুখ হয়ে যায়—এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তার সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি ব্যয় করেও তার কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম না হয়।

দাম্ভিক পুরুষের অপরিমিত শারীরিক শক্তির গর্ব্ব নিমেষে নাশ ক'রে তাকে বিনা অস্ত্রে জয় করবার যাদুমন্ত্র আমি লিখে দিচ্ছি তোমার ওই ললিত বুকে। সেই মন্ত্র-প্রভাবে যে মাধুর্য্য বিকশিত হয়ে উঠবে তোমার লাঞ্ছিত হৃদয়ে—পুরুষের দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির শাণিত তরবারী, তার লৌহ-কবচ বেষ্টিত বলিষ্ঠ অঙ্গের সকল শক্তি, সকল দম্ভ, সর্ব্ব বিজয় ব্যর্থ হ'য়ে গিয়ে তার গর্ব্বোদ্ধত মস্তক তোমার ওই রাতুল চরণতলে লুটিয়ে পড়বে আপনিই।

নারী বক্ষ চিরে হৃদয়ের শোনিত দিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে চিরজাগ্রত অক্ষয় উজ্জলাক্ষরে বিধাতার যাদুমন্ত্রটি লিখে নিয়ে নরের সামনে দাঁড়াল এসে বিজয়িনীর বেশে মৃদু হেসে!

উদ্ধত বীর নর ত্রিভুবন জয় ক'রে এসেও পারলে না এবার শুধু ঐ নারীর বুকের মাধুর্য্যমণ্ডিত ফুলের পরশটুকুকে জয় করতে! সেদিন থেকে যুগে যুগে জন্মে জন্মে পরাস্ত হয়ে আসছে পুরুষ নারীর সেই কুসুম কোমল হৃদয়মাধুর্য্যের কাছে।

নারী চুপ করলে।

বাক্যহীন বিস্মিত পুরুষ স্বপ্নমুগ্ধের ন্যায় নারীর এই গোপন রহস্য শুনে যাচ্ছিল। নারী নির্ব্বাক্ হতেই অধীর আগ্রহে তার কিশলয়-কোমল হাত দু'খানি আপনার উভয় হস্তে চেপে ধ'রে ব্যগ্রকণ্ঠে ব'লে উঠল, বল, বল, কী সে মন্ত্র? বল নারী, কী সে ওই হৃদয়ের মধুউৎস—যার বলে আমাদের সব শক্তি, সমস্ত শৌর্য্য, বীর্য্য, দম্ভ, অহঙ্কার, ধূলায় লুটিয়ে দাও তোমরা?

ধীর উদাত্তকণ্ঠে উত্তর দিলে নারী, আত্মত্যাগ সে মন্ত্রের নাম। স্বয়ং ধাতার দীক্ষিত সে মন্ত্র নারী-বক্ষের মাঝে অক্ষয় অক্ষরে উৎকীর্ণ হয়ে গেছে অনন্তকালের জন্যে! এই 'আত্ম-ত্যাগ' মন্ত্র প্রভাবেই নারী-হৃদয়ে যে মাধুর্য্য-পুষ্প বিকশিত হয়ে ওঠে তারই নাম জেনো ভালবাসা! এই 'ভালবাসার' নাগপাশের জোরেই নারী আজ বিশ্ববিজয়িনী!...এই তার মায়ামন্ত্র—এই তার কুহক, ওগো, একেই তোমরা নিখিল পুরুষ অসীম রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় নামে অভিহিত করেছো!

বিস্ময়বিমুগ্ধ বিহ্বল পুরুষ পুলকাঞ্চিত হৃদয়ে মহিয়সী নারীর জ্যোতিঃস্মিত আননের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অপলক নেত্রে!

সদর ও অন্দর

শ্রীকিরীট ঘোষ

রামতরণ বৃদ্ধ হইলেও তাহার শরীরে যুবার মত শক্তি-সামর্থ্য ছিল। তাহাকে দেখিয়া গ্রামের সকলে বলিত, যৌবনে রামতরণের শরীরে অসুরের মত শক্তি ছিল। বৃদ্ধ হইলেও রামতরণ শক্তির চর্চ্চা করিত। অতি ভোরে উঠিয়া রামতরণ একবার খোলা মাঠে বেড়াইয়া আসিত। মৃদুমন্দ হাওয়া লাগিয়া তাহার শরীর তাজা হইয়া উঠিত—রামতরণ জোরে জোরে পা ফেলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিত। পথে আসিতে আসিতে রামতরণ গুনগুন করিয়া আপন মনে গান ধরিত—

ওরে আমার পাগল মন
চলছিস তুই কাহার খোঁজে
অজানা যে আসবে সে
একদিন ওরে কোন্ সাঁঝে।

আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে বৃদ্ধ রামতরণ তার নিত্য পায়ে-চলা-পথ উৎফুল্ল হইয়া অতিক্রম করিত। পথে যদি দৈবাৎ কোন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হইত, তাহা হইলে রামতরণ 'এই যে' বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিত। প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া 'তা বেশ ভাল হলেই ভাল' 'আহা তা আর কি করবে' 'কপালে কষ্ট আছে সইতে হবে' ইত্যাদি যেখানে যেরূপ দরকার সেরূপ বলিয়া যাইত। কথাবার্ত্তার পর বলিত, চল ভাই একছিলাম তামাক খাবে চল।

এমনি করিয়া বৃদ্ধ রামতরণের জীবন কাটিয়া যাইতেছিল। সংসারের মধ্যে বৃদ্ধের একমাত্র কন্যা বিমলা। কালের নিষ্ঠুর করাঘাতে একে একে সবাই বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া অজানা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ নীরবে তাহাদের আঘাত সহ্য করিয়া কোন রকমে কালাতিপাত করিতেছে।

সংসার মধ্যে দুজন প্রাণী। আয়ের মধ্যে পৈতৃক আমলে কিছু জমি জমা, বাগান, পুকুর ইত্যাদি। ইহার আয়ের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের বৈচিত্র্যহীন জীবন কোন রকমে কাটিয়া যাইতেছিল।

একদিন বৃদ্ধ রামতরণ তাহার দৈনিক ভ্রমণ শেষ করিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরের দাওয়ার উপর গ্রামের নায়েব রামলোচন বসিয়া রহিয়াছেন। রামতরণ তাহাদের নায়েব মশায়কে অতি উত্তমরূপে চিনিত। তাহার মতন দারুণ নিষ্ঠুর, কূটপরায়ণ ব্যক্তি যে গ্রামে একজনও নাই—এ কথাও সে বেশ জানিত। সহসা তাহাকে তাহার ঘরের দাওয়ায় দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। বিস্মিত হইলেও মুখের ভাবে তাহার কোন আভাষ পাওয়া গেল না। রামতরণ কহিল, এই যে নায়েব মশাই! ভাল আছেন ত? তারপর এদিকে কি মনে ক'রে?

নায়েব মশাই একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিলেন, ভাল থাকা থাকির আর কি? যে দিন-কাল পড়েছে তাতে মানে মানে দিন কাটাতে পারলেই ভাল।

রামতরণ বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ তা বটে, তা বটে।

নায়েব মশাই রামতরণের কথা কানে না লইয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, ক'দিন হলো বড়বাবু এসেছেন; সঙ্গে আছে তাঁর প্রাণের ইয়ার গোটা কতক। তাঁদের জ্বালায় অস্থির। দিনরাত মদ মাংস আর মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে আছেন সব। দিন দিন নূতন নূতন জোগাড় করি কোত্থেকে? একি শহর যে অলিতে গলিতে ওসব বাড়ী! শহর থেকে এনে তবে প্রাণ বাঁচাচ্ছি। জলের মত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে জোগাড় করি, বলুন দেখি এসব।

বৃদ্ধ রামতরণ নায়েব বাবুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। নিরন্ন দরিদ্র গ্রামবাসীদিগকে উৎপীড়িত ক'রে, তারা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে পয়সা রোজগার করে, তাতে ভাগ বসিয়ে তার উচিত সদ্ব্যবহার এরা করছেন

বটে! জমীদার?—কে সে? সহরে বসে আত্মসুখে মগ্ন, বিলাসী, হীনচরিত্র যে জমীদার সে আবার জমীদার, তার আবার মান, জমীদার যদি সে তবে গ্রামে এসে বাস করুক, প্রজাদের উন্নতির চেষ্টা করুক, নইলে কেন লোকে তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে?

রামতরণের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া নায়েব মশাই মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তায় সে বিষয়ে আদৌ কিছু টের পাওয়া গেল না। নায়েবমশাই তাঁহার সুখ দুঃখের, তাঁহার চাকুরীর, তাঁহার মনিবের অজস্র গুণগাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রজাদের দুর্ব্ব্যবহার, আর তাহার মনিবের অসীম অপার করুণা প্রমাণ করাই তাঁহার কথার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করিবার পর নায়েব মশাই বলিলেন—আপনার সেলামীটা সকাল সকাল না দিলে বড্ডো অসুবিধা হবে।

রামতরণ বিস্মিত হইয়া কহিল—সেলামী? কিসের সেলামী?

নায়েব মশাই কহিলেন, আশ্চর্য্য হচ্ছেন যে! জমীদার গাঁয়ে এলে-ই তার মানের জন্য সেলামী দিতে হয়—সবাই দিয়ে থাকে। জমীদার—দেশের রাজা! তিনি গাঁয়ে এসেছেন এটা ত আমাদের সৌভাগ্য! তিনি অত বড় মহান্ ব্যক্তি তাঁকেও সেলামী দিয়ে মান রাখতে হবে। মানী লোকের মান রাখতে হবে—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

রামতরণ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—নেই? একশোবার আছে। আমরা দরিদ্র, দু'মুঠো অন্নের ভিখারী! আর তিনি? সহসা রামতরণের চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল—প্রজাদের কষ্ট-লব্ধ অর্থে ধন্য হয়ে তিনি তাঁহার বিলাসের জন্য অজস্র ব্যয় করছেন। অথচ এদিকে তার প্রজা অনাহারে হাহাকার করছে, সেটা তিনি দেখেছেন কি? তিনি জমীদার নন্—তিনি দস্যু, ঠগ্—জুয়াচোর।

মনিবকে এরূপ অপমান করিতেছে দেখিয়া নায়েব মশাই তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহার চক্ষু দুইটা রক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল। তিনি বসিয়াছিলেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাগে তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল। কহিলেন—জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ। দেখে নেবো তোমায়।

নায়েব মশাই দ্রুত জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। রামতরণ তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিল—ভাবটা, যেন কত দেখেছি, আবার কত দেখবো।

সেদিন রাত্রে শুইবার আগে রামতরণ তাহার ডায়েরীতে লিখিল—ক্ষমতার অপব্যবহার করা মানব মাত্রের আধুনিক স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমার শক্তি দেশের উন্নতির দিকে প্রয়োজিত না হইয়া কেমন করিয়া তোমার প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ করিবে, কেমন করিয়া তাহার ক্ষুদ্র বিষয়টুকু গ্রাস করিবে, তাহার জন্য ব্যগ্র হইতেছে। শক্তির এই অপব্যবহারে আমরা অবনতির নিম্নস্তরে দিন দিন পলে পলে নামিয়া যাইতেছি।......

ভোরের দিকে বাহিরের চীৎকারে রামতরণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখিল গ্রামের নায়েব রামলোচন দারোগা বাবুর সহিত ভোর না হইতে হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দারোগা বাবুকে দেখিয়া রামতরণ কহিল—কি মনে করে, দারোগা বাবু অধীনের কুটীরে এসেছেন?

দারোগা বাবু তাঁহার স্বাভাবিক হাসি হাসিয়া কহিলেন, আমরা কি আর আসতে চাই আপনারাই নিয়ে আসেন। কয়েক দিন হলো জমীদার বাবুর বাটীতে চুরি হয়েছিল, নায়েব বাবু কাল গিয়ে বল্লেন—চোরাই মালের সন্ধান পেয়েছি। কাজেই আমায় আসতে হলো।

রামতরণ বিস্মিত হইয়া কহিল—সন্ধান পেয়েছেন? কিন্তু এখানে আসবার কারণটা বুঝতে পারলাম না।

দারোগা বাবু হাসিলেন, কহিলেন—পারলেন না? এই বলিয়া তিনি রামলোচনের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। বুঝিবার যেটুকু বাকী ছিল তাহা রামতরণ বুঝিয়া লইল। কহিল—বেশ আসুন খুঁজে দেখুন।

হাঁ চলুন দেখি, বলিয়া দারোগা বাবু সিপাহী সমেত বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চলিলেন, নায়েব মশাইও তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন। নায়েব মশাই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, রামতরণ দারোগাবাবুর উদ্দেশ্যে

কহিল—আপনি পুলিশের লোক, বাড়ী search করবার অধীকার আপনার আছে কিন্তু নায়েব মশাই কিসের জোরে আমার বাড়ীতে ঢুকছেন ?

অপমানিত নায়েব মশাই লজ্জায় লাল হইয়া সুড় সুড় করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘণ্টা দুই অনবরত পরিশ্রম করিয়াও দারোগাবাবু চোরাই মালের কোন কিনারা করিতে পারিলেন না। বি, এ পাশ করিয়া মাত্র ছয় মাস হইল, তিনি পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন। অনর্থক রামতরণকে কষ্ট দিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, লোককে হায়রাণ করিবার জন্য নায়েব বাবুর এ-টা বোধ হয় একটা জমীদারী চাল। তিনি নায়েব বাবুর উপর চটিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া নায়েব বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অনর্থক এরূপ হায়রাণ করবার ফল কি জানেন ?

নায়েব বাবু আমতা আমতা করিয়া কহিলেন—আমি খবর পেয়েছিলাম—

দারোগা বাবু ধমক দিয়া কহিলেন, থামুন, খুব হয়েছে। আপনার নায়েবগীরি করা বের করছি। এই বলিয়া সিপাহীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, বাঁধো।

প্রভুভক্ত সিপাই প্রভুর এই আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ নায়েব বাবুকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার এই তৎপরতার কারণ, একদিন সে নায়েব কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিল। মনে মনে ঠিক করিয়াছিল সুযোগ পাইলে একদিন না একদিন ইহার প্রতিশোধ দিবে। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে তাহা এতদিন ঘটিয়া ওঠে নাই। আজ সুযোগ পাইয়া তাহার প্রতিশোধ লইল।

গ্রামের মধ্যদিয়া নায়েবকে পুলিশে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া গ্রামের ছেলের দল হাততালি দিতে দিতে তাহার পিছু পিছু চলিল। অপমানিত নায়েব লজ্জায় মুখ কালো করিয়া অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে রামতরণ লিখিল—

কখন কোন্ কর্ম্ম হইতে কি ফল লাভ হয় বলা যায় না। অপরকে অপমানিত করিতে গিয়া অনেক সময় নিজকে অপমানিত হইতে হয়।

মানুষের আসল মূর্ত্তি তাহার কথাবার্ত্তার মধ্যে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় তাহার কার্য্যের মধ্যে।

কবি ওমর খৈয়াম

[বাহার]

Dear, Dear Sultan of the Persian song,
Familiar friend, whom I loved so long,
Whose volumes made my pleasant hiding place
From this fantastic world of right and wrong.

——*Mc. Carthy.*

ওমরের অমর বীণা ইরাণের বুস্তানে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল,—সে আজ বহুদিনের কথা। আটশ বছর পরে তাঁহার প্রতিভার বিচার করিতে যাওয়া,—তাঁহার কবিত্বের সমালোচনা করিতে অগ্রসর হওয়া দুঃসাহসের কাজ—সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহার অনেক লেখাই এখন আর পাওয়া যায় না—তাঁর অনেক কবিতাই ধ্বান্ত রাজির প্রশান্ত কোলে বিলীন হইয়া গেছে।

ওমরের সমসাময়িক লোকেরা তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞ বলিয়াই সম্মান করিতেন। কবি বলিয়া তাঁহার আদর কখনো তাঁহারা করেন নাই। স্বনামখ্যাত সেলজুক সুলতান মালিক শাহ্ ওমরের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ছিলেন সুলতানের আদেশে ওমর বহু গবেষণার পরে এক নূতন সনের প্রবর্ত্তন করেন। ওমরের আবিষ্কৃত জালাল নামক এক নক্ষত্রের নামানুসারে নূতন সনকে জালালী সন বলিয়া

অভিহিত করা হয়। Gibbon বলিয়াছেন "Jalali era surpasses the Julian and approaches the accuracy of the Gregorian style." Mr. Waepeke ওমরের একখানি এলজেব্রার ফরাসী তরজমা প্রকাশ করেন। এই কিতাবখানি বহু শতাব্দী ধরিয়া পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখনো ইহা পণ্ডিত সমাজের আদরের সামগ্রী। Paris Library, Lieden library, India office Library ও Gotha Libraryতে ওমরের গণিত, জ্যামিতি ও কেমেষ্ট্রী সম্বন্ধীয় কয়েকখানি গবেষণামূলক পুস্তক রক্ষিত আছে। সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক Fitzgerald বলিয়াছেন,—

"কবিতা না লিখিলেও ওমরকে বিশ্ববাসী গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক বলিয়া বরণ ডালায় নন্দিত করিত, কিন্তু কবিত্ব তাঁহার অসামান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।"

১৩শ শতাব্দীর স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক শাহার জুরি বলিয়াছেন—"ওমর প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্বন্ধেও একখানি মৌলিক পুস্তক প্রনয়ণ করিয়াছেন। প্রাচীন ইতিহাসে ওমরের আল্‌ওয়াজুদ্ বা প্রকৃতসত্তা বলিয়া একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, এই বইখানিতে ভাবুক ডুবুরি দর্শনের অতল রহস্য-সাগর হইতে অনেকগুলি অপরূপ মুক্তা আহরণ করিয়াছেন। কিন্তু তখনকার লোকগুলি ছিল ভয়ঙ্কর রক্ষণশীল। তাহারা অনুসরণ করিত গতানুগতিকের পন্থা। সুতরাং ওমর যখন প্রচলিত দার্শনিক মতের উপর নূতন রশ্মি-সম্পাৎ করিলেন, তখন পেচকের দল চক্ষু বুজিয়াই রহিল। 'আল ওয়াজুদ'ও বিজন বনে সুরভি ছড়াইয়া নীরবে ঝরিয়া পড়িল।

ইউরোপ ও আমেরিকায় ওমর রুবাইয়াতের কবি বলিয়াই পরিচিত। কবি Fitzgerald-এর দৌলতে ইউরোপ যেদিন ওমরের অপরূপ কবিতার স্বাদ পাইল সেদিন হইতে প্রতীচ্যের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ওমরের আলোচনা শুরু হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় ইউরোপে এমন কোন বড় সহর নাই যেখানে দুচারটা ওমর-সমিতি স্থাপিত হয় নাই—যেখানে অন্ততঃ দুচারজন অধ্যয়ন চিকীর্ষু মানুষ রুবাইয়াতের আলোচনায় তনুমন উৎসর্গ না করিয়াছে।

ওমরের কবিতা যিনিই পড়িয়াছেন তিনিই জানেন তাঁহার কবিতার মূলে রহিয়াছে সংশয় (Scepticism). তাঁহার এক একটি কবিতা যেন সংশয়ের সংহিতা। ওমরের কবিতা পড়িলে মনে হয় তিনি ভয়ঙ্কর অপ্রত্যয়ী। কিন্তু একটানা সংশয়বাদ সব সময় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি আত্মা ও পরমাত্মার রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আপনাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। সব সময়েই তাঁহার মনে হয়"—কে তুমি? কোথা হইতে আসিয়াছ? কী তোমার কাজ? কোথায় তোমার পরিণতি?"—

—"কেনইবা মোর জন্ম নেওয়া
এই যে বিপুল বিশ্বমাঝ
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে,
হেথায় বা মোর কিসের কাজ?
কোথায় পুনঃ কে সে জানে
ফিরতে হবে একটি দিন
উধাও সে কোন মরুর পরে
হাওয়ার মতই লক্ষ্যহীন।" *

এইভাবে তিনি রহস্যের পরে রহস্যের সমাধান করিয়াছেন। তারপর এমন এক অজ্ঞান রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যেখানে প্রশ্নের পরে কোন জওয়াব পাওয়া যায় না; যেখানে মানুষের জ্ঞান স্তব্ধ হইয়া পড়ে, বুদ্ধি নীরব হইয়া যায়—প্রতিভা অবশ হইয়া আসে!

—"তিমির পথের যাত্রী মোরা,
দীপ্ত আলোর রশ্মি কই?
মর্ত্ত্যে হয়ে লক্ষ্য হারা
স্বর্গপানে তাকিয়ে রই।
কর্ণে পশে দৈব বাণী
কোথাও যে নাই আলোক পথ,

* কান্তিবাবুর অনুবাদ।

অন্ধ নিয়ত্ চালিয়ে বেড়ায়
ভাগ্যদেবীর বিশ্ব-রথ।"*

আধুনিক দর্শনের পরিণতিও ঠিক এইখানে। হারবার্ট স্পেন্সার বস্তুকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—Phenomenon ও Neamenon. তিনিও স্বীকার করিয়াছেন অজ্ঞাত রহস্যের সমাধান মানুষের সাধ্যাতীত। রুবাইয়াতে ওমর এই ভাবটিই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

জ্যোতিষী কবি জীবন-রহস্যের সমাধানের জন্য আকাশ পাতাল ঘুরিয়া হয়রাণ হইয়াছেন। গ্রহে উপগ্রহে তারার 'সেতারা'য় পরিভ্রমণ করিয়াছেন। সহস্র চিন্তাক্লিষ্ট দিবা, লাখো বিষাদময়ী রজনী, নীল আকাশের দিকে চাহিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। ইউরেনাস নেপচুন বৃহস্পতি শুক্র কেহই তাঁহাকে জীবন মৃত্যুর প্রশ্নের জওয়াব দেয় নাই। অবশেষে হতাশ হইয়া তিনি বলিয়াছেন "দর্শন Reality-র রহস্যের সমাধান করিতে পারে না। আপ্রাণ চেষ্টায় একটি রহস্যের সমাধান হইলে আর একটি সমস্যা আসিয়া দেখা দেয়, যাহা আরও জটিল, আরও দুরূহ।

—"পৃথ্বী হতে দিলাম পাড়ি
নভগ্রহে মনটা লীন,—
সপ্তঋষি যেথায় বসি
ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন
বিশ্বেটা মোর উঠ্‌ল কেঁপে
কাট্‌ল কত ধাঁধার ঘোর,
মৃত্যুটা আর ভাগ্য লিখন
ঐখানে গোল রইল মোর।" *

এই মত একেবারে অস্বীকার করা চলে না। দার্শনিকেরা বহু রহস্যময় আবরণ অপসারিত করিয়াছেন, স্বীকার করি। কিন্তু বস্তুর শ্রেষ্ঠতম, পবিত্রতম ও মহত্তম দিক (Thing-in-itself)—'যেদিকটা চাঁদের অপরার্দ্ধের মত সূর্য্যালোকে প্রকাশ পায় না' তাহার কোন সন্ধান দর্শন শাস্ত্র দিতে পারিয়াছে কি?

বস্তুর সত্য পরিচয় দিতে অসমর্থ হইয়া ওমর বলিয়াছেন "আমি নিতান্তই অজ্ঞ।" সক্রেটিস্ এবং নিউটনও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। Lawrence Alma Sadema বলিয়াছেন, "We live within the shadow of a veil, which no man's hand can lift" এই ব্যাপারে ওমর আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন —"অবগুণ্ঠনের ভিতরকার কথা যে মানুষ জানে না এই বিষয়ের উপলব্ধিতেই দর্শনের সার্থকতা।

—"পর্দ্দার ওপার কোন রূপসী
কোন পিয়ারীর সলাজ মুখ,
মর্ত্ত্যমানব কেউ শোনে নাই
কেউ দেখে নাই তার চিবুক!
পথের শেষ তার এইখানেতেই
এই দুনিয়ার অন্ধ বুক,
হায়, এ করুণ কেচ্ছা ভবে
শেষ হলনা রইল দুখ।" †

মানুষের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে ওমরের মত অনেকটা চার্ব্বাক ও এপিকিউরাসের অনুরূপ। ওমর বলেন "The flower that once has blown forever dies." সুতরাং 'ভোগ্‌সায়রে ডুব দিয়ে কর্ একটা নিমেষ নেশায় ভোর।" চার্ব্বাক বলেন "যাবজ্জীবেৎ সুখংজীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কৃতঃ।" এপিকিউরিয়ানদের উক্তিতেও এইভাবের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এইজন্য ইউরোপের কোন কোন মনীষি তাঁহাকে Hedonist ও Epicurian বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হয় তিনি ঠিক এপিকিউরিয়াস-পন্থী ছিলেন না।

ওমর বলিয়াছেন "দুঃখের বোঝা লাঘব কর, স্ফূর্ত্তি কর, আনন্দ কর (Eat, drink and be merry) কিন্তু তাই বলিয়া মানুষকে পবিত্রতা নষ্ট করিতে তিনি বলেন নাই। কবির জীবনের মূলমন্ত্র ছিল "অতীতের জন্য অনুতাপ করা অন্যায়—আজ যাহা করনীয় ভবিষ্যতের জন্য

* কান্তিবাবুর অনুবাদ।

† খাজা।

তাহা ফেলিয়া রাখা অনুচিত। কে বলিতে পারে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে না।

"—আজ ফাগুনের আগুন-জালে হুতাশ-বোনা শীতের বাস
পুড়িয়ে সে সব ছাই ক'রে দাও—দাও আহুতি দুখের শ্বাস!
আয়ু-বিহগ—খোঁজ রাখ কি—মেলিয়ে ডানা উড়্‌ল হায়,
পেয়ালাটুকু শেষ ক'রে নাও—একচুমুকেই—ফাগুন যায়।*

বার নামাদাই-উ-গুযাস্তা বুনিয়াদ মাকুন
হাল-ই-খুস বাস উ'উমর বরবাদ মাকুন

'ভবিষ্যত ও অতীতের উপর নির্ভর করিওনা। বর্ত্তমানকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাক। সাবধান,* তোমার (অমূল্য) জীবন নষ্ট করিও না।'

ফারেসের কবিরা সব সময়ই ইশ্‌কে ইলাহী বা ভগবৎ প্রেমে বিভোর—সকলেই প্রেমের মদিরায় মশগুল। কবি-বুলবুল হাফীজ বলিয়াছেন :—

"ওগো হাফীজ, মরণক্ষণে
শারাব শুধু একটি ঢোঁক্
পান-শালার ও গলি ছেড়ে
অমি যাবে স্বর্গলোক" †

ওমর হাফীজের উপর টেক্কা দিয়া প্রেমোৎফুল্ল প্রাণে গাহিয়াছেন—

—"চেতিয়ে তুলো মরণ কালে
দ্রাক্ষা সুধায় প্রাণটা মোর,
মদির স্নানটা করিয়ে দিও,
ঘুচবে যবে মায়ার ঘোর,
পরিয়ে দিও যত্ন স্নেহে
আঙ্গুর পাতার বহির্বাস,
গোর দিও এক বাগান ধারে
সবুজ যেথায় ফুলের চাষ।" *

তথা কথিত ধার্ম্মিকদের সঙ্গে ছিল কবির অহি-নকুল সম্বন্ধ। স্বর্গসুখের আশায় তিনি কখনো তপস্যা করেন নাই—মৃত্যু বা নরকের ভয় কখনো তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারে নাই।

"Tell me not of paradise,
Or the beams of Houries eyes;
Who the truth of tales can tell
Cunning priests invent them so well."

ওমর মুসলমান ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার উদার দৃষ্টিতে হিন্দু মুস্‌লিম, মসজিদ মন্দির সকলই সমান, তাঁহার মতে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একই খোদার কাজ করিতেছে।

—"মজিদ মন্দির দুইটিই ত
দেখছি একই খোদার ঘর,
গির্জ্জা ঘরের ঘণ্টা আর
মুয়াজ্জিনের একই স্বর।
গির্জ্জা মজিদ দেব মন্দির
জপমালা ও তসবীহ্ গাছ
করছে সবাই ভিন্নরূপে
একই খোদার একই কাজ।" *

ধর্ম্মের অসম্ভব অনুশাসন (Dogma) ওমর কখনো মানিয়া চলেন নাই। যাহা তাঁহার বিবেক সম্মত কেবল তাহাই তিনি অবনত মস্তকে মানিয়া চলিতেন। এইজন্য মোল্লারা অনেক সময়ে তাঁহাকে কাফের বলিয়া প্রচার করিত। তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেন না। আক্‌সার মোল্লাদের বিদ্রূপের কষাঘাত করিতেন। রুবাইয়াতে তিনি বলিয়াছেন—

"Some for the glories of this world; and Some
Sigh for the prophet's paradise to come
Ah, take the cash, and let the credit go,
Nor need the rumble of a distant drum." †

ভাবের আতিশয্যে ওমর কখনো কখনো নাস্তিকতার সুর ধরিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্রষ্টা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ

* কান্তিবাবুর অনুবাদ † থাজা
* কান্তিচন্দ্র ঘোষ।

* থাজা।
† রাজ্যসুখের আশায় বৃথা কেউ বা কাটায় বরষ মাস
স্বর্গসুখের কল্পনাতে পড়ছে কারুর দীর্ঘশ্বাস।
নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক্—
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে? মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।—কান্তি ঘোষ

করিতেন। তাঁহার ভগবান সপোনহরের (Scehopenhauer) unconsceious will নহে। তিনি আল্লাহ্‌কে 'আরশে' আসীন বিচারক বলিয়াও মনে করেন না। তাঁহার ধারণা ভগবান সত্য, শিব, সুন্দর, শাশ্বত, অখণ্ড, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। তিনি সকল বস্তুর অতীত—কাহারো প্রার্থনার অপেক্ষা তিনি রাখেন না। তাঁহার মতে প্রকৃত প্রেমিক যিনি ধর্ম্মের অনুশাসন তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। ধর্ম্মের বিধি নিষেধ না মানিয়াই তিনি পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন। একটি রুবাইয়াতে তিনি বলিয়াছেন "তুমি যদি মানুষের উপাসনার পুরষ্কার স্বরূপ তাহাকে বেহেশ্‌তে স্থান দাও তাহা হইলে তোমাকে বণিক বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। তাহাতে কি তোমার দয়া ও প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়?" আর এক জায়গায় তিনি ভগবানকে বলিতেছেন—"বল দুনিয়ায় নিষ্পাপ কে আছে? পাপ না করিয়া মানুষ কেমন করিয়া থাকিতে পারে? আমি পাপ করিলে তুমি যদি শাস্তি দাও, তোমার আমার পার্থক্য রহিল কোথায়?"

Shakespeare-এর মত ওমরেরও ধারণা—জগতের মূলে রহিয়াছে Divinity. কিন্তু ভগবান Divine হইলে তোমার আমার কী? আমরা ত তাঁহার সুখের উপাদান মাত্র। কুম্ভকার পাত্র তৈরী করিতেছে—কোনটি ভাঙ্গিল—কোনটি বিকৃত হইল সেদিকে নজর দিবার তাহার অবকাশ কোথায়?

"The pitchers we whose maker makes them ill,
Shall he torment them if they
chance to spill?" *

এইভাবে কবি সমস্ত দোষ নসীবের ঘাড়ে চাপাইয়া মানুষকে হাস্যমুখে অদৃষ্টকে উপহাস করিতে বলিয়াছেন। স্ফূর্ত্তি, আনন্দ; কাব্য, সঙ্গীত, সাকী ও শরাব দ্বারা জীবনকে পুষ্পিত, আলোকিত ও সাফল্য মণ্ডিত করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—

"সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়;
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে
গুঞ্জে তব মঞ্জু স্বর,
সেই ত সখি স্বপ্ন আমার
সেই বনানী স্বর্গপুর। †

পারস্যের কবিরা সব সময়েই লোকলোচনের দূরে থাকিতে ভাল বাসিতেন। ওমর বলিয়াছেন "এমনভাবে চলিবে, যেন কেহ তোমাকে সালাম করিবার সুযোগ না পায়। এমনভাবে জীবন যাপন করিবে যেন তোমাকে দেখিয়া কাহারো আসন ছাড়িয়া উঠিতে না হয়।" এই কারণেই "কাদরে শালের বাদ আজ মারগে শায়ের" মৃত্যুর পরেই কবির যশ লোক সমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

লাখো ভক্ত-কবির পদরজ বক্ষে ধরিয়া যুগে যুগে প্রাচ্য ভূমি পবিত্রতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপবাসী ওমরকে যে ভাবে বরণ ডালায় নন্দিত করিয়াছেন, আর কাহাকেও সেরূপ করেন নাই। ইউরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই ওমরের তরজমা প্রকাশিত হইয়াছে। এক সময়ে ইংলণ্ডে এক একখানি রুবাইয়াত হাজার হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। ওমরের ভাবের গভীরতা, ভাষার সৌন্দর্য্য ও ছন্দের মাধুর্য্য প্রতীচ্যের শিক্ষিত সমাজকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। Andrew Lang, Mc. Carthy প্রভৃতি কবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় ওমরের বন্দনা করিয়াছেন। অধ্যাপক Parry তাঁহার An approach to philosophy নামক গ্রন্থে সেক্সপিয়র ও ওমরের তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—একদিক দিয়া বিচার করিলে ওমরের স্থান সেক্সপিয়ারেরও বহু উপরে। উভয়েই জীবন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের সুখ দুঃখকে ওমর যেভাবে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন Shakespeare সে রকম পারেন নাই।

হীজরি ৬৭৫ সনে (১১২৯ খৃষ্টাব্দে) যে মৃত্যু রহস্যের সমাধানের জন্য কবি তনুমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই

* Andrew Lang-এর ওমর খৈয়াম কবিতা।

† কান্তিচন্দ্র ঘোষ।

'অমর মরণ' আসিয়া তাঁহার জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দেয়। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি প্রিয়শিষ্য খাজা নিজামীকে বলিয়াছিলেন "এমন স্থানে আমার সমাধি হইবে যেখানে মলয় মারুত সকাল সন্ধ্যায় আমার কবরের উপর পুষ্প বর্ষণ করিবে—যেখানে কলকণ্ঠ বুলবুল ও ভ্রমরকুল সুমধুর সঙ্গীতে আমার চিত্তরঞ্জন করিবে।" ভগবান ওমরের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। নেশাপুরের যে রমণীয় উদ্যানে ওমরের শেষ চিহ্ন সমাহিত হইয়াছে—ছুনিয়ায় তাহার তুলনা নাই। সেই কুঞ্জবন শোভিত পাতায়-ঘেরা গুলিস্তান যিনিই দেখিয়াছেন তাঁহারই হৃদয় তন্ত্রীর তারগুলি মধুর নিক্কণে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। মাইকেলের মত ওমরের সমাধিতে তাঁহারই রচিত একটি কবিতা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ওমর বঙ্গকবির মত গর্ব্বভরে পথিককে তাঁহার সমাধি পার্শ্বে দাঁড়াইতে না বলিয়া অভিমানে করুণসুরে বলিয়াছেন :—

"এর দিল চু জমানা মি কুনাদ গামনাকাৎ
নাগাহ্ বে রাওয়াদ জেতান্ রোয়ানে পাকাৎ
বার সাব্জা নাশী ও খোস বেজী রোজে চান্দ
জাঁ পেশকে সাবজা কার দামাদ আজ খাকাৎ"

"ওগো আমার মন, ছুনিয়ার যত শোক তাপেই তুমি জর্জ্জরিত হওনা কেন, মরণ একদিন তোমার শিয়রে উপস্থিত হইবে। সে দিন তোমার প্রাণ পাখী দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া যাইবে। যে কয়টা দিন বাঁচিয়া আছ এই মখমল শোভিত সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া মনের সুখে সময় কাটাইয়া দাও। কিছুদিন পরে তোমার বুকের উপরেই তৃণরাজি বাড়িয়া উঠিবে।

ডাকঘর

বর্ত্তমান ইউরোপের স্বার্থসঙ্কুল মত্ত-অভিযানে যে ছুন্দুভি বাজে—সে তার প্রকাণ্ড স্বরে জগতের আদর্শের ও সমস্ত ভাবধারার ক্ষীণ অস্তিত্বকে ডুবাইয়া দিতে চায়। কিন্তু এই ভাবধারার অন্তরে আছে মৃত সঞ্জীবনী। ইহারই সাহায্যে সে নিয়ত আপনাকে আপনি মৃত্যুর হাত হইতে নব নব জীবনে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে। এই পুনরুজ্জীবন বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্য ব্যাপিয়া চলিয়াছে এবং 'বোয়ার'-এর সাহিত্যে তার মূর্ত্তি খুব স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

নরওয়ের সাহিত্যে এখন ন্যুট্ হাম্‌সুন্ ও বোয়ার ছুইজনেই জগতের সমক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তবে ছুইজনের লেখার ধারা ও কৌশলের পার্থক্য আছে। ঠিক্ পূর্ব্ববর্ত্তীযুগে নরওয়ে সাহিত্য যখন নূতন করিয়া আবার জাগে তখনও এমনি ছুইটি শক্তি এক সঙ্গে জাগে। একজন বিয়র্ণসন্ আর একজন ইব্‌সেন্। এই ছুইজনের লেখার ভাব ও ধরণও সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। অন্তরের অর্দ্ধমগ্ন চেতনার রাজ্যে, যেখানে আমাদের সমস্ত ব্যক্ত কর্ম্মের বীজ অজ্ঞাতসারে অঙ্কুরিত হয়, যেখানকার অজ্ঞাত ইঙ্গিতে আমরা কর্ম্মের ঘনজীবনে হাসি, কাঁদি বা কলহ করি ;—হাম্‌সুন্ আমাদের সেই অন্তরের গূঢ় গুহাদেশে লইয়া যায় এবং আদি ও অনন্ত কৌতূহলময় রহস্যের সম্মুখে মানব আবার সাম্‌নাসাম্‌নি দাঁড়ায়। জীবন ও জীবন-দেবতা দৃষ্টি বিনিময় করে।

আর বোয়ার আমাদের এই পরিস্ফুট কর্ম্ম জীবনের ও কর্ম্মের একটা জাগরণলোকের সৃষ্টি করে। এবং সমস্ত ভিন্নমুখী কর্ম্মের আপাত বিচ্ছিন্ন ধারাকে জ্ঞান ও কাব্য-দৃষ্টির সাহায্যে এক সর্ব্বশেষ ঐক্যের ধারায় বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এই কর্ম্মের দৃশ্যলোকের উপরে কর্ম্মের প্রেরণার সূতিকাগারে লইয়া যায়। সেখানে আলো, অন্ধকার ও শাশ্বত বিশ্বনিয়ম নিয়ত নবসৃষ্টির বেদনায় জাগ্রত হইয়া আছে। সৃষ্টির আলোক-উৎসবে জীবন ও জীবন দেবতা আবার দৃষ্টি বিনিময় করে।

বোয়ারকে মনে হয় যেন আমাদেরই অতি পুরাকালের এক অমূর্ত্ত পিপাসু আরণ্যক আবার বিংশশতাব্দীর লোক ও

মনস্তত্ত্বের মধ্য দিয়া আপনাকে নূতন ভাবে প্রকাশ করিয়াছে মাত্র।

এবারে বোয়ারের যে চিত্রখানি দেওয়া হইল এখানি তিনি আপনার অন্তরের সমাচারটুকু লিখিয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্তে বাঙলার এককোণে ক্ষুদ্র কল্লোল সংঘের বন্ধুগণকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। সমগ্র ভারত-বর্ষের হইয়া আমরা তাহা কৃতজ্ঞ অন্তরে গ্রহণ করিয়াছি। ছবিখানি স্থানে স্থানে একটু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তাই ব্লক ও ছাপা তেমন ভাল হয় নাই।

নবীনের দল বলিয়া যে দলটির কথা লোকের মুখে শুনিতে পাই, পুঁথি-পত্রে পড়িয়া থাকি তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় কেহ দেন নাই। যাঁহারা দূর হইতে এই বাঙলার নবীনের দলের কথা শুনিবেন, তাঁহারা মনে করিবেন, এটি বাঙলার তরুণ যুবকদের একটি দল।

তরুণের কথা ভাবিতেই স্বভাবত মনে হয়, তেজস্বী, কর্ম্মপাগল, বিকাশ-উৎসুক, নির্ভয় নিঃশঙ্ক যুবকের দল। ইহারা সত্যবাদী, উদার। কোনও ক্ষুদ্রতা ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। নবীনতার বিজয়শ্রী ইহাদের ললাটে লেখা।

কল্লোল এতদিন ধরিয়া এই তরুণের দলকেই কামনা করিয়া আসিয়াছে। বর্ষে বর্ষে এই তরুণদল কল্লোলের পথে পথে দেখা দিয়াছে। নূতন চিন্তা, নূতন আকাঙ্ক্ষা ইহারা জীবনে বিকশিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে।

এই তরুণ দলের সঙ্গে আরও যাঁহারা বয়সের গণ্ডী এড়াইয়া নবীনতার সৃষ্টি-কামনায় উৎসুক তাঁহাদের সকলকে লইয়াই বাঙলার এই নবীনদলের সৃষ্টি। তাই কেবলমাত্র তরুণই এই পরিচয়ের অধিকারী নন্। বয়স আজ এই নবীনতাকে অন্তরের দ্বার হইতে ফিরাইয়া দিতে পারিতেছে না। তাই নব নব কল্পনার সম্পদ লইয়া বহু প্রবীনও এই নবীনদলের সঙ্গী।

গত কয় বৎসরে আমরা এইরূপ একটি নবীনদলের দেখা পাইয়াছি।

কল্লোলের লেখক লেখিকাদের মধ্যে অনেকে বয়সে প্রবীণ আছেন কিন্তু তবুও তাঁহারা নবীনদলের সঙ্গেই সহানুভূতি দেখান, নবীনের দল রূপেই তাঁহাদের পরিচিত হইবার আগ্রহ।

দিল্লী নগরীতে একটি সাহিত্য সমিতি কল্লোলেরই এইরূপ কয়েকজন গ্রাহক ও শুভাধ্যায়ীর প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্য সমিতির সঙ্গেই ইঁহারা শিশুদের লইয়া একটি ছোট সংঘ তৈয়ারী করিয়াছেন। তাহারা আপন মনের খেলায় রচনা প্রস্তুত করে। আবৃত্তি ও পাঠ লইয়া আনন্দ করে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট অভিনয়ও করে। গত কয়েক মাসের মধ্যে এই নবীনদল রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" অভিনয় করিয়াছেন। ছোটরাও একটি কথিকা অভিনয় করিয়াছে।

দিল্লীর বন্ধুগণের এই অনুষ্ঠানটির সংবাদ কল্লোলের বন্ধুদের জানাইতেছি। আশা করি আমাদের প্রবাসী বন্ধুদের এই সমিতির সংবাদ আমাদের কল্লোলের বৃহৎ পরিবারের সকলকেই আনন্দিত করিবে।

গত বৈশাখ মাস হইতে ঢাকা শহরেও কল্লোলের কয়েক জন লেখক লেখিকা ও বন্ধুগণ মিলিয়া একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। পূর্ব্বেও তাঁহাদের মধ্যে ছোট ছোট বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছিল, কয়েকজন মিলিয়া হাতেলেখা পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। ঐরূপ চারখানি পত্রিকা আমরা দেখিয়াছি। 'অতিথি', 'ভগ্নরথ', 'ক্ষণিকা', 'ফসল'—চারখানি পত্রিকাতেই নিজেদের চিত্রীর আঁকা ছবি আছে। লেখাও সব নিজেদের। 'ফসল' পত্রিকাখানি একেবারে ছোটদের জন্য। ছোটদের লেখার সঙ্গে তাহাদেরই বড় ভাই বা বোনের লেখাও তাহাতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই অনুষ্ঠানগুলিকে না রাখিয়া 'প্রগতি সমিতি' বলিয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহাদের কার্য্যাবলীর সংবাদ পাইলে আমরা পরে জানাইব।

'খেলাঘর' বলিয়া একখানি পুস্তক আমরা পড়িতে পাইয়া বড় আনন্দলাভ করিয়াছি। যশস্বী লেখক হেন্‌রিক্‌

ইবসেনের বিখ্যাত নাটক "A Doll's House"-এর ভাব লইয়া এই পুস্তকখানি লেখা। বিদেশী সাহিত্যের মূলগতভাব আমাদের দেশের সাহিত্যের ভিতর দিয়াও প্রবাহিত হইতেছে। মানুষ মনে করে নূতন ভাব-প্রবাহ সনাতন রীতিনীতিকে ভাসাইয়া দিয়া একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষের অন্তরে সমস্ত সংস্কার ও জাতিগত পার্থক্যের অন্তরালে একটি চিরন্তন্ আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর জাগিয়া রহিয়াছে। তাহা মানব-মনের অন্ধগুহায় জন্মলাভ করিয়া বাহিরের আলোর সম্ভাষণ পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। তাহার এই প্রতীক্ষাই মানব-মনের বেদনা। এই বেদনা হইতেই সৃষ্টির সম্ভাবনা পৃথিবীতে সফল হইয়াছে। সৃষ্টির আধার নারী বলিয়া এই বেদনাকে একটি নারীমূর্ত্তিরূপে ইবসেন্ সজীব করিয়া আঁকিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম দিল্লী প্রবাসী। তিনি এই গল্পটি কয়েকবৎসর পূর্ব্বে ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির মূল্য মাত্র এক টাকা। কলিকাতা, আর্য্য পাবলিশিং হাউসে (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট) পাওয়া যায়।

যাঁহারা 'Doll's House' পড়িয়াছেন তাঁহারাও এই 'খেলাঘর'খানি পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন। বই-খানিতে যে একটি বৃহৎ সমস্যা ইবসেন্ মানবজাতির সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা বাঙলাদেশেরও একটি বৃহৎ সমস্যা। তাই বাঙলার পাঠক পাঠিকারাও এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

———

এ যাবৎ কল্লোলে যে সকল গল্প প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লইয়া অনেক আলোচনা আমরা শুনিয়াছি। সে আলোচনাতে প্রশংসাও যথেষ্ট শুনিয়াছি, নিন্দাও কিছু শুনিয়াছি। নিন্দা যাহাদের কাছে শুনিয়াছি, তাঁহারা কেবল যে নিন্দা করিবার অভিপ্রায়েই ঐরূপ আলোচনা করেন নাই তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু এতদিন এ বিষয়ে কিছু বলিতে চেষ্টা করি নাই।

প্রত্যেক লেখকের চিন্তার ধারাকে আমরা সম্মানের স্থান দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এবং সেই কারণে লেখার ক্ষমতা ও পটুতা থাকিলে অনেক গল্প আমরা প্রকাশ করিয়াছি। সেইজন্য যে সকল গল্প প্রকাশ করিয়াছি—তাহার সকল-গুলিরই আখ্যানভাগের সহিত যে কল্লোলের সহানুভূতি আছে তাহা ভাবিবার কোনও কারণ নাই। কল্লোলের সম্পাদক আছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কল্লোল সকল লেখককেই যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। লেখা ছাপা হইলে, লেখক তাঁহার নিজের লেখা পাঠ করিয়াই ভাল বিচার করিতে পারিবেন এরূপ আশা করিয়াই আমরা অনেক গল্প ছাপিয়াছি।

———

অনেক সময় অনেক গল্পের ভিতর উৎকট রকমের ঘটনা আলোচিত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু তবুও লেখকের উৎসাহ বাধা পাইবে মনে করিয়া তাঁহার প্রতিভার সম্মান রক্ষার্থ অনেক গল্প কল্লোলে ছাপা হইয়াছে। ঐ সকল গল্প ছাপা হইলে কল্লোলের কলঙ্ক হইবে এরূপ কথাও কখনও মনে করি নাই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের বহিরাবরণের অন্তরালে একটি চিরন্তন্ ভিখারী মন আছে। সে মন পাগল হইয়া পৃথিবীর সকল আনন্দেরই আস্বাদন পাইতে চায়। সেই আগ্রহের আবেগে হয় ত তাহার মন ক্ষণস্থায়ী ও অসঙ্গত আনন্দকেও বরণ করিয়া লয়। কিন্তু তাহাই বলিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া গেল ইহাও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। এই ভিখারী মন, আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়া যেমন বিরহে কাঁদিয়াছে, তেমনি গৃহদাহের আগুনের শিখা দেখিয়াও নৃত্য করিয়াছে। কিন্তু মন ত তার নিজের সীমানা পায় নাই। তার অন্তরের কামনা গুমরিয়া বিদ্রোহ করিয়াছে। মানুষ, আচার, সমাজ-ভয়, আত্মীয়-বিচ্ছেদের শঙ্কায় মনকে ঠেলিয়া দিয়া লোকানন্দ মূর্ত্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে। এই অসচ্ছন্দতা অল্প বিস্তর অধিকাংশ মানুষেরই আছে। স্বীকার কেহ করুন না করুন—এ-কথা, যিনি মানব-মনের প্রতিদিনের ইচ্ছার লিপি গোপনে বসিয়া পাঠ করিতেছেন তাঁহাকে লুকাইবার উপায় নাই।

———

বিরতি মুক্তির উপায় নয় জানিয়াই নিজেকে শোধিত করিবার নানা উপায় রহিয়াছে। মানুষের কামনা সংখ্যাবদ্ধ নহে। এক কামনাকে পীড়ন করিয়া, দ্বিতীয় কামনাকে শাসাইয়া রাখিয়া, তৃতীয় কামনাকে জয় করিয়া, চতুর্থ কামনাকে নিরোধ করা সম্ভব হয় না। তাই কামনা রহিত হওয়া যাহার সম্ভব মনে হয় সে কেবলমাত্র কামনা রহিত হইবার সকল প্রকার প্রণালী অনুসরণ করে। কিন্তু যাহারা সংসারে, সমাজে, পরিবারে থাকিয়া মানবজাতির সহিত নিজেকে যোগযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা করে, সে নিজ মনের দুর্ব্বল ও সবল সকল কামনাকে পূর্ণভাবেই স্বীকার করে। এই কামনা হইতে যে কল্পনা বিশ্বসাগর মন্থন করিয়া বিষ বা অমৃত যাহাই তুলিয়া দেয় তাহাই মানুষকে পদে পদে জীবনের প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। যে অমৃত পায় তাহার পক্ষে অমর হওয়া সহজ ; কিন্তু অঞ্জলি পুরিয়া যাহার ভাগ্যে কেবলি বিষ ওঠে তাহার পক্ষে ঐ বিষ গ্রহণ করিয়াও মানুষের নিত্যকারের সংগ্রামের ভিতর চিরজীবি হওয়ার ব্যাকুলতা তাহাকে অমর না করিলেও সে সহস্রকে মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে মুক্ত করে।

আমরা জানি অনেক গল্প লেখকের মনও এই ফুটিয়া উঠিবার উল্লাসে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অশান্ত হইয়া থাকে। রচনার ভিতর হয় ত অনেক স্থানে নিজ মনের আকাঙ্খা ভাষাকে আশ্রয় করিয়া মানবতার দ্বারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হয়! যাহারা পারে তাহারা ভিক্ষা না করিয়াই আপনাতে আপনি সম্ভোগের বস্তু খুঁজিয়া বাহির করে। কিন্তু যাহাদের মন চিরপ্রবাস সম্বল করিয়া পৃথিবীর পথে বাহির হইয়াছে তাহাদেরও একটি কথা ভাবিবার আছে। মনের সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ করিয়া লইবার আগ্রহ মানুষকে অশান্তই বেশী করে। বঞ্চিত হইয়া মানুষের দানের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। যাহা নিজে পাওয়া যায় না তাহাই পরকে দান করিবার অধিকার মানুষেরই জন্মায় এবং সে অধিকার মানুষের অনেক সৌভাগ্য হইতে কম নয়। আর একটি কথা, মনের সকল কথাই প্রকাশ করিয়া বলার একটা সাহস দরকার তাহা সত্য, কিন্তু মনের সকল কথা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কতখানি তাহাও ভাবিয়া লইতে হয়। যাহা প্রকাশ করি, তাহার সঙ্গে আমার নিজ মনের যোগ থাকিতে পারে ; হয় ত পৃথিবীর আরও অনেকের মনের কথার সঙ্গে তাহার যোগ আছে। থাকাই সম্ভব বলিয়া মনে করি, কিন্তু কাহার আছে তাহা জানা নাই। এ ক্ষেত্রে সর্ব্বসাধারণের পাঠের জন্য যাহা প্রকাশিত হইবে তাহা যথাসম্ভব নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটু ভাবিতে হয়।

কল্লোলের প্রথম হইতেই উদ্দেশ্য ছিল যে, গল্পগুলির প্রত্যেকেরই একটা সার্থকতা থাকে। এখনও গল্পগুলিতে তাহাই থাকে এরূপ ইচ্ছা। তাহা বলিয়া গল্পের ভিতরে কঠিন একটি সমস্যা ও তাহার গুরুতর মীমাংসাও থাকিতেই হইবে এরূপও কথা নয়। গল্পের ভিতর যে সংযম ও প্রকাশের কৌশল থাকা বাঞ্ছনীয় তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। এ সব কথা কাহাকেও উপদেশ দিবার ছলে লেখা নয়, কেবল মাত্র লেখকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার ইচ্ছাতেই উল্লেখ করিতেছি। কল্লোলের যাঁহারা গ্রাহক বা লেখক তাঁহারা সকলেই কল্লোলকে আপনার জিনিষ বলিয়াই ভাবেন। যাহাতে কল্লোল তাঁহাদের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী হয় তাহার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা প্রয়োজন।

এক বৎসর হইল আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে হারাইয়াছি। বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সাহিত্য-সেবা করিতে করিতেই তাঁহার জীবনে দেশ-সেবার নূতন রূপ প্রতিভাত হয় বলিয়াই সংবাদ পাই। চিত্তরঞ্জন নিজে যেমন সাহিত্যের সেবক ছিলেন তেমনি ছোট বা বড় অনেক সাহিত্য-সেবীকেই, পরামর্শ, সঙ্গ ও অর্থসাহায্য দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন। অনেক দুঃস্থ সাহিত্যিক তাঁহাকে বিপদবারণ বলিয়াই জানিত। চিত্তরঞ্জনের কবি-মনে সহানুভূতি ও মমতার এক অনাহত নির্ঝর প্রবাহিত ছিল। তৃষার্ত্ত নিরুদ্বেগে সে নির্ঝরবারি পান করিয়া শান্ত ও সুস্থ হইয়াছে। বাঙলার কর্ম্মীসমাজে তাঁহার আসন আজও শূন্য রহিয়াছে। দেশের নেতাদলে

তাঁহার পতাকা আজও বাহিত হইতেছে। বিশ্বের সাহিত্য-সমাজে বাঙলার যেখানে স্থান, সেখানে সকল মুক্ত আত্মার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের আত্মা মিলিত রহিয়াছে।

তাঁহার নির্ভীকতা, তাঁহার উদ্দাম, উদারতা ও স্বার্থ-ত্যাগ আমাদের নবযুগের সাধনার পথ আলোকিত করিয়া থাকুক। তাঁহাকে বিনম্র হৃদয়ে পরমাত্মীয়রূপে স্মরণ করি।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "স্মৃতির আলো" এবার প্রকাশিত হইল। তিনি লিখিয়াছেন "শরৎচন্দ্র" এবারও লেখা হইয়া উঠিল না। খুব সম্ভব আগামী সংখ্যায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিব।

গত দুই মাস কল্লোল প্রকাশিত হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। যথেষ্ট কারণ না থাকিলে এরূপ হইত না আশা করি গ্রাহকবর্গ তাহা জানেন। গত তিন বৎসর কল্লোল বেশ নিয়মিত ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। নানা বিঘ্নে যতটুকু পিছাইয়া পড়িতে হইয়াছে আগামী মাস নাগাদ তাহা সারিয়া লইতে পারিব বলিয়া আশা করি।

কল্লোলের আকার পরিবর্ত্তন করাতে অনেক গ্রাহক পত্রে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা এই মামুলী সাইজ্ পছন্দ করেন না। কল্লোলের আকারের মধ্যে যে বিশেষত্বটুকু ছিল তাহা যেন আর নাই। এখন আর কল্লোলকে দেখিয়াই চেনা যায় না।

এরূপ মতামত প্রকাশ করাতে কল্লোলের প্রতি পাঠক-বর্গের একটি নিগূঢ় প্রীতির কথাই প্রকাশ পায়।

আমরাও কল্লোলের পূর্ব্বের আকারই পছন্দ করি। কিন্তু যে দুইটি কারণে আকার পরিবর্ত্তন করিতে হইল তাহা আমরা পূর্ব্বেই সবিনয়ে জানাইয়াছি। সুতরাং আশা করি বন্ধুবর্গ আর এ বিষয়ে আমাদের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

এবারে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র বাবু অসুস্থ থাকায় তাঁহার নূতন উপন্যাস "রূপ-ছায়া"র লেখা দেন নাই।

আজ আষাঢ়ে সত্যেন্দ্রনাথের কথা আবার মনে হইতেছে। সত্যেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যে কতবড় ক্ষতি হইয়াছে তাহা যত দিন যাইতেছে ততই বোঝা যাইতেছে। বাংলাদেশে আজ এক নূতন মানবের দল জাগিয়া উঠিতেছে। তাহাদের চারিদিকে অভাব, অভিযোগ, স্বার্থপরতা ও পরাধীনতা; তাহাদের অন্তরে ফুটিয়া উঠিবার অসীম পিপাসা; সর্ব্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা সগৌরবে জগতের নব বিস্ময়ের মত জাগিতে চায়; তাহারা জগতে পরিচয় দিতে চায়, তাহারা বাঙালী—বাংলা দেশের ছেলে!

তাহাদের পায়ের তলায় কুশাঙ্কুরেরর মত হয় ত ভুল ও ভ্রান্তি জাগিয়া আছে, কিন্তু তাহারা আজ বুঝিয়াছে যে, পথে চলিতে হইলে কুশাঙ্কুর দলিয়াই চলিতে হইবে। ভুল ও ভ্রান্তিকে স্বীকার করিয়া ভুল ও ভ্রান্তিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এই নবযুগের কবি। বাংলার ভাব-গঙ্গার তিনি ছিলেন নব ভগীরথ। তারুণ্যের ও যৌবনের তিনি ছিলেন চারণ-শ্রেষ্ঠ। একদিন বঙ্কিমচন্দ্র সুপ্ত তিমিরাচ্ছন্ন দেশে দেশ-মাতৃকার এক প্রাণময়ী অভিনব মূর্ত্তির প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা ছিল দশভূজা অসুরদলনী রুদ্রা মাতৃমূর্ত্তির মধ্যে। সে রুদ্রানীর সম্মুখে বাঙালী 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ আসিয়া দেশ-মাতৃকার আর এক অভিনব রূপ দেখিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাংলা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তির মধ্যে ধরা দিল। যে শাশ্বত বঙ্গভূমি যুগ যুগ ধরিয়া রৌদ্র ও রস গ্রহণ করিয়া অবিরত ভাবে শ্যামলিমার নব নব জন্ম দিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন সেই অপূর্ব্ব রূপময়ী জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী—বাংলার কথা। বঙ্কিমচন্দ্র জাতির

অন্তর্নিহিত গাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার তন্ত্রীতে আঘাত করেন—রবীন্দ্রনাথ আঘাত করিলেন জাতির অন্তর্নিহিত অপূর্ব্ব রূপোন্মাদনার তন্ত্রীতে।

আর সত্যেন্দ্রনাথ বাঙালীর অন্তর্নিহিত গতির তন্ত্রীতে আঘাত করেন। তিনি বাংলার এক অভিনব রূপ দেখেন। সে রূপ দশভুজার নয়—সে রূপ সোনার অন্নপূর্ণা প্রতিমার নয়—সে রসময়ী গতিময়ী গঙ্গার আর পদ্মার মূর্ত্তি। সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন যে, বাংলার অন্তরে চিরকাল ধরিয়া একটা বিরাট ভাবের প্রবাহ চলিয়াছে। নব-যুগের উসর প্রান্তরে আবার নব-সাধনার বলে সেই ধারা-স্রোতকে জাগাইতে হইবে। সত্যেন্দ্রনাথের বাংলার প্রতীক্ তাই বাংলার নদী,—গঙ্গা, মেঘনা, পদ্মা, তিস্তা।

তাঁহার অসম্পূর্ণ সাধনার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ তরুণ সহযাত্রীদের জন্ম এক অপূর্ব্ব গতির বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। দেশ দেশান্তর হইতে, আগত অনাগত কাল হইতে আজ অদৃশ্য ভাবে বাঙালীর জীবনে নব নব আহ্বান আসিতেছে। বাঙালীকে সে আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে। তাহার কবির ভবিষ্যৎ-বাণীকে সফল করিতে হইবে।

রূপ ও আঁখি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

হায় রূপখোর চতুর আঁখি,
নেশায় হইবি ফতুর নাকি!
ভুলাইল তোরে জ্যোতির্বল্লী সে,
চেয়ে চেয়ে ধ'রে গেল 'চল্লিশে';
এখনও যখনও চশমার ফাঁকে
চালাও ফাঁকি,—
ফতুর হইবি চতুর আঁখি!

যৌবন হাওয়া প'ড়ে আসে হায় রূপের পালে
চিহ্ন রাখিয়া ত্রিবলী আঁকিয়া গণ্ডে ভালে।
এখন হয়েছে এ জীবন বাওয়া,
উজানে তুফানে গুন টেনে যাওয়া,
তারি বাঁকে বাঁকে চুরি ক'রে চাওয়া—
মানায় নাকি!
হায় রূপখোর চতুর আঁখি!

বিপুল বিশ্বে দৃশ্যে দৃশ্যে খোরাক তোর;
সকল ছাড়িয়া রমণী-রূপের হইলি খোর!
ভবিষ্য আশা খোয়ালি বৃথায়,
রমণী দেহের কমনীয়তায়;
রাঙা মেঘে তোর সুনীল আকাশ
ফেলিল ঢাকি;
ওরে নেশাতুর ফতুর আঁখি!

হায় রূপখোর চতুর আঁখি!
ফতুর হবার কি আর বাকি?
ত্রিযামা রজনী বিষম নেশার তৃষার টানে,
মাতাল জীবন বেতালে কাটাস্ ওরূপ-পানে।
যত চেয়ে আছ বাড়িছে ধন্দ,
বংশকুঞ্জে ওরে ডোমান্ধ!
দেখিতে এবার পেলিনে রূপের
স্বরূপটা কি;
হায় লোভাতুর ফতুর আঁখি!

হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅবনীনাথ রায়

প্রসিদ্ধ লোকদের জীবনী আলোচনা করিবার সনাতন পদ্ধতিই আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে ; যাঁহাকে বিশেষ কেহ জানে না তাঁহার সম্বন্ধে কেহ কিছু শুনিতে নারাজ। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়, এই প্রসিদ্ধ লোকদের মূল্য আমাদের জীবনে গৌণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূল্য আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমার পিতামাতা আত্মীয় বন্ধুদের জীবনের চেয়ে বেশী মূল্যবান নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্রদ্ধা করি কিন্তু বন্ধুকে ভালবাসি। তাই বন্ধুর সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে আমার দিক দিয়া তাহার কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় না।

যাঁহারা প্রসিদ্ধ হন তাঁহাদের নামটাই আমাদের কানে আসিয়া পৌছে কিন্তু কত অগণিত লোক তাঁহাদের বাণী অকথিত রাখিয়া, তাঁহাদের বুকভরা শক্তি বুকে পুরিয়াই যে চলিয়া যান, তাঁহাদের হিসাব সংসারে কে রাখে? ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, আমাদের দৃষ্টি কতটুকু, তাহা কত সামান্য পদক্ষেপেই না প্রতিহত হয়।

হরিসাধন বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় মীরাটে। শুনিলাম "বসুমতী"তে 'ঋণী' বলিয়া তাঁহার একটি গল্প বাহির হইয়াছে। জীবনের কোন্ এক প্রভাতে আমার বোলপুর বাস ঘটিয়াছিল, তাহারই জোরে মনের মধ্যে একটা অহঙ্কারকে লালন করিতাম। নতুন সাহিত্যিকের হয় ত প্রথম উদ্যম—সেটা যে কি ধরণের হইবে তাহা যেন কল্পনায় দেখিতে পাইলাম। কয়েক দিন পরে কাগজখানি যখন হাতে পড়িল কৌতূহল পরবশ হইয়া পড়িয়া দেখিলাম—একটা ধাঁধা কাটিয়া গেল। লেখকের প্রতি কৃপাদৃষ্টির পরিবর্ত্তে সম্ভ্রমের দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু আরো বড় পরিচয় হইতে তখনো বাকি ছিল! আমার এক বন্ধুর মেসে তিনি একদিন তাঁহার কবিতার খাতা লইয়া আসিলেন। গল্প-লেখক যে কবিতাও লিখিতে পারিবেন ইহা মনে করি নাই—তাই কবিতার মধ্যে ছন্দপতন অসামঞ্জস্য পদে পদে আশঙ্কা করিতেছিলাম। শুনিয়া শুধু আশ্চর্য্য নয়, মুগ্ধ হইলাম। এ ত শুধু চিত্তবিনোদনের জন্য কবিতা নয়, এ যে কাব্য-সৃষ্টি। আর এ সাধনা ত শুধু এ জীবনেরই নয়—এর আরম্ভ যে জীবনান্তরে।

কাহারো জীবনই কাব্য, কাহারো কাব্যই জীবন। জীবনই যে কাব্য হয় তাহার প্রমাণ হরিসাধন বাবুর জীবনে আমি দেখিয়াছি। সমস্ত দিনরাত কাব্য ব্যতীত কোন চিন্তাই তাঁহার ছিল না—মাটিতে বাঁচিয়া থাকিয়াও যেন মাটির মানুষ ছিলেন না—সর্ব্বদাই একটা কল্পলোকে বাস করিতেন। আপিসে কেরাণীগিরিও করিতেন কিন্তু কেরাণীর মন কোন দিন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আপিসের নিয়মিত কাজ সারিয়া সময় পাইলেই কবিতা লিখিয়া চলিতেন—নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশি আদৌ আপিসে থাকিতে চাহিতেন না। কামাই যে কত করিতেন তাহার সংখ্যা ছিল না। তাহার জন্য একবার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া সাহেবের সহিত ঝগড়া করিয়াছিলেন—তাহাতে এতটুকুও দৌর্ব্বল্য ছিল না। সাহেব তাহার পর হইতে তাঁহাকে সম্ভ্রম করিত—আর কোনদিন কিছু বলিত না।

বাড়ীতে যতক্ষণ থাকিতেন সর্ব্বদাই লিখিতেন—হাতে ফাউন্টেন্ পেন এবং সাম্‌নে কাগজ ও খাতা থাকিত—ভয়ানক হাঁপানীর অসুখ ছিল—পাশে একটা পাত্রে খানিকটা জল রক্ষা করা হইত—তাহাতে মাঝে মাঝে থু থু ফেলিতেন—আর চা যতবার আসিত কখনো আপত্তি করিতেন না। এই অতিরিক্ত চা খাওয়ার জন্য বোধ করি তাঁহার স্বাভাবিক আহার কমিয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইলে সাহিত্যের আলোচনা চলিত। যতক্ষণ একলা থাকিতেন, কি দিনের বেলায়, কি রাত্রে, হয় পড়িতেন, না হয় লিখিতেন।

১৯২৪ সালের আগষ্ট মাসে আমি দিল্লী বদলি হইয়া আসি। তখন হাতে লিখিয়া একটা কাগজ বাহির করিবার idea তাঁহার মনে উদয় হয়। যে বাড়ীটায় বসিয়া আমাদের সাহিত্যের জল্পনা চলিত তাহার নাম দিয়াছিলাম "আনন্দ-লোক।" তাই হাতে লেখা আমাদের প্রথম "আনন্দ-লোক" আমি চলিয়া আসার পর ঐ মাসে বাহির হইল। তাহার Foreword এই কয় লাইন দেওয়া হইয়াছিল :—

"চিরযুবা তুই যে চিরজীবি !
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।"

সম্পাদক হইলেন হরিসাধন বাবু আর আমাদের অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। কিন্তু নাম যারই থাকুক আর লেখা আর যিনিই দিন্—"আনন্দ-লোকে"র প্রাণ ছিলেন হরিসাধন বাবু। লেখা প্রায় চৌদ্দ আনা নামে এবং বেনামে তাঁহারই থাকিত এবং তাঁহার অভাবে যে আনন্দ-লোক টিঁকিতে পারে না তাহাও আজ প্রমাণ হইয়া গেছে।

এই হাতে-লেখা কাগজ সাহিত্যের নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি করে নাই—তাই কোন্‌দিন অতর্কিতে ইহার অভ্যুদয় হইল, আবার কোন্ কি অজ্ঞাত কারণে ইহা মিলাইয়া গেল, তাহার ইতিহাস লইয়া কেহ মাথা ঘামাইবেন না জানি ; কিন্তু আমাদের স্মৃতির ইতিহাসে ইহা অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে—সেখানে ইহা অমূল্য।

রবীন্দ্রনাথের নামে হরিসাধন বাবু মাতিয়া উঠিতেন—কতবার শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখকের হইয়া ওকালতি করিয়াছি, সফল মনোরথ হই নাই। রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" তিনি একেবারে শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে পারেন নাই—খানিকটা পড়িয়াই আনন্দে এত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, "অকাজের বাঁশী" নাম দিয়া একটি নাটিকা রচনা করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার নিজের সুরের ভাষাতেই বলি, "রবীন্দ্র-নাথের" 'রক্তকরবী' এবার আমায় দোলা দিয়েছে—তার আবেগকে ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে আমি সাম্‌লাতে পারি নি ! ঐ মহাপ্লাবনে আমার নির্ঝর চঞ্চল হয়ে নেচে উঠেছে—এবার সেই নর্ত্তনের চঞ্চল তালে তালে বেজেছে আমার অকাজের বাঁশী।"

তিনি পড়িয়াছিলেন খুব, লিখিয়াছিলেনও অনেক, আবার উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার চেয়েও বেশি অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাপই তিনি বহন করিতেন না। এ হেন লোক যে সাধারণের কাছে লোকরঞ্জক হইবেন না, ইহা বোধ হয় স্বতঃসিদ্ধ কথা। মানুষ প্রধানত বাহিরটা দেখিয়াই ধারণা করে কিন্তু বাহিরের কোন সম্পদই ত তাঁহার ছিল না। চেহারাটা সম্বন্ধেও বিধাতা তাঁহার প্রতি কৃপণতা করিয়াছিলেন—ছোটখাট মানুষ ছিলেন, দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহার শরীরটাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কাশিও লাগিয়াই ছিল—এত দুর্ব্বল ছিলেন যে, হাঁটিতে কষ্ট হইত—রাত্রে সাধারণ মানুষের মত লম্বা হইয়া শুইতে পারিতেন না—উপুড় হইয়া শুইতেন। তাই সকলে তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিত না। অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী লোক তাঁহার সহিত শুধু শুধু তর্ক করিতে আসিয়া ঠোক্কর খাইত। অশিক্ষিত-পটুত্বকে তিনি আঘাত করিতে ছাড়িতেন না। কেবল মানুষের মধ্যে যেটুকু নগ্ন সত্য সেইটুকুই তাঁহার নিকট সম্মান পাইত। চিঠিতে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' কথাটা শুধু চিঠির খাতিরে লেখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। প্রণাম বা নমস্কার যাহাকে তাহাকে তিনি করিতে পারিতেন না। পূজা-পার্ব্বণ গান-বাজনা লেখার আড্ডা প্রভৃতি গণ্ডগোলের মধ্যে তিনি বড় একটা যাইতে চাহিতেন না। সাধারণ হইতে সব বিষয়েই তিনি একটু স্বতন্ত্র ছিলেন।

তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিয়াছিলাম ইহাই জানা ছিল কিন্তু কখন্ যে দেনার পালার ভিতর দিয়া লেনার পালা সুরু হইল জানিতে পারি নাই। যখন জানিতে পারিলাম, তখন তাঁহাকে নিবিড় করিয়াই ধরিতে চাহিলাম কিন্তু বিধাতা আর বেশি সময় দিলেন না। তাই এখন মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি, জীবনের এই ত্রিশ বৎসর অনেক লোকেরই ত সঙ্গ করিলাম কিন্তু এই লোকটা জীবনের সঙ্গে গাঁথা হইয়া গেল কিরূপে যাহার সহিত পরিচয়ের পালা গণিয়া দেখিলে দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

ডায়ারি তিনি নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ লিখিতেন—তাঁহার এই ডায়ারি সাহিত্যের একটি অপরূপ ভাণ্ডার। বন্ধুবান্ধবকে চিঠিপত্র যাহা লিখিতেন তাহার প্রথম লাইন হইতে শেষ লাইন পর্য্যন্ত একটা সুরে বাঁধা—তাহাতে কুশলপ্রশ্ন বড় একটা থাকিত না। সেটা তাঁহার সেই সময়কার মনের ভাবের একটা ছবি। তাঁহার এই চিঠির প্রত্যেকখানি সাহিত্য-হিসাবে প্রকাশিত হইবার যোগ্য। গল্প বোধ করি তিনি বেশি লেখেন নাই—তবে কথিকা ধরণের ছোট গল্প অনেক লিখিয়াছিলেন। আর কবিতা লিখিয়াছিলেন অজস্র—পাঁচ ছয়শত পৃষ্ঠার বাঁধান খাতা অনেকগুলি বোঝাই হইয়া গেছে। এই সমস্ত কবিতা হয় ত কখনো ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হইয়া সাধারণের সমাদর লাভ করিবে না কিন্তু যিনি সব জানিতে পারেন তাঁহার দরবারে এগুলি শোনান হইয়া গেছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি।

জীবনের অনেক বৎসর তিনি প্রবাসেই কাটাইয়াছিলেন—ইদানীং বোধ হয় দশ বার বৎসর আর দেশে যান নাই। কিন্তু এই কথা মনে করিয়া আশ্চর্য্য হই যে, এবার অসুস্থ অবস্থায় কেন দেশে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল হইয়াছিল। বাংলা মায়ের যে ধাত্রী তাঁহাকে শৈশবে লালন করিয়াছিলেন তাঁহার ডাক তিনি দূরে থাকিয়াই শুনিতে পাইয়াছিলেন—তিনিও মায়ের ক্রোড়ে ফিরিয়া গিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। মৃত্যুর ঠিক দুই দিন আগেও তিনি চিঠি লিখিয়াছিলেন—"এ আমার সাধনার দেশ, আমার মধুচক্র, আমার জীবনের সকল ভালমন্দর পূজা-মন্দির।" তারপর ১৯২৫ সালের ২৫এ অক্টোবর তারিখে বাংলার অখ্যাত নামা কবি বাংলারই উদার আকাশের তলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার নিজের জীবনে সকলের চেয়ে বড় সত্য এই যে, এই বিশ্বের প্রতি আমি উদাসীন ছিলাম না, জগতকে শিশুকাল থেকে ভাল বেসেছি, আমার পক্ষে সূর্য্য বৃথা উঠে নি, সূর্য্যাস্ত যে বাণী নিয়ে আসত মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করেছি, ফুল আমার হৃদয়কে হিল্লোলিত করেছে।" হরিসাধন বাবুও যে বিশ্বপ্রকৃতিকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা তাঁহার যে কোন লেখা হইতেই বোঝা যায়। একটা এখানে উদ্ধৃত করি, "নিবিড় বনের আড়ালে কেকাস্বর মুখরিত সেই শান্ত সন্ধ্যার দীপ্তি, বনের সীমায় শূন্যতার পথে পথে প্রেরিত ম্লান অস্তমিত তপনের শেষ বিদায়ের রাগিণী, চারিদিকের একটা উদার অনাহত শান্তি, আর সেই শান্তির মাঝে আমারা ক'জন কবির বাণীর সত্যকে উপলব্ধি করছি—বস্তু নয়, লাভ নয়, ক্ষতি নয়, দ্বিধা নয়, দ্বন্দ্ব নয়—এমনি করে অকারণ আনন্দ উপলব্ধি করাই অমৃত—এমনি অন্তর-লোকের অতিথি হওয়াতেই জীবনের পূর্ণতা।"

তাঁহার যাওয়ার সময় হয় নাই, অসময়ে আমাদের ছাড়িয়াছেন মনে করিয়া যখন অভাব অনুভব করি তখন এই সান্ত্বনার বাণী ভাসিয়া আসে যে, তিনি যতদিন বাঁচিয়া-ছিলেন, তাঁহার বাঁচা সার্থক হইয়াছিল, নিখিলের মধ্যে তাঁহার স্থান হইয়াছে। তাই আমাদের মধ্যে তিনি আজ না থাকিলেও তাঁহাকে আমরা হারাই নাই। আমাদের একবন্ধু তাঁহার মৃত্যুর খবর পাইয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, "যে তীর্থক্ষেত্রে আমরা দু'জনে পরিচিত হয়েছিলাম তারই পুণ্যতম প্রতিমা দগ্ধ হয়েছে। * * * আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে—এ কি কোথায় এলাম আমি? চীৎকার করে কেঁদে বলতে ইচ্ছে করছে, আলো কই, ওগো আলো দেখাও। এর চেয়ে অন্ধকার যে ছিল ভাল। অজ্ঞতার অন্ধকারে যখন কিছুই দেখ্‌তে পাই নি তখন সুখী না হলেও দুঃখ ত পাই নি। আজ একি অবস্থায় আমি পড়েছি—এগোবার রাস্তা জানি না, পেছোতেও পারছি না।"

এর পরও কি মানুষের বাঁচা চাই?

দিল্লী
ফেব্রুয়ারি '২৬

শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়

চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৩৩ সাল

সম্পাদক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

স্বপ্নকথা

গোকুলচন্দ্র নাগ

'এই ভাল ওগো এই ভাল।'

আমার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত করে আমার শুষ্ক কণ্ঠ হতে কেবলই এই কথাটি বেজে উঠ্‌ছে—'এই ভাল ওগো এই ভাল।'

আজ এই শ্রাবণ সন্ধ্যায় ঘন নীল মেঘ সারাটী আকাশ জুড়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বিরহীর বুক ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত হু হু করে ভেসে আসছে।

আমার সাম্‌নেকার এই আঁকা-বাঁকা পথটীর দু'ধারে গাছের সারি, যেন কোন অজানা প্রিয়তমের স্পর্শ পাবার জন্য সহস্র বাহু আকাশের পানে মেলে দিয়েছে। আর আমার চারিধারে আছে শুধু অতলস্পর্শ আঁধার সাগরের মোহভরা নিথর জল! আর কেহ নাই, কিছু নাই!—না—না, আছে বৈকি, ঐ যে আমার মাথার উপর ঝোপের মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা ঝিল্লি সমস্ত নীরবতা ভঙ্গ করে আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ছে—শুন্‌তে পাচ্ছ না? ওরা যে আমারই ব্যথাক্ষত হৃদয়ের করুণ রাগিণীটির প্রতিধ্বনি!

পাতার ফাঁক দিয়ে কয়েক বিন্দু বৃষ্টির জল আমার মুখের উপর এসে পড়ল। আঃ কি মিষ্টি! বৃষ্টি পড়ার রিম্ ঝিম্ শব্দ আমার কানে যেন ঘুম পাড়ান গানের মত লাগ্‌ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া অদৃশ্য বন্ধুর মত আমার মুখে বুকে তার স্নেহব্যাকুল হাতখানি বুলিয়ে দিচ্ছে।

সকাল হতে গোধূলীর শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত যখন পাগলের মত ছুটে চলেছিলাম, তখন আরাম যেন আমারই গায়ের হাওয়া লেগে দূরে বহু দূরে সরে যাচ্ছিল। আরো কত দূর? আর ত ক্ষমতা নাই। আমার ক্লান্ত দেহখানি বুঝি ধুলায় লুটিয়ে পড়তে চায়! আমার চোখ দু'টী ব্যাকুল ভাবে সামনের পথের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার রুদ্ধকণ্ঠ ঠেলে কতকগুলি জড়িত শব্দ বেরিয়ে এল—ওগো কে ব'লে দেবে এ পথের শেষ কোথায়?

কি কর্কশ স্বর, এ কি আমারই মুখের ভাষা! একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমার বুক হ'তে বেরিয়ে গেল। সে শব্দ এখনও যেন শুন্‌তে পাচ্ছি, বাতাসের সঙ্গে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

দু'একটী করে সমস্ত দিনের ঘটনা আমার মনে পড়ছে। তখনও প্রভাতের আলো পৃথিবীর উপর এসে পড়ে নি, শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা পাখী ঘুম থেকে জেগে গান গেয়ে উঠ্‌ছে। আমি পথে এসে দাঁড়ালাম।

ওগো আমার পায়ের তলার মাটি! ওগো সর্ব্বংসহা, তোমার ঐ শিশির ধোয়া মুখের উপর যখন নির্ম্মল প্রভাতের প্রথম রশ্মি এসে পড়ল—মাগো কি সুন্দর তুমি! তোমার শ্যামল বসনখানি মৃদু বাতাসের হিল্লোলে দু'লে দু'লে উঠ্‌ছে। শত শত যূথী মল্লিকা তোমার আঁচলখানি ভ'রে ফুটে রয়েছে। তন্দ্রাজড়িত তোমার চোখ দু'টী যখন নীল আকাশের শুকতারাটীর উপর পড়ল—কি মধুর সে চাহনি স্নিগ্ধস্নেহে ভরা।

লতায়, পাতায়, ফুলে, বনে, পাখীর কণ্ঠে, সর্ব্বজীবে তোমার যে বন্দনা গান বেজে উঠ্‌ল কি মধুর তার সুর! তারপর জানি না সে কোন্ অজানা শক্তির টানে আমার যাত্রা শুরু হ'ল!

অপূর্ব্ব আনন্দে শ্যামল তরুবীথিকার ভিতর দিয়ে নদীর কূলে কূলে ছুটে চলেছি। আমার চারিদিকে শুধু ফুল, হাসি গান—অফুরন্ত। কিন্তু তাদের পানে ফিরে তাকাবার অবসর নেই, সাম্‌নের টানে, সাম্‌নের পানে ধেয়ে চলেছি। বাধা বন্ধনহারা স্রোতের মত, আপনার আনন্দে আপনি বিভোর।

আমার চলার আনন্দে যাদের দিকে একবারও ফিরে দেখি নি, এখন যেন তারা আমার ধূলিশয্যার উপর এই অবসন্ন দেহটার প্রতি পলকহীন চোখে চেয়ে আছে! ওদের চোখে ওকি চাহনি? এ কি পরিহাস! না গো না, পরিহাস নয়। ওরা বলে—ওগো তুমি যার জন্য অত ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে চলেছ আমাদের অবহেলা ক'রে, তার আসনখানি যে আমাদেরই মাঝে পাতা হ'য়েছে! এ আনন্দ উৎসবে আমাদের যদি না দেখ, তাহ'লে তাকে ত দেখ্‌তে পাবে না।

কিন্তু তখন ত আমার এই পথের সাথীদের কথা মনে লাগে নি; আমি ছিলাম চলার আনন্দে মেতে, মনে করেছিলাম এমনি করেই আমার পথের শেষে এসে পৌছাতে পারব। হায় দুরাশা!

মনে পড়ে না কখন আমি চোখ জুড়ান সবুজ ছায়া অতিক্রম করে এক মরুভূমির মধ্যে এসে পড়েছি। ক্লান্তিতে সর্ব্ব দেহ ভ'রে গেছে! এইবার আমি প্রথম পিছনের দিকে চেয়ে দেখলাম।

এ কোথায় এলাম? যেদিকে চাই শুধু ধূ ধূ করছে! সাম্‌নে, পিছনে, ডাহিনে, বামে কেবলই শূন্য—কুজ্ঝটিকার ধূলায় আচ্ছন্ন! মরণ যেন সমস্ত প্রাণটুকু শুষে নেবার জন্যে তার সহস্র জিহ্বা পৃথিবীর বুকের উপর লেহন করছে!

এই কি আমার গানময়ী, প্রাণময়ী শ্যামলা ধরণী? আহা মা আমার, কোন্ নিষ্ঠুর দেবতার নির্ম্মম লীলায় আমার বুকের অফুরন্ত স্নেহ হাসি গান নিঃশেষ হয়ে গেছে!

দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা হয়ে আবার ছুটে চলেছি—চোখ বুজে কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য না রেখে। আগুনের হল্কার মত হাওয়ায় আমার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দুও যেন শুকিয়ে আস্‌ছে! প্রতি পদক্ষেপে আমার পা দুখানি প্রতিহত হ'চ্ছে। কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। আমার শ্রান্ত দেহ বার বার তপ্ত ধূলায় লুটিয়ে পড়ছে—আবার উঠছি, আবার পড়ছি। এই রকমে জানি না কতক্ষণ চলার পর আমার অবসন্ন দেহ মন এইখানে এসে লুটিয়ে পড়ল! কিন্তু এবার ওঠবার চেষ্টাও করতে পারলাম না।

কতক্ষণ এখানে পড়ে আছি জানি না যখন চোখ মেললাম, দেখি মেঘে আকাশ ভরে গেছে। অন্ধকারের কোলে সমস্ত পৃথিবী যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। চাঁদের আলো হাজার খণ্ডে ছিন্ন মেঘের পর্দ্দাখানি ঠেলে তাদের পালাবার পথ করে নিচ্ছে। আমার দক্ষিণ দিকের ঝোপের উপর জ্যোৎস্না সাদা চাদরের মত পড়ে রয়েছে। আর সব দিক তখনও অন্ধকারে ভরা। আমার মাথার উপর একটা কি গাছ আছে জানি না, বোধ হয় শিউলি হবে, তারই একটা দুটা ফুল আমার বুকে মুখে ঝরে পড়ছে।

আমার তন্দ্রার ঘোর ক্রমেই গাঢ় হয়ে আসছে আর কিছুই ঠিক করতে পারছি না, মনে আনতে পারছি না। সমস্তই কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে! কুয়াশায় যেন আমার সামনেকার সমস্ত জিনিষই ঢেকে ফেলছে। চোখের পাতা দুটী ধীরে ধীরে মুদে এল। ঝিল্লি ডাকার শব্দও যেন আর শুনতে পাচ্ছি না। একি মূর্চ্ছা? আমার দেহ হঠাৎ কেন জানি না কেঁপে উঠল। মনে হল, আমার শিরায় শিরায় তড়িৎ-প্রবাহ ছুটে গেল।

এ কি! কে যেন আমার মাথাটী অতি সন্তর্পণে দুই হাতে একটু একটু করে তুলে ধরছে! বেশ টের পাচ্ছি, আর আমার মাথাটি মাটির উপর নেই, একটা কোন্ উপাধানের উপর রক্ষিত হয়েছে! একবার নড়ে ওঠবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। আমার বুকের স্পন্দন ক্রমেই দ্রুত হচ্ছে। ইচ্ছা করছে চীৎকার করে উঠি, একবার চোখ মেলে দেখি—কিন্তু কি জানি কেমন ভয় করছে, পারছি না।

কার একখানি ফুলের মত কোমল হাত আমার বুকের উপর এসে পড়েছে! সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি হাত

আমার কপালের একদিক হ'তে আর একদিকে নেমে গেল। আমি চোখ মেললাম।

আমার বুক কেঁপে উঠল! আমি কার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছি। তার মুখের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। ঐ আকাশের মেঘের মতই নিবিড় কাল চুল-গুলি তার সমস্ত পিঠখানি ঢেকে রেখেছে। মৃদু বাতাসের আঘাতে তার দু' একটী চুল আমার মুখের উপর এসে পড়ছে। কি শান্ত চোখ দুটী! আমি চোখ চাইতেই তার মাথাটী আমার মুখের কাছে নেমে এল! তার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার মুখের উপর পড়ল।

কোথা হতে এত শক্তি পেলাম জানি না, আমি তার কাছ থেকে সরে গিয়ে মাটির উপর সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কতকগুলি অস্পষ্ট শব্দ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কি বললাম আমি নিজেই তা বুঝতে পার্‌লাম না। আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না—সমস্ত দেহ অবশ হয়ে আস্‌ছে। আমার মনে হচ্ছে, এইবার বুঝি মাটির উপর আছড়ে পড়ব। আমি চোখ বুজলাম।

লতার মত দুটী হাত দিয়ে কে আবার আমাকে তার বুকের উপর টেনে নিলে! আমার মাথাটী তার কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ল। আমার বিস্ময়ের বেগ কিছু কম্‌লে, আমি তার মুখের দিকে চাইলাম, সে তখনও আমার দিকে তেমনি করে তাকিয়ে ছিল। ভাষা দিয়ে ত সে চাহনি বর্ণনা কর্‌তে পারব না! শুধু এইটুকু বলতে পারি—কি সুন্দর তার চোখ!

আমি অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে আছি! দেখছি তার গোলাপের পাপড়ির মত পাৎলা ঠোঁটের উপর বেদনা অভিমান লজ্জার ছায়াগুলি একে একে ফুটে উঠছে! পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—কে তুমি গো?

সে তাড়াতাড়ি বাঁ হাতখানি দিয়ে আমার গলাটী জড়িয়ে তার ডান হাতখানি আমার মুখের উপর চেপে ধরল। তার পর আমার মাথাটা ধীরে ধীরে আবার তার কাঁধের উপর টেনে নিল।

আমার জ্বরতপ্তকপাল তার গলাটী ছুঁয়ে আছে। আমার হাত দুটী কখন্ তাকে ঘিরে ধরেছিল তা বুঝতে পারি নি। মানুষ ডুবে যাবার সময় যেমন তার হাতের কাছে যা কিছু পায় তাই আঁকড়ে ধরে, সেই রকম করে আমিও তাকে ধরেছিলাম। আমার সমস্ত দেহ তখন থর থর ক'রে কেঁপে উঠছিল।

প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সংযত করে তাকে বললাম, ওগো দয়া কর,—কথা বল। বল তুমি কে?

তার শান্ত চোখ দুটী ধীরে ধীরে মুদে এল। একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস মনের আবেগ চেপে অতি সন্তর্পণে তার বুক হতে বেরিয়ে গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ। অন্ধকারে সমস্ত জ্যোৎস্না পৃথিবীর বুক হতে মুছে গেছে। দু' একটী ঝিল্লি আবার ডেকে উঠছে। সে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, আমি স্বপ্ন।

মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা দমকা হাওয়া ফোটা-মালতীর গন্ধ নিয়ে আমাদের আকুল করে বয়ে গেল। আমি আপন মনে বলে উঠলাম, স্বপ্ন! তুমি স্বপ্ন!

সে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। আমার মুখের উপর ছোট দুটি ফুলের মত কি পড়ল! আমি তার চোখের দিকে চাইতেই সে মাথাটী সরিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে চাইল। তার চোখ দুটী জলে ভরে গেছে!

চাঁপা ফুলের কলির মত আঙ্গুল দিয়ে আমার ডানহাত-খানি সে আবেগের সঙ্গে চেপে ধরল। আমি তাকে বললাম, ওগো নারী, কি চাও তুমি?

সে তার মাথাটী আমার বুকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বিশ্রাম, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বন্ধু।

হায় গো, তুমিও শ্রান্ত! আমি মনে করেছিলাম—জগতের সমস্ত ক্লান্তি বুঝি আমারই দেহে আশ্রয় নিয়েছে। হায় স্বপ্ন, আমার এ দগ্ধ বুকে তোমার কোথায় স্থান হবে! সমস্ত রস যে শুখিয়ে গেছে, প্রাণ যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সে তার মাথাটী আমার বুকের উপর রাখল। তার বুকের স্পন্দন আমার বুকের স্পন্দনের সঙ্গে মিলে গিয়ে

সমানতালে উঠছে পড়ছে! তার এলো চুলের সুবাসে আমার সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবছি ভগবান, আমার এ স্বপ্নের ঘোর যেন না কাটে। ওগো নিষ্ঠুর, আমার ত সব নিয়েছ; শুধু এই স্বপ্নটুকু আমার থাক্ একান্ত আমারই, আর কিছু চাই না।

সে আমাকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে বলল, কি ভাবছ?

আমি বললাম, স্বপ্ন, তুমিও কি মরীচিকার পিছনে আমারই মত সারাদিন ছুটেছিলে?

সে বলল, আমি তোমারই সঙ্গে চলে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি প্রিয়তম, মরীচিকার পিছনে ছুটে নয়।

তার এই অভিমানের করুণ সুরটী আমাকে পাগল করে দিল।

তার মাথার উপর আমার ডান হাতখানি রেখে তাকে বললাম, স্বপ্ন তুমি কি সমস্তক্ষণই আমার কাছে ছিলে? কৈ আমি ত তোমায় দেখি নি!

সে বলল, তুমি ছিলে আপনার সুখের নেশায় মেতে। সে ঘোর কাটাবার ক্ষমতা ত আমার ছিল না, তাই যতক্ষণ তুমি নিজে না জাগ ততক্ষণ তোমার জন্ত অপেক্ষা করছিলাম।

আমি তার মাথাটী আমার তপ্তবুকে চেপে ধরলাম।

পশ্চিম আকাশে তখনও চাঁদের বাঁকা রেখাটী মিলিয়ে যায় নি। প্রভাতের সোনালী আভা অল্পে অল্পে নীল আকাশের গায়ে ফুটে উঠছে। আমার তন্দ্রার ঘোর তখনও কাটে নি। শুনতে পেলাম কে গান গাইছে—

—রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে—
তোমায় আমায় দেখা হল
সেই মোহানার ধারে।
সেই খানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেছে আঁধার আলোয়
সেই খানেতে ঢেউ ছুটেছে
এ-পারে ঐ-পারে।"

এবার আমি সম্পূর্ণ জেগে উঠলাম। হঠাৎ আমার রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল—কৈ কেহ ত নাই! আমার হাত দুটী আমার বুকের উপর শক্ত করে জোড়া ছিল। আমার বেশ মনে হচ্ছে, এমনি করে তার মাথাটী আমার বুকের উপর চেপে ধরেছিলাম; এখনও যেন তার স্পর্শ আমার দেহে অনুভব করছি!

সেই অপরিচিত গলার মধুর সঙ্গীত তখনও আমার কানে ভেসে আসছিল—

"নিতল নীল নীরব মাঝে
বাজ্‌ল গভীর বাণী
নিকষেতে উঠ্‌ল ফুটে
সোনার রেখাখানি;
মুখের পানে তাকাতে যাই
দেখি দেখি দেখ্‌তে না পাই
স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা
কাঁদি আকুল ধারে।

আমি আকুল হয়ে ডেকে উঠলাম, স্বপ্ন স্বপ্ন!

কেহ সাড়া দিল না। ভোরের পাখী আমার চারিদিকে ঝোপের মধ্যে গান গেয়ে উঠছে। পাতার আড়াল ঠেলে সূর্য্যের রশ্মি আমার মুখের উপর এসে পড়ল। আমি উঠে দাঁড়ালাম! কতকগুলি ঝরা শিউলি ফুল আমার বুক হতে মাটির উপর ছড়িয়ে পড়ল!

জুলাই, ১৯১৫

জীবনের জয়-যাত্রা

শ্রীকালিকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

ওরে কবি
আজো কি কথার মাঝে আপনারে বন্ধ ক'রে র'বি !
দু'টি আঁখি বুঁজে
মিল খুঁজে খুঁজে
জীবনের দেবতারে আপনি করিবি অপমান।
কোথা তোর প্রাণ ?
কই, সে ত দেয় নি ক' সাড়া,
বৈশাখী ঝড়ের রাতে কে রেখেছে এমন পাহারা
জীবনের চারিধার ঘিরে ?
চেয়ে দেখ্ ফিরে,
দিগন্তের কোলে কোলে কোন্ বাঁশী বেজে ওঠে আজি !
ঢেউ ঝড় তুচ্ছ করি তরী হোথা খুলে দেয় মাঝি
ছুটে যায় প্রাণের আবেগে ;
দেখ্ জেগে
শুধু ও-কথার মাঝে কোনো সুর নাই।
ব্যর্থহবে পথ চাওয়া, পথ মাঝে ছুটে আয় তাই।
সবাই এসেছে ছুটি
বাধা টুটি
বিঘ্ন দলি' পায়ে
তাদের বুকের ঝড়ে দিগন্ত কাঁপায়ে।
ও হৃদয় আজ যাক্ খুলে,
যদি পথ ভু'লে
এক দিনও এসে থাকে দক্ষিণা বাতাস,
কোথা-হ'তে ছুটে আসা বসন্তের উদ্দাম উচ্ছ্বাস ;—
তারি সাথে তাল রেখে রেখে
কে কোথা ঘুমায়ে রয় তাদের সবারে ডেকে ডেকে
দোলা দাও,
সাথে লে নতুাও।

শ্রান্তি মানিব না,
জানিব না
ব্যথা-শোক হতাদর অপমান কিছু,
যাব না কাহারও পিছু পিছু।
মোদের এ অভিযানে সবাই আগায়ে ছুটে যায়
রুদ্রের তাণ্ডব নাচ ফুটে ওঠে আমাদের পায় ;
এ জীবন
ভুলে গেছে হাসি গান কুঞ্জবনে মধু গুঞ্জরণ,
মনে নাই কবে কোথা বেজে-ওঠা সেতার গুঞ্জনে
কোন্ ক্ষণে
অজানা প্রিয়ার শুনি নূপুর শিঞ্জিনী
আজ তারে জিনি
বুকে বুকে জেগে ওঠে রুদ্র বৈশাখীর সর্ব্বনাশা ঝড়।
সবার অন্তর
নেচে ওঠে তাণ্ডব নর্ত্তনে ;
মনে মনে
লেগেছে আগুন
আজিকে হৃদয়-বনে উন্মাদ ফাগুন
কিছু না মানিতে চায়
সবুজের রথের চাকায়
পাকে পাকে ফুটে উঠে জয়।
কারে ভয় ?
রুদ্ধ দ্বার বাধা দেয় কাকে ?
ক্লান্তি কারে পিছে টেনে রাখে ?
বিঘ্নবাধা ভয় করে কে সে ?
জীবনের দেশে
কে আছ আপনা ভুলি ভেঙে ফেল দ্বার
পান কর অমৃত আসার,

প্রলয় ঝড়ের সাথে ছুটে ছুটে এস হেথা চ'লে
বাধা বিঘ্ন দুই পায়ে দ'লে।
দাও দোল্ দাও দোল্,
আজি উতরোল
ঝঞ্ঝার রথেতে চড়ি ছুটে যেতে চাই।
বাধা যেথা নাই—
সীমানা যেথায় হারা সেই চির অসীমের মাঝে
লাজ দিয়ে লাজে
শৃঙ্খলিত চরণেরে মুক্ত ক'রি ল'য়ে
চূর্ণ করি বন্ধন বলয়ে

যেতে হবে অসীমের পথে ; চল্ ওরে চল্
টুটায়ে আগল
শঙ্কাহীন অট্টরোলে দিগন্ত কাঁপায়ে
মহাজীবনের স্রোতে পড়িব ঝাঁপায়ে।
দোলা দাও, দাও দাও দোলা
মোরা পথ ভোলা
শুধু ছুটে ছুটে যাই অপথেরে গড়ে তুলি পথ,
দুর্গম মরুর বক্ষে হাস্য মুখে ছুটায়ে দি' রথ।

ছিন্নমুকুল

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

ভাড়াটে বাড়ী! মালিক একটি স্ত্রীলোক। বয়স অল্প, দেখিতে মন্দ নয় কিন্তু বিধবা। পাড়ার লোক বলে, উঃ কি অহঙ্কার- একে পয়সা, তায় রূপ। মাটিতে পা পড়ে না। হাজার হোক মেয়েমানুষ ত—

আমরাও মাঝে মাঝে তা' টের পাই। নীচের তলায় থাকি। কলের জল লইয়া বচসা হয়। ছাদে কাপড় শুকানো লইয়া একদিন কলহও হইয়া গিয়াছে।

দিদি বলে, পুরোণো ভাড়াটে বলে তোমাদের জোর ত কিছুই নেই। উঠিয়েও দিতে পারি। নয় একদিন মনটা হু হু করবে—আর কি!

আমি বলি, বিশুর জন্যে কাঁদবে না দিদি?

বিশু আমার দাদার ছেলে।

দিদি চলিয়া যাইতে যাইতে বলে, করলেই বা। সামলাতে কতক্ষণ। নিজের সন্তানই যখন নেই তখন এত কিসের মায়া?

হাসিয়া বলি, সত্য?

দিদিও হাসিয়া বলে, সত্যি নয় কি মিছে? তবে যদি মানুষ কর্ত্তে না পার ত বিশুকে না হয় দিয়েই যেও। তা মা বাপ হয়ে কি সে কাজ পারা যায়—বলিয়া দিদি বিশুকে কোলে লইয়া দুম দুম করিয়া চলিয়া যায়।

বড় বউ রাগিয়া বলে, ঠাকুর-পো?

কি—

এসব আমার ভাল লাগে না। দিন নেই রাত নেই—ছেলে কাঁধে করেই হল? 'না বিইয়ে কানায়ের মা' আর কি! বাঁজার কোলে ছেলে দেয়া পাঁজি পুঁথিতে নিষেধ আছে—তা জান? ছেলের বয়েস চার বছর—তা তিন বছর ত ওর কোলেই মানুষ হল।

বলিলাম, বড় অন্যায়।

বৌ-দি রাগিয়া আগুন হইয়া বলে, তোমাদের কেবল তামাসা। মিষ্টি মুখে বল্লেন অন্যায়! বলে, 'যার ধন তার নয়'—আমার যেমন পোড়া কপাল।

দিদি উপর হতে শুনিতে পায়। দেখি খানিক বাদে

আমারই সুমুখে বিশুকে বসাইয়া দেয়। সে জানে, আমি কিছু বলিবই—তাই এ কাজ। আমিও বলিলাম, সখ মিট্‌ল দিদি?

দিদি একটু হাসিয়া বলে, কি করব ভাই—'যার ধন তার ধন নয়'—

আমি স্পষ্ট দেখি, দিদির মুখে মোটেই সেটুকু হাসি নয়।

দিদি আর কিছু বলে না। লুকাইয়া চলিয়া যায়। আবার ঘুরিয়া আসে। বলে, আচ্ছা, বিশু যে আমার ছেলে নয় তার প্রমাণ? কিন্তু পরক্ষণেই জিব কাটে, মুখ লাল করিয়া থামিয়া যায়। একটু পরে সরিয়া আসিয়া বলে, উনি গেছেন আজ পাঁচ বছর হল ভাই। আমার বয়েস তখন ঠিক উনিশ বছর। সেই বছরেই ত তোমরা এ বাড়ী এলে।

সেদিন কি একটা কথা লইয়া বৌ-দি'র সঙ্গে দিদির খুব খানিকটা কলহ হইয়া গেল। কিন্তু সেদিন বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, পরাজয়ের ভারটা দিদি নিজের ঘাড়েই লইয়া চলিয়া গেল এবং সে যে কাঁদিয়াও ফেলিয়াছিল তাহাও পরে চুপি চুপি বৌ-দি আমায় বলিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে বিশুর যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল।

উপরে যাওয়া-আসার একটি মাত্র দরজা—সেটি বৌ-দি সেদিন তালা আঁটিয়া দিল। কেবল সদর দরজা খোলা—সেখানে দিদিও আসিবেন না, বিশুও যাইবার পক্ষে নিতান্ত ছেলেমানুষ।

বৌ-দি বলে, এই শাস্তি দিলে ঠিক জব্দ হবে।

আমি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, গেলই বা বৌ-দি। কোলে নিলে ত আর বিশুর গায়ে ফোস্কা পড়চে না। ছেলেপুলে নেই বলেই ওর মায়া পড়েছে।

বৌ-দি গম্ভীর ভাবে বলিল, এসব কথা তোমার কানে ওঠবার দরকার দেখি নে ঠাকুর-পো। বাড়ী ভাড়াই দিচ্ছি, ছেলেকে ত ভাড়া নিই নি। তবে তোমার সঙ্গে যে দিদির খুব ভাব এটা খুবই বুঝতে পাচ্ছি, যার জন্যে ভাজও পর হয়ে যায়—বলিয়া একটু স্নেহের হাসি হাসিয়া সে পুনরায় বলিল, ভাগ্যিস দিদিটি পেয়েছিলে, তাই ত তোমার দিন কাটছে, এত আলাপ তবু ভাল।

চুপ করিয়া রহিলাম।

বিশু কাঁদে, পিসী মা'র কাছে যাব—

বৌ-দি বলে, ও কথা বলতে নেই, মার খাবি।

দু'একদিন বিশু দরজা ঠেলিয়া দেখিল, দরজা আর খোলে না। সদর দরজায় বাহির হইল না পাছে জুজু আসিয়া ধরে।

দুপুর বেলা ঘরেই ছিলাম। ও-ধারে বৌ-দি বোধহয় দিবা নিদ্রায় মগ্ন। বিশু ছুটাছুটি করিতে করিতে চমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যাব না—জুজু আছে—মা বকবে—

আড়াল হইতে দেখিলাম, দিদি তাহাকে হাত বাড়াইয়া ডাকিতেছে। আজ কয়দিন বাদে তাঁহাকে দেখিলাম। মনে হইল তাহার সে পরিষ্কার মুখখানির উপর কে কালি লেপিয়া দিয়াছে, চুলগুলি আলুথালু, চোখ দুইটি লাল, স্পষ্ট দেখিলাম, চোখের জল গালের উপর গড়াইয়া আসিয়াছে। বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। ওই অশ্রুর সহিত যেন মনে মনে আমারও আত্মীয়তা আছে।

বাহিরে আসিয়া বলিলাম, দিদির অসুখ বুঝি?

দিদি দ্রুতপদে সরিয়া গেল। একটু পরে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, দোষ করলে কি মাপ নেই ভাই?

বলিলাম, আমিও জানি তুমিও জান দিদি—দোষ তোমার নেই, তবে মাপ চেয়ে কেন লজ্জা দাও?

দিদি এ কথা বোধ হয় শুনিল না, বিশুর দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আমি পুনরায় বলিলাম, তোমায় চেহারা কি হয়ে গেছে দিদি, আজ রান্না নেই?

দিদি একটু হাসিল, তার পর বাঁ হাতের চেটোর উপর আঙুল দিয়া লিখিয়া দেখাইল—একাদশী।

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, যা না বিশে, তোর পিসি-মা ডাকচে যে—

বিশু আমায় ভয় করিত। বলিল, কোথা দিয়ে যাব?

বৌ-দি দ্রুতপদে বাহির হইয়া বলিল, লোভ সকলকারই আছে, মুখ দিয়ে লাল পড়ে কেন? চল্ বিশে, ঘুমুবি— বলিয়া সে বিশুকে টানিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

লজ্জায় ক্ষোভে মরিয়া গেলাম। দেখি, দিদি তার আগেই চলিয়া গিয়াছে।

বর্ষাটা সেদিন বড় জোরেই চাপিয়া আসিয়াছিল। মনে হইল, এ প্লাবনের বুঝি আর বিরাম নাই। সংসারে সমস্ত দুঃখের মলিনতা কি এর স্রোতে ধুইয়া যায় না?

শহরতলীর এক পাশ। সুমুখের পড়ো মাঠের ধার দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ। হাঁটু অবধি কাদা। লোকালয় কম- মাঝে মাঝে এক আধটা বস্তি। এ মাঠে নাকি আগে কোন্ বড় লোকের বাড়ী ছিল। তার চিহ্নস্বরূপ দু'একটা পাঁচিলের ভগ্নাংশ আজও কাৎ হইয়া আছে, তাহারই ধারে একটা জীর্ণ অশ্বত্থ গাছের শাখায় শাখায় বাদলার বাতাস ব্যথার ভার লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

আপন মনে বাড়ী ঢুকিতেছিলাম। উপর দিকে নজর পড়িতেই দেখি ছোট জানালাটির ধারে দিদি বসিয়া আছে। হঠাৎ কি জানি পা চলিল না—ছাতাটি তুলিয়া উপর দিকে চাহিলাম। দিদি দেখিতে পায় নাই। লক্ষ্য করিলাম, কাঁদিতেছে। সহসা একটি বস্তু আজ কি জানি কেন, হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আজ সংসারে ইহার কি কেহ নাই? জনহীন শূন্য পুরীর পাথরখানা এই যে ইহার তরুণ ব্যর্থ বুক-টার উপর কতদিন হইতে চাপিয়া আছে, ইহার কি প্রতীকার নাই? রূপ ও ঐশ্বর্য্যের আবরণের তলায় শরাহতা কপোতীর মত ভূলুণ্ঠিত হইয়া এই যে নারীটি ছটফট করিতেছে, এর কারণ কি?—অথচ আমার এ অসংবদ্ধ অনভিজ্ঞ প্রশ্নের উত্তর আমি সেদিন কোনও মতেই পাই নাই।

চলিয়া আসিতেছিলাম। দিদি বলিল, হাসিয়াই বলিল, মাথা খারাপ হয়েছে বুঝি! জলে ভিজ্‌ছ কেন? ভেতরে এসো।

লজ্জিত হইয়া কি করিব ভাবিতেছি। দিদি আবার অনুযোগ করিয়া বলিল, দিদির ঘরে পায়ের ধুলো পড়তে নেই বুঝি? খুব বিদ্বে হয়েছে যা হ'ক—

আজ আমার হাসিতে ইচ্ছা হইল না। বলিলাম, তোমারও ত খুব বিদ্বে, ছোট ভায়ের পায়ের ধুলো চাও?

ভিতরে আসিয়া দিদির উপরের দালানে বসিলাম। ভয় করিতেছিল পাছে বৌ-দি জানিতে পারে কিন্তু বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে কিছুই শুনিবার উপায় ছিল না।

বলিলাম, জানালার ধারে বসেছিলে যে?

একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিদি বলিল, যে বাদল, কিছু ভাল লাগে না।

চুপ করিয়া রহিলাম। এতদিন বাদে আজও সেই বর্ষার স্বল্প অন্ধকারে দিদির করুণ সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে। ভাবি সেদিনকার সে মুখে কোন্ ভাবের ছায়াপাত দেখিয়া-ছিলাম। তখন বাহিরের দৃষ্টিই খোলা ছিল, ভিতরে তলাই-বার বয়স হয় নাই। কিন্তু আজ জ্ঞান হইয়াও ত সে মুখ-খানির নিকট আমি তেমনি অজ্ঞান। তা সে যাই হোক, দিদি একটু থামিয়া বলিল, তোমার বৌ দি ত আজ আমায় যাচ্ছেতাই করলেন—

মনে মনে লজ্জিত হইয়া বলিলাম, ও কথা আর নাই তুললে দিদি।

—তোমার শোনা দরকার ভাই, শোন। বলিয়া দিদি যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই, বিশু তাঁহার কাছে আসিবার জন্য কান্না লইয়াছিল কিন্তু তাহার মা আসিতে দেয় নাই। অবশেষে বিশু জুজুর ভয়কে তুচ্ছ করিয়া সদর দরজায় আসিতেই তিনি কোলে করিয়া উপরে আনিয়াছিলেন। কিন্তু এমনিই দুর্ভাগ্য, বিশু তাঁহার তরকারীর বটিতে হাতের আঙ্গুল কাটিয়া রক্তারক্তি করিয়াছে। শেষে দিদি সজল চোখে বলিল, আর শুনে কাজ নেই ভাই—বিধবাদের কানে সে কথা গেলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়—

মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। জানালার বাহিরে সুমুখের মাঠে বৃষ্টির অবিরাম ঝর ঝর শব্দ শুনা যাইতেছিল। সেও যেন বিধবার মর্ম্ম ভাঙ্গা অশ্রুজল।

দিদিকে সত্যই আমি ভাল বাসিয়াছিলাম এবং সেদিন হঠাৎ তাহার গলা জড়াইয়া হাত ধরিয়া যাহা বলিয়া ছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে করিতে পারি। পাগলের মত

বলিলাম, দিদি কেঁদো না। তুমি মার ধর আমি সহ্য করব কিন্তু তুমি কেঁদো না—ও আমি দেখতে পারি না—দিদির নিপীড়িত হৃদয় বুঝি আমার কাছে এইটুকুই প্রত্যাশা করিয়াছিল। আমার বুকে মুখ লুকাইয়া দিদি কেবল এই টুকুই বলিল, আমরা কেন এক মায়ের সন্তান হই নি, ভাই?

আমি আবেগের সহিত বলিলাম, সেইটিই ধরে নাও না দিদি?

আমারও চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

দিদি চোখ মুছিয়া বলিল, ভাই, তোকে পেয়ে আমার একদিক যেমন ভরে উঠল, তেমনি আর এক দিক যে ভয়ানক ফাঁকা—সে ফাঁকার দিকে চাইতেও যেন ভয় করে ভাই?

চুপ করিয়া রহিলাম। দিদি আবার বলিল, গান জানিস রে? এমন অসময় গান নহলে কিছু ভাল লাগে না—না থাক্। বলিয়া দিদি উঠিয়া গেল এবং একটু পরেই নানারকমের খাবার আনিয়া হাসিমুখে বলিল, গানের চেয়ে আমার এই ভাই-ফোঁটাই ভাল।

কিন্তু পূর্ব্বদিনের ঘটনার জের টানিয়া বৌ-দি আবার যখন পরদিন কলহের সূত্রপাত করিল, তখন আর দিদি সহ্য করিল না। সেও ত মানুষ। বলিল, বড়বউ ভাই, কাল তোমার পায়ে ধরে মাপ চেয়েছি কিন্তু তাতেও যখন শুনলে না তখন আমি নিজেকে আর বেশী সস্তা করব না। আজ থেকে তিন দিনের সময় দিচ্ছি তোমরা বাড়ী দেখে উঠে যাও। সত্যি টাকা দিয়ে তোমরা আমার অসদ্ব্যবহারই বা সহ্য করবে কেন?

বৌ দি বলিল, সে কথা না বললেও চলত। তত কাঁচা মেয়ে আমি নই। কালই আমি দাদাকে দিয়ে বাড়ী ঠিক করিয়েছি।

আড়াল হইতে দেখিলাম, দিদির মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। সে আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু আমার এ কি হইল! আমি সারাদিন কোথাও শান্তি পাইলাম না। একদিন চলিয়া যাইব জানিতাম কিন্তু সে কবে তাহার কোনও স্থিরতাই যে ছিল না। আজ যাওয়ার কথাটা এমন নির্দ্দয় সত্য হইয়া দেখা দিবে তাহা বিশ্বাসই করিতে পারিলাম না। দিদিই বা কি! সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি ছল করিয়া তাহার দোরে আনাগোনা করিলাম, কতবার তাহার জানালার দিকে উঁকি মারিলাম, নানারূপ শব্দ করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে এমনি নিষ্ঠুর যে, একবার দেখাটা পর্য্যন্ত দিল না। অথচ আমি কেমন করিয়া যেন জানিতেছিলাম, দিদি দেখিয়াও দেখিল না। সেদিনকার সে অভিমানটি আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।

সকাল বেলা দাদা বলিল, তৈরী হয়ে নে—যেতে হবে আজ।

বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, বলিলাম, আর দু'দিন থাকলে হয় না?

—গাধা কোথাকার! দু'দিন বাদেও ত যেতে হবে। বলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দাদা বলিলেন, মেয়েমানুষ কর্ত্তা সাজলে এমনি টানা হেঁচড়াই কর্ত্তে হয়।

নূতন বাড়ীতে জিনিষপত্র চালান হইয়া গেল। দাদা আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন।

বৌ-দি'র দাদা গাড়ী লইয়া হাজির। ছেলেকে লইয়া বৌ-দি গাড়ীতে উঠিল।

আমিও যাইতেছিলাম, শব্দ আসিল শোন্।

ফিরিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সে দিদি আর নাই, চেনা দায়। একদিনেই বদলাইয়া গিয়াছে। আমায় ভাবিবার সময় না দিয়া দিদি কাঙালিনীর মত বলিয়া উঠিল, একবার বিশেকে দে-না ভাই, একবার—

অনেক অনুনয় করিয়া বৌ-দি'র নিকট হইতে বিশেকে আনিয়া দিলাম। বৌদি বলিল, যদি এত ভালবাসাবাসি, বিশের নামে বাড়ীখানা লিখে দিক্ না—এ নির্লজ্জ উক্তির পর আমার আর কথা বাহির হইল না।

কিন্তু তারপরের সে অদৃশ্য আমি আর ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না। বিশেকে কোলে পাইয়াও দিদির চোখে অশ্রু নাই—যেন শুষ্ক হইয়া গেছে। কিন্তু বিশু! ওই অতটুকু বালক—ও এত অশ্রু পাইল কোথায়? কে এমন করিয়া উহাকে সঙ্গোপনে অশ্রুর বাঁধ বাঁধিতে শিখাইয়াছিল?

দিদি বলিল, আমি যেতে দেবো না—গাড়ী ফিরিয়ে দাও।

আমি চেষ্টা করিয়া হাসিলাম। দিদি পুনরায় বলিল, হয় না? খুব হয়—ইচ্ছে থাকলেই হয়। বলিয়া গাড়ীর কাছে গিয়া বলিল, বড়বউ, ভাই, রাগ ক'র না—ফিরে এস!

বড়বউ বলিল, কেন দেরী করিয়ে দিচ্ছ ভাই? যাবার সময় আর কষ্ট দিও না।

দিদি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, ভাই, না হয় আজ থেকে লিখে পড়ে দিচ্ছি—তোমাদের কাছে আর ভাড়া নেবো না।

এইবার বড়বউ রাগিয়া বলিল, আমরা ত কাঙালী নই যে, অমনি থাকব? কিন্তু আর তোমার আদিখ্যেতা ভাল লাগচে না ভাই,—ঢের হয়েছে—ছেলেটাকে এখন ভালয় ভালয় ফিরিয়ে দাও। বলিয়া হাত বাড়াইয়া বিশুকে টানিয়া লইল।

ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন দিদির বাড়ী গেলাম। আমায় দেখিয়া বলিল, চিঠি পেয়েছিলে?

ঘাড় নাড়িলাম।

দিদি পুনরায় বলিল, তোমায় দরকার আছে—আমার শেষের কাজটি করে দাও। নৈলে কে আর আছে?

—কি বল না দিদি?

দিদি বলিল, বৈদ্যনাথে যাব। আমার জ্যেঠি-মা সেখানে আছেন, তিনি মায়েরও বাড়া। অনেক করে আসতে লিখে-ছিলেন, যাওয়া ঘটে নি, এইবার গিয়ে বাস করব। রেখে আসতে পারবে? বলিয়া আমার কাঁধে হাত রাখিল।

হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, খু—ব পারব, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের কথাতে ভয় পাইয়া বলিলাম, দেশ ছেড়ে যাবে দিদি? দেখা হবে না যে!

দিদি চোখের জল গোপন করিয়া বলিল, দেখা না পেলেও যে বাঁচতে হয় ভাই!

চলার ভাষা

মোসাম্মৎ সফিয়া খাতুন

এ আকাশ ভরে নাই অনন্ত ব্যথায়,
ক্ষতাক্ত অন্তর তার নীলিম পাণ্ডুর
নহে কভু নহে উহা ক্লান্তি-ভারাতুর;
ধরিয়া রেখেছে সে যে ব্যর্থ শূন্যতায়
জীবনের যাত্রাগুলি, বিচিত্র প্রবাহে
লক্ষ্যহারা নীড় ছাড়া—দুরন্ত আগ্রহে,
যারা সবে চলে গেছে নিরুদ্দেশ অজানার মৌন ইসারায়।:
শুধু আশা অশেষের বিফলতা করি অস্বীকার
দীপ জ্বালি চলিয়াছে শত শত মত্ত বাসনার,
পশ্চাতের ব্যর্থতার আর্ত্ত কলরব
ওর কাছে হ'য়ে আসে মূক-কণ্ঠ শব।
পশ্চাতের সকল সম্বন্ধ
মুহূর্ত্তে শিথিল ছিন্ন নীরব নিস্পন্দ!

দূরে-দূরে-জ্বলে-ওঠা নক্ষত্র-নিকর
স্মৃতি-বহ্নি-চিহ্ন শুধু জ্বালাইয়া রাখে,
জ্বালাইয়া রাখে, কোথা কর্ত্তব্যের ডাকে
ছুটে গেছে বন্ধহারা রুদ্র ভয়ঙ্কর,
কভু বা দেয় নি সাড়া অলস বিমুখ
পড়ে ছিল নির্ব্বিবাদে খুঁজেছিল সীমাবদ্ধ সুখ,
মুহূর্ত্তের এতটুকু ক্ষুদ্র অবসর।
ত্রুটি-বিচ্যুতির শত দীর্ঘ ইতিহাস
দলি' চলে সে যে তারে করি পরিহাস।
এ আস্পর্দ্ধা মিথ্যা যে রে—ক্ষত ক্ষুদ্র হিয়া
নিজেরে করেছে শুদ্ধ এ গরল পিয়া।
অসংযত রথ তার চালি'
ছুটিয়াছে লক্ষ্যহারা দুরন্ত খেয়ালী!

শুনিয়াছে জীবনের প্রচ্ছন্ন বারতা,
পতনের গ্লানিমার ওই ক্ষুদ্র দান
নূতন গড়িছে আজি জীবন মহান্।
মহান সৌন্দর্য্য রচে চূর্ণি সে ব্যর্থতা,

মুক্তি দিছে তিমিরেরে আলোক-পাথারে
কৃষ্ণসৌধ চূর্ণ হয় প্রভার প্রাকারে।
সৃষ্টি শোভা বার্ত্তা বাহি এ যে তার চলা—
ব্যর্থ বোঝা নহে আর দু'লে চলে জীবন-হিন্দোলা!

———

পটলডাঙার পাঁচালী

শ্রীযুবনাশ্ব

কুঠে বুড়ী
নফর
ফক্‌রে
সদি
গুব্‌রে
ফুলো
খেঁদী পিসী

[খেঁদী পিসীর পটলডাঙার আ'স্তানা। মোড়লনী ছা... ...া আর সবাই এক ঘরের বাসিন্দা।

পটলডাঙার ভিখিরী পাড়া। পাঁচ্ পেচে ... পাঁকের ভেতর ছোট ছোট ভাঙা কুঁড়ে, সার সার গায়ে গায়ে লাগান ...

রাত দুপুর। সোজা হয়ে দাঁড়ালে ... মাথায় ঠেকে এমনি একটা হোগ্‌লার কুঁড়ের অন্দর। এক কোণে ... দেয়ালের গায়ে বছর দুয়েক পুরোণো একটা ছেঁড়া ক্যালেণ্ডারের ছবি গোঁজা। দেয়ালে এখানে সেখানে বড়ী টাঙানো, তাতে ছেঁড়া কাঁথা, নোংরা ঝুলি, এই সব। জানালা একটাও নেই ... দোরে ক...াপ-টানা। দোর-পোড়ার একটা কেরাসিনের ডিবে থেকে মিট্‌মিটে আলো, ও অনর্গল ধোঁয়া বেরোচ্চে। ধোঁয়ার গন্ধ, বাইরের পচা কাদা ... নোংরা আস্তাকুঁড়ের গন্ধ ;—ঘরের পেছনে দিন দুই হ'ল একটা কুকু...র পচে আছে, তারই গন্ধ, আর কুঠে বুড়ির প'চিত ঘায়ের গন্ধ এ...থে ঘরটাকে ভরে রেখেচে।

স্যাঁৎসেতে মাটির মেজের ...র, ছেঁড়া মাদুর, খবরের কাগজ, তালি দেয়া কাঁথা,—যার যেমন জুটেচে, পেতে, ফক্‌রে ও সদি ছাড়া ঘরের আর বাসিন্দা কটি সার সার ...পড়ে আছে ... বেঁকে

দেয়ালের ধারে দুয়ে... ...কসে ঘুমুচ্চে, তার পাশেই কুঠে বুড়ি। ঘায়ের যন্ত্রণায় মাঝে ... মাঝে সে উস্‌খুস্ করচে। তার পাশে খানিকটা জায়গা খালি। ... সেটা সদির গের্দ্দি। তার এ-ধারে কাণা গুব্‌রে কাণা চোখটা মে... ...নাক ডাকাচ্চে। মাঝে বাকি জায়গ টুকু খালি। এধারের বেড়ার ...গায়ে খালি ভুঁয়ে উপুড় হয়ে পড়ে নফর, কি একটা কুৎসিত রোগের যন্ত্রণায় কাৎরাচ্চে।

ঝাঁপ ঠেলে সদি ঘরে ঢুক্‌ল। তার বাঁ দিকের গালের মাংস নেই—দু'পাটী দাঁত দেখা যাচ্চে। ঢিবি কপালের ওপর উস্কখুস্ক চুলগুলি বিঁড়ে করে বাঁধা। পরণের ছেঁড়া কানিটা একধারে অনেকটা উঠে গেচে, আর একধারে হাঁটু পর্য্যন্ত নাবেনি। গায়ের শতছিন্ন আঁচলটা না থাকারই মতো।

তার মুখে কোনো ভাবের ছাপ পড়ে না, কিন্তু চোখের কোলে তখনো জলের ছাপ শুকোয় নি।

ঝাঁপ ঠেলার শব্দে কুঠে বুড়ি চোখ মেল্‌লে।]

কু। মর্ মর্!—মাগো?

[ফুলো টা পাশ ফির্‌ল। একটা ধনুক যেন বাঁ-কাৎ থেকে ডান কাতে ঘুরে এল]

কু। উহুঃ!.. উঃ উঃ...

ফু। (গলা তুলে) লাগ্‌ল?

কু। (যে হাতটা তখনও খসে পড়ে নি, সেইটে দিয়ে ফুলোর মুখে এক থাব্‌ড়া কসে)...মর্...মর্! যমও তোকে ভুলে আছে......

সদি। আহা বকিস্ কেনে? ওকি আর জেনে গুঁতো দিয়েচে তোকে?

কু। রূপুসি! কেলি শেষ করে দুপুর রাতে কোঁদল করতে এলেন। বলি রূপ দেকে ক'জনার মন মজ্‌ল লো, ক'জনার ট্যাঁকে হাত বুলোলি?

স। মর্ মাগি! ভালো কতা বলনু ত খেঁকিয়ে এল দ্যাক্!

…শয় খেয়ে বুলো বুড়িকে আঘাত করবার জন্যে হাত ছুড়তে লাগল। …শয়ে পৌঁছাতে হলে যে রকমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকা …া. তাই তার আকুলি বিকুলিতে বিকৃত অঙ্গগুলো …তিড়ক করে লাফা… …কগল।

নফর। (গোলমালের শব্দে …ৎরে উঠ্‌ল) উঃ…

স। আহা, তু' অমন খালি ভুঁয়ে … ড়ে গড়াচ্চিস্ ক্যানে রে! কাঁতা কোত্তা?

ন। (যন্ত্রণা বিকৃত মুখে)…হোত্তা!

[সদী দড়ীর ওপর থেকে কাঁথা নাবিয়ে এনে, পেতে, নফরকে তাব ও… …র শুইয়ে দিয়ে, নিজে পাশে বস্‌ল।]

ন। সদি, তু' এত রেতে জেগে যে?

স। বাইরে গেছ্‌নু।

ন। একন?

স। হ্যাঁ।

ন। ক্যানে?

স। পিসীর তাড়ায়।…কাল থেকে দস্তুরী দিতে পারি নি, বল্‌লে, খেতে দোব না!

ন। হুঁ।…আজ খাস্ নি তামাম্ দিন?

স। না।

ন। তা, ঘুরে এলি, হোলো কিছু?

স। ছাই! ওরা আবার কবে কাকে পয়সা দ্যায়! …আরো হুম্‌কী দিলে যে, থানায় নে যাবে! (কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল)

ন। কারা? কে হুম্‌কি দিলে রে?

(সদি ফোঁপাচ্ছিল, জবাব দিল না)

ন। ভিখ মাঙতে যাস্ নি? তবে কোতা গেছ্‌লি?

স। তাই ত গেছনু! পতে…এক ব্যাটা কনেষ্টবল—

ন। কনেষ্টবল!

স। হ্যাঁ। ঝিমুচ্ছিল। আমায় দেকে বল্‌ল, পয়সা দেবে। সারাদিন দানা নেই পেটে, আমার কোনো সাড় ছিল না। পয়সা দেবে শুনে…

কু। (খিল খিল ক'রে হেসে) কত দিলে লা? মরি মরি…যে রূপ…ব'ল দিলে কত?…অ পুলিশ-পিয়ারি…

স। (বুড়ির কথায় কান না দিয়ে নফরকে) তোর আজ কষ্ট হচ্চে খুব, না? কাৎরাচ্চিলি যে!…সেই যে মলম নে এইছিলি কাল, লাগাস নি?

ন। কি ক'রে লাগাব,…উটিই নি ত সারাদিন!

স। কোতা আচে? দে,…আমি লাগিয়ে দি…

(মলম এনে সযত্নে নফরের ঘায়ে দিয়ে দিতে লাগল।)

ন। (একটু আশ্চর্য্য হয়ে, আপনমনে) তু…তুই খাস্ নি সারাদিন,…না! …হুঁ!

স। আরাম লাগচে একটু?

ন। খুব।…সদি…

স। কি?

ন। তু' আমদানীর, না হেতাকার রে?

স। হেতাকার।

ন। …মি আমদানীর। বাঁকড়ো জেলায় ছেল আদৎ বাড়ী। সে বছ… …র মড়কে সব গেল,—বাড়'-ঘর—গরু বাছুর—মা-বাপ—সব। ক… …কই বা বয়েস তকন,—এই বছর ছ' সাত হবে! পাড়ার কেষ্টধনে… …র সাতে চলে এনু কোলকাতা গতর খাটিয়ে খাব বলে!—তা পর… …

[সদি হাঁটুতে মাথা রেখে … …সে শুনছিল। হঠাৎ গুবরের মেলা-চোখটার ওপর নজর পড়তেই আৎকে … উঠ্‌ল]

স। মা গো!

ন। কি রে?

স। না—কিচ্ছু না। ঐ … গুবরেটা! প্যাট প্যাট করে চেয়ে ঘুমুচ্চে!

ন। ওটা কাণা চোকটা রে, … …চয়ে নেই।

স। আচ্ছ!—তা' পর—

ন। বলি। কোলকাতা এসে… … দলে ভিড়ে গেনু। পকেট-মারায় হাতে খড়ি দিয়ে, … …র মুদ্দে ভারী ভারী

কাজেরও মহড়া দিতে সুরু কন্নু। বছর খানেকের মধ্যে বার চারেক ফাটক থেকেও ঘুরে এনু!—চোককান ফুটল···

স। হেতা জুটলি কি ক'রে?

ন। জানের দায়ে। আগের দলে পুলিশের নজর পড়ল কড়া, ট্যাকা গেল না!

[খানিক দুজনেই চুপ ক'রে রইল। কুঠে বুড়ির আবার খিঁচুনী এসেছিল। একটা আরসুলা নফরের পায়ের ঘায়ে মুখ দিচ্ছিল, সদি তাড়িয়ে দিয়ে কাঁথাটা পায়ের ওপর টেনে দিল]

ন। সদি!

স। ঘুমুস্ নি?

ন। না।···জন্ম ইস্তক্ দলে থেকেও তোর দলছাড়া রীত ক্যানে রে?

স। (অবাক্ হয়ে, কি?

ন। তু' ত আর সবার মতো নোস্! আর কেউ ত আমায় একটা আহাও বলে নি অ্যাদ্দিন!···

[সদি জবাব দিল না। হতভম্ব হয়ে বোকার মতো নফরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল]

ন। একটু একটু আব্ছা আব্ছা আমার একজনের কতা মনে হয়। খুব ছোট বেলা,···আমার বাপ যকন আমায় ধরে পিটত,···সে তকন আমায় নিয়ে ধাট সাট করত,···খেতে দিত!···

স। কে?

ন। বেশী মনে নেই। এক একবার মনে হয়। বোধ হয় আমার মা।

[আবার দু'জনে চুপ করল। নফর একমনে ক্যালেণ্ডারের ছেড়া ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। অবসাদে ও ক্লান্তিতে সদির দুচোখ ভেঙে আসছিল।

ঝাঁপ ঠেলে একজন চুরচুরে মাতাল, বয়স বছর তিরিশ বত্রিশ হবে ঘরে ঢুকল। বীভৎস, কদাকারমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ীতে অন্ধকার। দু'কস বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। সরু সরু কাটী কাটী হাত পা, ঠক ঠক করে কাঁপচে। চোক টকটকে লাল।

এক হাতে একটা ভাঙা মাটীর ভাঁড়, বগলে কতগুলো ছেঁড়া এঁটো কলাপাতা।

সে ফকরে।

সমস্ত ঘরটা তাড়ির বিকট গন্ধে ভরে উঠল।]

ফকরে। মাইরি সদা!···পেল্লায় ভোজ—

ন। কোতা রে?

ফ। (এগিয়ে এসে, অঙ্গভঙ্গী ক'রে) বসে কে মাইরি? ···সাদ!...বহুৎ আচ্ছা!···কি সোনাচ্চাদ···হবে নাকি এক পাত্তর···

ন। ভোজ মেরে এলি কোতা বল্ না!

ফ। ধুত্তোর ভোজ!·শ···আলারা! এই কলাপাতায় মুড়ে কি দিলে মাইরি চাট্টি,...বগলদাবা করে সরে পড়নু!—হেতা এসে দেকি কি না,···ভোজ না শালার ভোজবাজী! খালি এঁটো পাত!··মাইরি খালি···একদম্··

ন। সদি,...যা, শুগে' যা।

ফ। মাইরি আর কি,···আমরা ভেসে এইচি! (ভাঁড়টা রেখে) নে, ধর্।···অমন দশবিশ ভাঁড় উড়েচে আজ ডিপোয়···এটাও কাবার হোত পথে, শুধু তোদের মুক চেয়ে··

ন। খুব করিচিস্। সদি যা।

স। (নফরের কথায় কান না দিয়ে) বগলে কি রে?

ফ। (পাতাগুলো সদির গায়ে ছুড়ে দিয়ে) ভোজ!—খা, খা—(হেসে উঠল)!

[পাতায় ভাত-তরকারী লেগে ছিল। দেখ্তে পেয়ে সদি আগ্রহে চাটতে লাগল।]

ফ। মেরে দিলি?—জবর হাবাতে হইচিস্ মাইরি!

ন। ঘুমো গে ফকরে—দিক্ করিস্ নি।

ফ। সে কি রে!...এক পাত্তর···

ন। না-না! বেতর্ ঠেকৃচে বড্ড।

ফ। সদি!

[ভাঁড় ধরে একচুমুকে সবটা তাড়ি নিঃশেষ করে সদি উঠে দাঁড়াল।]

ফ। কোতা চললি?

স। যেকনেই যাই, তোর কি!...শুয়ো কোতাকার!

ফ। মাগি না খিজী!—আমার খেয়ে আমাকেই চোখ রাঙাবে?

স। একশ' বার। গেঁজেল ভূত কোতাকার! মর্—মর্!

[সদির ভাবভাব দেখে নফর অবাক্ হয়ে তার দিকে তাকাল।]

স। আ মর মিন্সে! চোক্ মাচ্চিস্ যে?—হ হ

বাপধন,—ওতে হয় না! —পয়সা আচে?—নগদ? ফ্যাল আগে—তা'পর!—ফ্যাল কড়ি মাখ তেল···

ফ। মোক্ষম বলিচিস মাইরি! হিঃ হিঃ হি। ফ্যালো কড়ি,—কি না—হোঃ হোঃ!

স। থুক থিক রাক।—আর আচে···নেই—মড়া,—কিপটের ডিম কোতাকার!

ফ। মুক্ সাম্‌লে কতা কোস্ সদি!—কিপ্‌টে! ফকিচ্চাদ কিপ্‌টে!—তবে কাপ্‌তেন কে বাবা?—মামার হোতা আজকের মাইফেল্ চালালে কে শুনি?—কুস্‌মি, রত্‌না, হেবো,—দেক্ গে যা, এক একটা পেট ফুলে ঢাক হয়ে পড়ে আচে! দিনের রোজগার বিল্‌কুল সাফ হয়ে গেল, এক সন্ধ্যেয়—কিপ্‌টে! কোন্ শালা বলে কিপ্‌টে!

স। নে' নে'—ডম্‌ফাই রাক্! হেবো কুস্‌মীর পেট ফুল্‌ল, তাতে মোদের কি এল গ্যাল রে? ঠোঁটও ত ছাই ভিজ্‌ল না!—এই নপা!—এই শুয়র!—ঘুমুচ্চে দ্যাক্!

ফ। আচ্ছা—রোস্ তুই!—নে' আস্‌চি আমি দু চার ভাঁড়! ঘুমুস্ নি—

স। আমিও যাব—চল্।

ন। কোতা যাবি তুই এই রেতে?

স। যমের দোরে।—যেতা খুশী।—হেতা থাক্‌লে খেতে দিবি তুই?

ফ। চ' চ'—বক্ বক্ করিস্ পিছে—

[সদি ও ফকরে বেরিয়ে গেল। নফর একটু উঃ আঃ করে পাশ ফিরে শুল]

ন।—সদি—শোন্!···চলে গেছে।

[কুঠে বুড়ির ঘুম আবার ছুটে গেছল। সে এদিক্ ওদিক্ তাকাতে বললে]

কু। গন্ধ পেলুম যেন! এই মড়া, বলি আচে কিছু?

ন। কাকে বলচিস্? আমাকে?

কু। তা না ত কি ঐ ঝুলোটাকে? সং! বলি, খুবাস পেনু যেন। আচে দু এক ফোঁটা?

ন। ফক্‌রে এনেছ্‌ল। সদি মেরে দিয়েচে সবটা।

কু। সবটা? মর মর! কি শত্তুরই জুটেচে···

ন। কি করেচে ও তোর? তো মাগির সব তাতেই রাগ!

কু। আহ্—হা! মরে যাই!—দরদ দেখিয়ে কি না! মলম লেপে দিয়েচে, কাঁতা টেনে শুইয়েচে,—রূপুসি!—পুলিশ-পিয়ারী!—মাইরি!—তোর মতো আয়না মাগীও যে একটুতেই—

ন। ঘুমো ঘুমো!

কু। নপা, শোন্।—মাগির অত আদিখ্যেতা ক্যানে,—ঠাউরেচিস্ কিছু?

ন। না।

কু। তোর ট্যাঁকে টাঁকে যদি দুটো একটা পয়সা থাকে···ভুলিয়ে ভালিয়ে গাপ করবার মৎলবে—

ন। থাম্! (খানিক চুপ করে থেকে)—ঠান্‌-দি! মাইরি, তু' টের পেলি কি করে? তাই ত বলি—

কু। হেঁ হেঁ বাপ,—আমরা হলুম গে সে আমলের জীব, এই ক'রেই জন্ম কাটালুম!—ওসব দমবাজী কি আর আমাদের ঠেঁয়ে চলে!

ন। (আপনমনে) তাই!—নইলে, কতা নেই, বাত্তা নেই,—খামখাই—

কু। হাড়-শয়তান! হাড়-শয়তান!—ছেনাল মাগি!—যে রূপের ছিরি,—ঐ নিয়ে আবার যায় মানুষ পটাতে! ঘেন্নায় মরি!..পিসী আজ এ্যায়সা ঠোকাই ঠুকেচে—দেকিস্ নি বুঝি?—হোতা—পিসীর ঘরে। চলেচে,—কাল ভোরের মধ্যে যদি দস্তরী না দ্যায়, তবে দল থেকে বার করে দেবে। খেতেও দ্যায় নি সারাদিন কিছু—

ন। গুবরেটা মড়ার মতো ঘুমুচ্চে দ্যাক! তকন থেকে সমানে নাক ডাকাচ্চে!—এই গুব্‌রে!—এই কাণা!

কু। ডাকিস্ নি, ডাকিস্ নি।—

ন। ক্যানে?

কু। উটেই পোঁ ধর্‌বে!—ওর গান শুন্‌লে, মাইরি, আমার হাত পা হিম হয়ে আসে।

ন। আসুক। আমরা ঠায় জেগে থাকব, আর তোফা ঘুম লাগাবে ওরা,—সেটি হচ্চে না!—এই শালা—ওঠ্ না।

[কাণা মোড়ামুড়ি দিয়ে ঘুমের ঘোরেই হাত বার ক'রে বিড় বিড় ক'রে বলল,—জয় হোক রাজা বাবা! একটা—]

ন। (হেসে উঠল) ঢেঁকী স্বগ্‌গে গেলেও ধান ভানে,! ...এই ভূত! হেত্তা তোর বাবা টাবা কেউ নেই—ওট্ শুয়র!

শুবরে। (ভালো চোখটাও মেলে জড়িত স্বরে)—ধুশ—শা—মাইরি—খেড়ে ঘুমটা এয়েছ্‌ল!—কে ডাকচো বাবা?—ওঃ!—(সুর ক'রে) গয়লা দিদি লো—ও তোর...ময়লা বড়—ময়লা বড়...

কু। ওরে—রাক রাক...

শু। প্রাণ্!

কু। (নফরকে) বলেচি!—মাইরি নপা,—আমার গা জ্বলে যায় শুনলে...

শু। (কুঠে বুড়ির দিকে ভঙ্গী করে তাকিয়ে)—মাইরি ঠান্‌দি!—মাইরি?—(সুর ক'রে) দাঁতে মিশি, ঠোঁটে হাসি,—ঠান্‌দি মেরে জান্!

কু। (অসহায় আক্রোশে) নপা—

ন। (হেসে উঠল)—থাম শুব্‌রে!—বলি তোর ঘাড়ে আজ কি চেপেচে বল্ ত! ষাঁড়ের মতো ঘুমুচ্ছিস?—খুব টেনিছিলি বুঝি?—

শু। পয়সা লাগে, সোনার চান্, পয়সা লাগে! খুব টান্‌বার কড়ি পাব কোতা?—তা নয়। অমনি ঘুমই আমার খুব জমাট—

কু। (আপন মনে, অস্ফুট স্বরে)—কবে যে একেবারে ঘুমুবি—

শু। (নফরকে) কুটে মাগি কি বলে রে?—বিড় বিড় করচে দ্যাক্ না?

কু। কি! যত বড় মুক না তত বড় কতা!—কুটে মাগি! বলি তু কোতাকার রাজপুত্ত্বর এলি রে!—নিজের ছুরৎ দেকিস্ না!—ঘাটের মড়া!—

শু। চোপ!—মু' খারাপ করিস নে, খবর্দার!—দোব গেলে চোক দুটো...আমার পরী রে!

[অসহায় অবস্থার কথা মনে হয়ে বুড়ির স্বর নরম হয়ে এল]

ক। (নাকিসুরে) তা ত বলবিই রে—একন ত যা তা বলবিই! ছেলে বিয়োলে তোর মতো দু'দশ গণ্ডা কাণার জন্ম দিতুম আজ,—তুই কি না—

শু। তা—তা—তা—তাই নাকি!—তা দুঃকু কি!—হাল ছাড়িস নি!—

(নফর ও শুবরে পরমানন্দে বিকট উচ্চ হাস্য করে উঠল। বুঠেবুড়ী বিড় বিড় করতে করতে পাশ ফিরে চোখ বুজল]

শু। ফকরে ফেরে নি?—সদি কোতা?—

ন। কোতা মরতে গেচে!—উঃ হু রে!—উঃ—(যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করল)

শু। কি রে!

ন। কিছু না! এই কোমরের ঘা-টা—

শু। তড়পাচ্চে?—যেমন কম্ম!—একটুতেই হুঁস হারাবি তুই—কৈ বাবা!—আমরাও ত বাকী রাকি নি কিছু—আমাদের ত কখনো—

ন। মোড়লি রাখ্! ঘুমো।

শু। যেমন বাচবিচার নেই—

ন। ঘাঁটাস নি!—যদি ভালো চাস্ ত—

শু। ইঃ—কি করবি! বলব না?—একশ' বার বলব, হাজার বার বলব—ঘেয়ো কোতাকার—

[ক্যাকাতে ক্যাকাতে উঠে নফর আচম্‌কা এসে কাণার টুঁটি চেপে ধরে তার মুখে ঘুসী মারতে লাগল। কাণা প্রবলতর শক্তির কাছে অসহায় ভাবে হাত পা ছুঁড়তে লাগল]

ন। ব্যামন—ঘেয়ো—না?—কি?—

শু। ছাড়্ মাইরি!—লাগচে!—দোহাই তোর—

ন। মনে থাকে যেন!—(ক্লান্ত ভাবে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল)।

শু। (হাঁ াতে হাঁপাতে)—শালা!—

[নফর জবাব দিল না। শুবরে দম নিয়ে, ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরাল]

শু। (সুর ক'রে)—জংলা পাকি—পোস না মানে——হায় হায় জংলা পাকি—নপা!—এই!—শালা ঘুমুচ্ছে!—আবার আমায় বলে কিনা ষাঁড়!—জংলা পোসা হোলো দায়!—হা ডে—জংলা পোসা—(বিড়ি টানার সাথে সাথে সুর ভাজতে লাগল)

(বাইরে ফকরের গলার আওয়াজ শোনা গেল)

ফ।—মাইরি?—কদ্দিলে? আট আনা?—বলিস

কি রে !—ওকি ওকি—থাস নে, থাস নে !—পাঁচ ছ' ভাঁড় ত আগেই সাবাড় করিচিস্—

[কথা কইতে কইতে ফকৃরে ও সদি ঘরে ঢুকল। সদির হাতে এক ভাঁড় তাড়ি। মুখ চোখ শুকনো ফোলা ফোলা। হাত পা থর্ থর্ করে কাঁপ্‌চে।

ঘরে ঢুকে সে ভাঁড়ের তাড়িটুকু গলায় ঢেলে, টল্‌তে টল্‌তে কুঠে বুড়ির পাশে নিজের জায়গায় গিয়ে ধপাস্ করে শুয়ে পড়ল। শুয়েই বুড়ির মাথার কাছে হড়্ হড়্ করে খানিকটা বমি করে ফেল্‌ল।

ফকৃরে এসে বেহুঁসের মতো গুব্‌রের ধারে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়্‌ল]

গু। কি বাবা মাণিক-জোড় !—খুব লুটে এলে !

ফ। ঐ বেটী—মাইরি !—পিপে ! আমার চারগুণ—

স। মিছে ক—অথা কোস্ নি কো—ও—ওয়াক !—ম—ওটে ত—ছ ভাঁড়—

গু। বাঃবা !—বেঁচে থাক মাইরি,—পিসীর মুক রাকতে পারবি !—

ফ। শুধু তাই—আবার রোজগারও করে এল এর মধ্যে—

[সদি দু একবার ওয়াক্, ওয়াক্ করে জড়িত স্বরে কি বল্‌ল বোঝা গেল না। একটু পরেই, বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়্‌ল।]

ফ। নপা ঘুমুচ্চে !—ও কি—ডিবেটা জ্বলচেই !—সেই সন্ধ্যে থেকে ?—নেবা—নেবা। (ছেঁড়া কলাপাতটা কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল)—রাত পুইয়ে এল বোধ হয় !—কাক ডাকচে !—

গু। অত ভাব্‌না কি বাবা ! পিসি কড়ি আদায় কোরতে আস্‌বে, তার আগে রাত পোয়ালেই বা কি আর না পোয়ালেই বা কি ?

ফ। তারও...ওয়াক্ !—দেরী নেই !—ময়লাগাড়ী চল্‌ছে পতে !—

গু। বয়ে গেচে।

[একটু উস্‌খুস্ করে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘর অন্ধকার, ঘুট্‌ঘুটে। বাইরে একটু একটু করে ফর্সা হচ্চে। রাস্তা দিয়ে ঘটাঘট্ করে ময়লা ফেলা গাড়ী চল্‌তে সুরু করেচে। কুঁড়েটার মধ্যে সব চুপ, বাইরে রাতের সুপ্তির পর সদ্যোত্থিতা নগরীর জাগরণ কোলাহলের সাড়া পাওয়া যাচ্চে। কিন্তু প্রভাতের সজীবতা এখনো পটলডাঙার পচা পাঁকের পাহারা পেরিয়ে আস্তানার কুঁড়েগুলোর ভেতরে উঁকি দিতে সাহস পায় নি।

এম্‌নি ঘণ্টা খানেক।

কুঠে বুড়ির ঘুম ভেঙেচে, সবার আগে। বন্ধ ঘরে চোখ মেলে, খানিক ধন্দ ধরে থেকে আঁধার সরে গেলে পর, তার নজর পড়ল সদির ওপর।]

কু। মর, মর !—সারারাত কেলি করে গড়ানো হচ্চে দ্যাক না ! বলি অ' রূপসি !—বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্চে।—ঘর ম' ম' করচে গন্ধে ;—কত গিলেচে !—রেকেচে কি আর ছাই এক ফোঁটাও !—এই নুলো, ওট্ ওট্—দুফুর বেজে গেল যে !

[উঠতে গিয়ে বুড়ীর হাত ঠেকে গেল সদির আঁচলে। রাতের রোজগার আট আনা পয়সা তাতে বাঁধা ছিল ; এদিক ওদিক চেয়ে চোক গিলে, বুড়ি সেটা বার করে নিল। নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে কোনো রকমে উঠে, ঝোলাঝুলি নিয়ে দাঁড়াল]।

কু। দুগ্‌গা—দুগ্‌গা ! ওরে নুলো—ওঠ্।

ফ। (হঠাৎ ঘুম ভেঙে, বুড়ির সাড়া পেয়ে) দাঁতে মিশি ঠোঁটে হাসি,—

কু। (আঁৎকে উঠে)—রাম রাম !

গু। কি বাবা, ভূত ঝাড়চ ?—ঠান্‌দি মেরে জান্—হারে—ঠান্‌দি মেরে জান্।

কু। মর্ মর্ ! (ঝাঁপ ঠেলে বাইরে বেরোল)

গু। চল্‌লি নাকি ? (সুর করে) শুঁড়ি সুড়ি, কুঠে বুড়ি, চোল্‌ল নিয়ে প্রাণ !—হায় হায় !

[অকথ্য ও অশ্রাব্য গালাগাল করতে করতে বুড়ি চলে গেল। গুব্‌রে আপন মনে খুব খানিক হো হো করে হাসল। তার পর আর একবার পাশ ফিরে চোখ বুজল।

দোর গোড়া থেকে মোড়লনীর বাজখাঁই কর্কশ গলার হাঁক শোনা গেল।]

খেঁ। নপা, ফোক্‌রে, গুব্‌রে, সদি !—এই চার নম্বরের বাসিন্দারা !—ওট্ ওট্ !

[খেঁদী ঘরে ঢুক্‌ল। গুব্‌রে উঠে বসল]

গু। ধর্।

খেঁ। (পয়সা গুণে ট্যাঁকসই ক'রে) আর মড়াগুলোর হয়েচে কি ?—দে ত—দে ত—চুলের মুটি ধরে উটিয়ে দে সব কটাকে'!—নবাবের নাতি সব !

[শুব্রে সবাইকে এক একটা হাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। ফোক্‌রে উঠে চোখ রগড়াতে লাগল]।

খেঁ। লে' লে'! দস্তরী বার কর্!—কাজে বেরো। হোতা কে ওটা? সদি?—তবে রে মাগি, মিনি পয়সার পেয়ারি।—এই—ওট্ ওট্ (পা দিয়ে মাথায় গুঁতো দিল) বজ্জাত মাগি!—কই লা, দস্তরী কোতা?—বার কর্ শিগ্‌গির!—কালকের দু'আনা,—আজকের দু'আনা—

স। (মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে উঠে বসে) দিচ্চি!—গালমন্দ করিস্ নে সকাল বেলা!—

খেঁ। ইস্!—পুজো আচ্চায় যাবি নাকি লো?—বলি, বড় যে—

(সদি আঁচল টেনে পয়সা না পেয়ে, পাগলের মতো কাপড় চোপড় ঝাড়তে সুরু করেছিল। কাঁথা, কম্বল,—কোথাও না পেয়ে সে ডুক্‌রে উঠল।)

খেঁ। বলি ঝাড়ফুঁক সুরু করলি যে!—পয়সা কোতা?—ও আবার কি?—আ মর্—

স। (ফোঁপাতে ফোঁপাতে) পয়সা—আমার পয়সা!—এই আঁচলে যে দুটো সিকি বাঁধা ছেল কাল রাতে!

খেঁ। (একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে) ঢং রাক্! ওসব ভেল্ চলবে না হেতা! (নীরস কণ্ঠে) পয়সা বার কর্।

স। ঢং কি? সত্যি মিথ্যে সুধো না ফক্‌রেকে!—ছিল কি না—

ফ। ছেল, ছেল!—মাইরি পিসি,—জবর রোজগার করেছ্‌ল মাগি—

খেঁ। ছেল ত গ্যাল কোতা?

স। কেও নিয়েচে!—নইলে যাবে কোতা! (চার-দিকে তাকিয়ে, ফক্‌রেকে)—তুই নিয়েচিস্ আমার পয়সা!—বার কর্—দে শিগগির—(ফক্‌রের ওপর গিয়ে পড়ল)।

ফ। (সদির পেটে হাঁটু দিয়ে এক গুঁতো দিল)—পালা পালা!—আট গণ্ডার পয়সা,—তাই নিতে যাব আমি?—খেয়াল নেই, মাগি!—ফকিরচাঁদ অমন কত আটগণ্ডা উড়িয়েচে কাল একসন্ধ্যার ফুরতিতে!—যা—যা!

স। (গুঁতো খেয়ে কোকিয়ে উঠল)—মা গো!—তবে কি হ'ল আমার পয়সা!—কে নিল?—(কান্নায় তার কথা বন্ধ হয়ে এল!)

[ফক্‌রে পিসীর হাতে পয়সা দিয়ে বেরিয়ে গেল। নফরের ঘুম ভেঙেছিল, সে উৎকর্ণ হয়ে সব শুনছিল]

খেঁ। (পরুষ গলায়)—শোন্ সদি!—যেতা থেকে পারিস্ নে' আয় পয়সা!—ধারে কারবার নেই হেতায়!—তা হোস্ না তুই বরাবরকার।—অতবড় দেহটা,—লজ্জা করে না! যেম্‌নে পারিস্,—দিতেই হবে আজ—

স। (হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে ফোঁপাতে)—আমি ত এনেই ছিনু—তা চুরী হলে—এ নিশ্চয় ওই কুটে বুড়ির কাজ—আমি—

ন। হোলো কি পিসী? অত রুখ্‌চিস্ কার ওপর?

খেঁ। ন্যাক্ না মাগীর রীত্!—ধুম্‌সি মাগি, দু'দিন দস্তরী ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্চে!—কালকের অমন ঠ্যাঙানীতেও মাগীর শিক্ষে হয় নি।—

ন। হুঁ।—আমার দস্তরী নিবি নে?

খেঁ! দে।

ন। ধর্।—

খেঁ। (পয়সা নিয়ে)—কাজে যাবি নে?—না যাস্, থাক্ পড়ে!—ওলো অ' শতেক খোয়ারী!—বলি ধন্দ ধরেই থাক্‌বি,—না—

('খেঁদি অনর্গল গাল মন্দ করে যেতে লাগল; সদির মুখে রা ছিল না, সে মুষড়ে কেমন যেন একরকম হয়ে গেল। কিন্তু তার অস্ফুট রোদন সমান চলতে লাগল। নিজের দস্তরী দিয়ে পাশ ফিরে চোখ বুজতেই নফরের চোখের ওপর থেকে নোংরা কুঁড়ের ঘুট্‌ঘুটে অন্দর যেন ছায়াবাজীর মতো মিলিয়ে গেল। দূর অতীতের কবরের তলা থেকে একখানা মুখ তার মুগ্ধ দৃষ্টির ওপর ফুটে উঠ্‌ল—বাপের ঠ্যাঙানোকে অভিভূত করে শান্তি প্রলেপের মত যার চোখের জল তার ব্যথাজর্জ্জর সর্ব্বাঙ্গে একদিন ঝরে পড়েছিল, মুখখানা তার।

বন্ধ দৃষ্টির অস্পষ্ট অন্ধকারে সে একবার শিউরে উঠল। তার পর চোখ মেলে, একটু কেশে খেঁদিকে বলল।)

ন। কত পাবি ওর কাচে?

খেঁ। চার আনা।

ন। ওই হোতা খুঁটির পেছনে গোঁজা আচে। বার করে নিগে যা!

(সদি ও খেঁদী সমান অবাক হয়ে একসাথে নফরের দিকে তাকাল)।

ন। দিক্ করিস্ নি যা—অ' মোলো! চোখ মট্‌কাচ্ছিস্ কেনে?

[নফর পাশ ফিরে শুল।

খেঁদী বেকুবের মত খানিক দাঁড়িয়ে থেকে, কথিত জায়গা থেকে পয়সা বার করে নিল। তার পর সদির দিকে একটা বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল।

সদি বজ্রাহতের মতো একদৃষ্টে নফরের দিকে তাকিয়ে রইল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের ভেতর আস্‌তে লাগল।

হঠাৎ সদির সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। উচ্ছ্বসিত কান্না চাপ্‌তে চাপ্‌তে সে কম্পিত হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজল।

ঘুলোটা খেঁদীর সাড়া পাওয়া অবধি কতকগুলো ঝুলিকাঁথার তলায় লুকিয়ে ছিল, এইবারে মুখ বার করে মিট্‌ মিট্‌ করে তাকাতে লাগ্‌ল।]

কোন লোভ রাখি না ক' স্মৃতির উপরে

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

কোন লোভ রাখি না ক' স্মৃতির উপরে,
তার কতখানি সুখ জানি ভাল ক'রে!
আমি গেলে দিন দু'য়ে নয়নের জলে
ধুয়ে মুছে ফেলো সব, মরমের তলে
কিছু রেখো না ক' পুষে ভালমন্দ মোর,
নিন্দা বাঁধে না ক' কা'রে, যশোরশ্মি ডোর
পাতিয়ো না, ছুটে যেতে যে প্রাণ উদ্দাম,
তার মুখে কেন আর লাগাবে লাগাম?
চিরদিন প্রাণ মোর অর্দ্ধনারীশ্বর,
কখনো ধূর্জ্জটি সম তাণ্ডব তৎপর,
কখনো বা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা,
উমাসমা প্রেমময়ী পেলব আনতা!

নবলোকে নবজন্ম? প্রাণ তারি লাগি
ত্বরান্বিত উতলা, উন্মুখ অনুরাগী,
জীর্ণ দেহ ছিন্নবস্ত্র সম যাব ফেলে,
চিতার আগুন আলোকের বাহু মেলে
প্রাণ মোর তুলে লবে, প'ড়ে রবে ছাই,
তা নিয়ে করিতে পার যাহা ইচ্ছা তাই!
গঙ্গাজলে দিয়ো ফেলে, ভেসে মিশে যাবে
সাগরের বুকে, নয় ত বা স্থান পাবে
পলি-পড়া কোন্ ক্ষেতে, ফুটায়ে তুলিবে
ছোটো রাঙাফুল কোনো, পুষ্ট করি দিবে
ধানের মঞ্জরীখানি সোনার ফসলে,
নয় ত যোগাবে রস কোন্ বনফলে।

কোথা যাব? কোন্ লোকে? কোন্ রবিশশী
তারকার কিরণ ধারার মাঝে পশি,
প্রাণ মোর হবে সমুজ্জ্বল দীপ্তিভরা?
জনমি প্রথম দিন যে আলো-পসরা
এনেছিল সঙ্গে করি হাসি আর গানে,
আবার ফিরিয়া আমি পাব কোন্‌খানে!
সে আলো মুছিয়া গেছে, থেমে গেছে হাসি,
কলকণ্ঠ ভরা মোর কলগীতরাশি,
দিনে দিনে মরিয়াছে কণ্ঠরোধ করি
মূক হয়ে, আজো সে তো যায় নি পাশরি
চির-জানা যত সুর; গেলেও কুলায়,
বিহগের গান তারে কেবল ভুলায়?
ডানা-ভাঙা, নীড়-হারা, পথ প্রান্তে পড়া,
তবু দ্বিজ, মর্ম্মবাণী সামমন্ত্রে গড়া!

অগ্নি-শুদ্ধি

শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

পাড়ায় পাড়ায় একটা অতিশয় ছি-ছি পড়িয়াছে, কিন্তু কাহারও মুখে টু-শব্দটি নাই।

ইছাপুরের জমিদার ও সমাজপতি নন্দলাল সেন ষাট বছর বয়সে চতুর্থবারে বাইশ বছরের বিভাকে বিবাহ করিয়া পালকী চড়িয়া নহবৎ পিটাইয়া গ্রামে ঢুকিলেন। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা বৃদ্ধের মাথার টোপর দেখিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, 'বাঃ রে, এ যে কানাইর দাদা মশাই!' তাহাদের অনেকেই নতুন জামাই দর্শনের লোভ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, এই যাত্রায় তাহারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এমন দুষ্কার্য্য আর ইহজীবনে করিবে না। একটি ছোট মেয়ে সকলের পশ্চাতে পশ্চাতে অনেকক্ষণ দৌড়াইয়া আসিয়া বৃদ্ধের তুষার শুভ্র পক্কচুল ও ভ্রূর উপর লাল টকটকে মুকুট দেখিয়া ভয়ে প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল।

পাড়ার বয়স্কা মেয়েরা নন্দলালকে মনে মনে অভিশাপ দিল এবং বিভার বাপ মাকে দূর হইতে তিরস্কার করিল। তাঁহারা অনেক দিন হইল পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। বিভা শৈশবেই মাতৃহারা। তাহার পিতা ধনী ছিলেন। একটি মাত্র মেয়ের তিনি আদর যত্নের ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভাকে তিনি এক দূরসম্পর্কীয়া পিসির বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে চক্ষু মুদিলেন।

পরদিন পাড়ার সমবয়সী বৃদ্ধেরা বৈঠকখানায় ঢুকিবামাত্র নন্দলাল সাতিশয় ব্যগ্রতার সহিত তামাকের ফরমায়েস পাঠাইয়া কাহাকেও অবকাশ না দিয়া বলিয়া উঠিলেন, দেখলে তো ভায়ারা, আমি কিন্তু আগেই ঠাহর করেছিলাম। নইলে কি আর আমার বিয়ের বয়স ছিল, না ইচ্ছাই ছিল? কি করে ছেলেগুলোকে মানুষ করেছি, তোমরা তো সবই জান। কিন্তু এই দেখ না, একে একে সবাই বউ নিয়ে সরে পড়লেন। এই বয়সে মারা যাই আর কি! এক গেলাস্ জল তেষ্টা পেলে কে গড়িয়ে দেয় বল দিকি নি? হাঁ, তার উপর একটি জন্মদুঃখিনী মেয়েরও কুল ইজ্জত রইল। কি বল হারুগোপাল?—বলিয়া গুড়গুড়িতে একটা দম্‌কা টান দিয়া অনেকক্ষণ অনবরত কাশিতে কাশিতে যখন প্রচুর হানাহানি করিয়া গলার ভিতর হইতে অনেকগুলি পক্ক শ্লেষ্মা নির্গত করিয়া হাঁফ ছাড়িলেন, তখন উপস্থিত বৃদ্ধেরা তখনকার সেই মুখশ্রীতে খুনী লোকের জিঘাংসার ছাপ সম্যক প্রকটিত না দেখিলেও, অন্তত খুব যে সুরুচিপূর্ণ লাবণ্য উছলাইয়া পড়িতেছিল না, সকলেই তাহা অল্পবিস্তর হৃদয়ঙ্গম করিলেন। হারুগোপাল মুখে কিছু না বলিয়া মাথা নাড়িয়া সমর্থন-সূচক ভঙ্গী করিলেন এবং সকলে একে অপরের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন। কিন্তু সব চাইতে বেশী হাসিয়াছিলেন বোধ হয় বিধাতা পুরুষ অন্তরালে বসিয়া। নন্দলাল অগ্রহায়ণ মাসের নূতন গেঁয়ো শীত সহিতে পারিলেন না এবং বিভাকে আটমাসের অন্তঃসত্ত্বা রাখিয়া এক দিন দুপুর রাত্রেতে বাত-কফের তাড়নায় ভব যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন। সর্দ্দি কাশির ভয় তাঁহার অতিশয় প্রবল ছিল এবং সে জন্য অনেকগুলি আনকোরা বড়িও জোগার রাখিয়াছিলেন, কিন্তু যথাসময়ে সেগুলি কেহই কাজ করিতে রাজি হইল না। নন্দলালের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিশ পিতার অকাল মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া বাড়ী আসল।

কাল সন্ধ্যা। হরিশ অভিভূতের মত বাহিরে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিল। চোখের সম্মুখে সূর্য্য অস্ত গেল, অন্ধকার ধরিত্রীর মুখে কালো পর্দ্দা টানিয়া নিঃশব্দ চরণে সরিয়া গেল। অন্তঃপুরে শাঁখ বাজিল, তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বলিল। হরিশ বসিয়া রহিল। ভিতর হইতে ঝি ডাকিয়া কহিল, দাদাবাবু, মা ডাক্‌ছেন।

বিভা লক্ষ্মীর আসনে প্রদীপ ও নৈবেদ্য দিতেছিল। হরিশ ডাকিল, মা, ডেকেছিলেন?

বিভা মাথার থান্ কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বলিল, হাঁ, আসুন।

হরিশ ঘরে ঢুকিল। বিভা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিল, বলিল, আপনাকে কোথাও দেখেছি যেন মনে হয়।

—আমাকে?

—হাঁ, একটু দাঁড়ান। বলিয়া দেরাজ খুলিয়া একখানা ফটো বাহির করিয়া লইল। হরিশ দেখিল তাহারই ফটো। যখন সে কলেজে পড়ে তখনকার। হরিশের মনে বিস্মৃত প্রায় ছয় বৎসরের পুরান কথা জাগিয়া উঠিল। বিভার পিতা বিভার সঙ্গে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করেন।

হরিশ চুপ করিয়া রহিল। এত বড় একটা বিপ্লবের জন্য সে আদৌ প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। তাহার মনে হইল, একটা পাপিষ্ঠা তাহাদের সংসারটাকে মুস্‌ড়াইয়া থেঁতলাইয়া ওলটপালট করিয়া দিল। অনেকগুলি রূঢ় কথা তাহার ঠোঁটের কাছে আসিয়া জড় হইল! অনেক কষ্টে আত্মদমন করিয়া হরিশ চোখে মুখে একটা অপরিসীম ঘৃণার ভাব লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। বিভা অনেকক্ষণ খোলা দরজার ভিতর দিয়া বাহিরের জমাট অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল, চোখ দুইটা একবার সহসা মশালের মত জ্বলিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই নিভিয়া গেল।

লক্ষ্মীর আসনের নীচে প্রণাম করিতে গিয়া বিভা কাঁদিয়া ফেলিল, বারংবার কপাল মাটীতে ঠেকাইয়া বলিতে লাগিল, ঠাকুর, আমাকে এ কোন্ বেড়াজালে আনিয়া ফেলিলে, আমাকে মুক্ত কর, মুক্ত কর। কিন্তু বহুক্ষণ নীরবে অশ্রুমোচন করিয়াও হতভাগিনী আন্দোলিত মনটাকে শান্ত করিতে পারিল না।

তিন দিন পর ভোরবেলা বিভা অসময়ে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিল। সমস্ত দিন কাঁদিয়া কাটিয়া সন্ধ্যার সময় সে হরিশকে ডাকাইয়া পাঠাইল। হরিশ আসিল না। বিভা সমস্তই বুঝিল। কয়েকদিন পরে প্রাতে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। হরিশ সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়াও বিভার সন্ধান পাইল না। পাইল কেবল আঁতুর ঘরের বেড়ার ফাঁকে গোঁজা একটুকরা কাগজে লিখা—হরিশবাবু, আমি চলিলাম। কোথায় আমার জন্ত স্থান নিরূপিত হইয়া আছে জানি না। ভগবান্ আমার শেষ সম্বল, শেষ আনন্দের ধন, সন্তানটিকেও কাড়িয়া লইলেন। লোহাও আগুনের তাত সহিতে পারে না। মেয়েদের হৃদয় লোহার চাইতেও শক্ত জানি, কিন্তু তাহাও নিষ্ঠুর আঘাতের পর আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সমস্ত জীবন আমি কি নিয়া কাটাইব? আমার অন্তরে কি দাবানল জ্বলিতেছে কেহ হয় ত বুঝিবে না, হয় ত আমার জন্য সকলের মুখে কালি পড়িবে। কিন্তু আমি উপায়হীনা। বাড়ীর দাসী-চাকরগুলিও আমাকে বিষ নজরে দেখে, আপনারা আমাকে পরগাছার চাইতেও হেয় মনে করেন, পাড়ার মেয়ে-ছেলেরা আমাকে ডাইনী ভাবিয়া দূরে সরে। সুতরাং সকলকে নিষ্কৃতি দিলাম। কিন্তু আমার কোনও রূপ দুরবস্থার জন্ত কে দায়ী ভাবিয়া দেখিবেন। সম্পূর্ণরূপে আমাকে দায়ী করিলে আমার প্রতি নিশ্চয়ই অবিচার করা হইবে।

ইতি—বিভা

বছর কুড়ি পরের কথা।

তাহার নাম বিপুল। কেহ বলে সে কবি, কেহ ভাবিত সে পাগল, খেয়ালী।

মেঘলা দিন। আকাশ গুমোট মেঘে ভরিয়া আছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরিতেছে। বিপুল একমনে চলিয়াছে। একটা সরু গলির মধ্য দিয়া একটি মেটে নোংরা খোলার ঘরের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। কাহার মৃদু গানের সুরের রেশ তাহার কানে পৌছিল—হঠাৎ ঘুরিয়া সে দরজার সামে গিয়া দাঁড়াইল। একটি মেয়ে মাটীতে বসিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া নিবিড়ভাবে একখানা ছবি দেখিতেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছিল। পদশব্দে সে চাহিয়া দেখিল এবং ছবিটা তাড়াতাড়ি ঢাকা দিয়া উঠিয়া সামলাইয়া লইল। কিন্তু বিপুলকে দ্বারের কাছে দেখিয়া সে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। বিপুল বলিল, খুব বাদলা করে আসছে।

মেয়েটী মাথা নোয়াইয়া রহিল, কথা কহিল না; কেবল পায়ের নখ দিয়া মেজের মাটী অনেকটা খুঁড়িয়া

ফেলিল। বিপুল ঘরে ঢুকিয়া তক্তার উপর বসিল। ঘরে কোন আসবাবের বালাই নাই, সমস্ত ঘরখানি এলোমেলো, অপরিষ্কৃত। বিপুল আবার বলিল, কি নাম তোমার?

পাতাল।

বিপুল আর একবার তাহার দিকে তাকাইল। এই পাতালের কথাই সে মলিনার কাছে শুনিয়াছে। অপরূপ সুন্দরী বলিয়া তাহার যেমন খ্যাতি আছে, কাহাকেও সহজে সে ঠাঁই দেয় না বলিয়া তেমনি অখ্যাতিও আছে ঢের। মলিনা বলিয়াছে অত রূপযৌবন থাকৃতেও মেয়েটা মেটে ঘরে পড়ে থাকে। কত ঢংই না দেখলুম, আবার দিন নাই, রাত নাই, ছবি আঁকেন। সেদিন এসে বলে কিনা, মলি-দি, দে না ভাই দুটো টাকা, ঘরে একদানা চাল নেই।' ঝেঁটিয়ে বার করে দিয়ে তবে আমি হাঁফ ছেড়েছি। মর আবাগীর ঝি, তোকে টাকা দিলে কি আর এজন্মে পাওয়া যাবে?

ও কার ছবি আঁকছ?

পাতাল ধীরে ধীরে বলিল, শুনে কি হবে?

শুনতে দোষ কি?

পাতাল হাসিল, বলিল, নেহাৎ শুনবে? ও যাঁর ছবি, তিনি ঐ বসে আছেন। বলিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া মুখ চাপিয়া রহিল। সমস্ত মুখখানা হাসির তরঙ্গে উছলাইয়া উঠিল।

—সত্যি? ঠাট্টা নয়?

—বিশ্বাস না হয়, খুলেই দেখ না।

বিপুল আবরণ সরাইয়া ফেলিল, তাহারই ছবি বটে। গভীর বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কোথায় দেখলে তুমি?

না দেখে বুঝি ছবি আঁকা যায় না?

না দেখে? এম্নি? না, সত্যি করে বল।

পাতাল খানিক চুপ করিয়া রহিল, পরে মাটীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তুমি তো প্রায়ই যাও এই রাস্তায়। আচ্ছা, তুমি একটু বস, আমি আসছি। বলিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, দেখো, পালিও না যেন।

বিপুল অসমাপ্ত ছবিখানা লইয়া দেখিতে লাগিল। চাহিয়া চাহিয়া আজ সে আবিষ্কার করিল, সে কত সুন্দর। ছবিখানার প্রত্যেক তুলির রেখা পাতালের বুক নিংড়ান রক্তের সঙ্গে যেন মিশিয়া আছে। —আচ্ছা পাতাল আমার ছবি আঁকতে গেল কেন? ভাবিয়া ভাবিয়া বিপুল আরাম বোধ করিল।

পাতাল হাতে একটা ঠোঙ্গা লইয়া ঘরে ঢুকিল। মেজের আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া বলিল, বস, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে।

আর একবার বিপুল পাতালের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল। বলিল, এম্নি ভাবে ফাঁদ পেতে আর ক'জনার মন ভুলিয়েছ পাতাল?

একজনার। আর সেই একজন আমার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। শুনছ? এখন বোস।

বিপুল কথা কহিল না। শুধু মাথা নত করিয়া অন্য-মনস্ক হইয়া কলের পুতুলের মত খাইয়া যাইতে লাগিল। পাতাল কহিল, মলিনার ওখানে যাচ্ছিলে, না?

—হুঁ কিন্তু আর না।

—কেন? তার অপরাধ?

—জানি না হয় ত অনেক। বলিয়া তক্তার উপর উঠিয়া বসিল। পাতাল নতজানু হইয়া বসিয়া হাত পাতিয়া বলিল, না, ওটা ধরিও না, আমায় দাও। হাঁ এখন বল, ওগুলো আর ছোঁবে না?

বিস্ময়ে বিপুল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এই সারা সন্ধ্যাবেলাটা একটা অনন্ত প্রহেলিকার জালে ঢাকা পড়িয়া থম্ ধরিয়া আছে। সমস্তই যেন তাহার চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া আসিল।

বল না শীগগির করে। আমার অনেক কাজ রয়েছে যে, এক্ষুনি আবার উনুন ধরাতে হবে।

বিপুল মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

পাতাল তাহার পকেট হইতে সন্তর্পণে সিগারেট-কেসটা তুলিয়া লইয়া বলিল, এটা আপাততঃ আমার জিম্মায় থাক্। কেমন? নেশা জিনিষটা বড্ড অবিশ্বাসী কিনা! বলিয়া হাসিল!

বিপুল পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; এক অপরিচিতা তরুণী মায়াকাঠি বুলাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব যেন একনিমেষে হরণ করিয়া লইয়া গেল।

আজ পাতালের জন্মদিন। এই দিনটির অপেক্ষায় কত আকাঙ্ক্ষা বুকে পুরিয়া সে চাহিয়া ছিল। কত পরিশ্রম করিয়া সে এতগুলি ছবি আঁকিয়াছে, তাহার জীর্ণ ঘরখানি সাজাইবার জন্য। কাল রাত্রে সে তিনবার দোর খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিয়াছে, রাত্রি ফুরাইতে আর দেরী কত! ভোরের ম্লান জ্যোৎস্নাকে সে মনে মনে গালি দিয়াছে,—পোড়ারমুখী, মুখ তো ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আর কতকাল আকাশ জুড়ে বসে থাকবি?

পাখীর ডাকে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন একটু বেলা হইয়াছে। নিজের উপর ভয়ানক রাগ হইল, কেন সে শেষ রাত্রে আবার ঘুমাইতে গেল। বাহিরে আসিয়া তাহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, কে যেন ভালবাসিয়া একখানি সুকুমার রঙিন প্রভাত তাহাকে উপহার পাঠাইয়াছে। তুলসী তলায় গড় হইয়া প্রণাম করিয়া সে সারা আঙ্গিনায় গোবর জল ছিটাইয়া দিল।

ঘরদুয়ার লেপিয়া পাতাল পা ছড়াইয়া মেজেয় বসিয়া আলপনা দিতেছিল। রাস্তার ও-পারের দোতালা হইতে কাঙ্গলী ডাকিয়া বলিল, পাতালী, আজকে কিরে তোর বাড়ীতে? তুই বাবা ধন্যি মেয়ে, আবার ব্রত আহ্নিক কবে ধরলি লো?

—দূর, তা কেন? আজ যে দেবতা আসবেন।

দে-ব-তা? বাবা গো! এজন্মে ঢের মেয়ে দেখেছি, তোর মত সৃষ্টিছাড়া একটিও নয়। কত মিনষে পায়ে ধরে সাধাসাধি, মন উঠল না। এখন কিনা জুটিয়ে এনেছেন কোথাকার দেবতাকে! কাকে ছোঁ মেরেছিস? কি লো রূপসী, কথা কস নে কেন? কে আসবে শুনতে পাই না?

পাতাল আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, একবার ফিরিয়াও তাকাইল না, কথাও কহিল না।

—কই? কপালে তো সেই সেকেলে নেরচে ধরা টায়রাটাই দেখ'ছ, হাঁরে জহরৎ গলল না? বলি তোর দেবতা এলে একবার ডেকে দেখাস তো, দেখব'খন কটা হাত ক'টা পা। বলিয়া খামখা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

পাতাল অনেকদিনের অযত্নের চুলগুলিকে আঁচড়াইয়া পাট করিতেছিল আর অস্ফুটস্বরে গান গাহিতেছিল।

বাহির হইতে ডাক আসিল, পাতাল!

—এসেছ? তবু যাহোক, আমি ভাবলুম, না জানি কি হ'ল!

—হাঁ, বড্ড দেরী হয়ে গেল। বলিয়া একঝুড়ি ফুল পাতালের হাতে দিল।

ওগো, এস না, বাইরে একটু দাঁড়াও। বলিয়া ধূপদানিতে ধূপ ছড়াইয়া দিল, শাঁখ বাজাইল, থালা হইতে শ্বেতচন্দন লইয়া বিপুলের কপালে লেপিয়া দিয়া প্রণাম করিয়া ঘরে লইয়া আসিল।

—এ সব কি পাগ্‌লামী, পাতাল?

—তুমি আমার জন্মদিনের অতিথি কিনা, তাই। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস না।

বিপুল বসিল। পাতাল ফুলগুলি লইয়া মালা গাঁথিতে বসিল। বিপুল একদৃষ্টে পাতালকে দেখিতে লাগিল। এই প্রভাতে শৈবালের মত ভাসিতে ভাসিতে সে কোন্ অতল রহস্যাবৃত পাতালপুরীর ঐশ্চর্য্যময়ী রাজকন্যার গোপন কক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে? আবার ভাবিল, সে এই কল্যাণময়ী নারীর সংস্পর্শে না আসিলে বুঝি বা তাহার সমস্ত জীবন রিক্ততায় ব্যর্থ হইয়া যাইত। অথচ, ইহার সম্বন্ধে কতটুকু সে জানে?

—চুপ্ করে কেন? কি ভাবছ?

—ভাব্‌ছি, তুমি কে?

—আমি পাতাল। হাসিয়া আবার বলিল, তুমি কে?

—আমি? বিপুল।

পাতাল একবার মাথা তুলিয়া চাহিল। আবার সমস্ত চুপ।

পাতালের মালা গাঁথা শেষ হইল।

—চল, এই বেলা তোমায় ঘরে।

—আমার ঘর? কোথায়?

—এস না, দেখবে। বলিয়া পর্দার আড়ালে একটা সরু কপাট খুলিয়া পাতাল আগে চলিয়া গেল।

সুচারু হস্তের প্রসাধনে ঘরখানিতে একটি মনোরম পবিত্রতা মাখিয়া আছে। ঘরের একপাশে একখানি শুভ্র শয্যা রচিত হইয়াছে। বিপুল বসিল। সম্মুখের মাটীর দেওয়ালে কয়েকখানি হাতে আঁকা ছবি। বিপুল নিজের সমাপ্ত ছবিখানা সাগ্রহে দেখিতে লাগিল। পাশে একখানা রূপসী যুবতীর ছবি দেখিয়া বলিল, উনি কে?

—আমার মা।

—আর ওখানা?

—আমার মায়ের ছেলের।

ছবিটির পানে চাহিয়া চাহিয়া বিপুল কাঁপিয়া উঠিল। দেখিল নীচে নাম লেখা আছে, হরিশ্চন্দ্র সেন। আর কোন সংশয় রহিল না।

বিপুল দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইয়া পাতাল ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, 'ওঁকে চেন নাকি? এমন কল্লে কেন? বল, কিছু অসুখ করে নি তো?—তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

বিপুল হতাশ কণ্ঠে বলিল, চিনি না? —আমার বাবা।

পাতালের মাথাটা ঘুরিয়া গেল, পায়ের তলার মাটী যেন অকস্মাৎ দোল খাইয়া উঠিতে পড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানিও পাক্ খাইয়া নাচিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। সে বিপুলকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিল।

বিপুল পাতালের মুখখানি দুইহাতে গভীর স্নেহে চাপিয়া ধরিয়া তাহার চোখের পানে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, কে বল্লে তোমার মুখ কালো? আমি তো দেখতে পাই নে। আমি দেখছি, শুভ্র শতদলের মত তোমার চোখে মুখে একটি রমণীয় শুচি হাস্য লেগে আছে। পাতাল, আমাদের মিলন ভগবানের ইচ্ছা!

পাতাল কিছু বুঝিল না, শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পাতাল, চল আমরা মরি। আজকেই আমাদের শেষ দেখাশুনা, কেমন?

ওগো, কি বলছ? তুমি যেয়ো না, আমি বাঁচব না। বলিয়া আরও জোরে পাতাল বিপুলের হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল।

রাত্রি অনেক। বিপুল চীৎকার করিয়া কহিল, পাতাল পাতাল, 'জীবন-সুরা—ফুরায়ে গেলে আপ্‌শোষে কেন ফাটবে বুক'।

পাতাল অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা তুলিয়া বিপুলের চোখের দিকে চাহিয়া আবার তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তবে এস, এবার মৃত্যুর মন্দিরে যাই।

প্রদীপ নিভিল। ক্ষণপরে ফস্ করিয়া একটা শব্দ হইল। লালসাময়ী বহ্নিশিখা প্রমত্ত জিঘাংসার রূপ ধরিয়া লেলিহান্ সর্প জিহ্বা মেলিয়া মাতিয়া উঠিল। পাতাল ডাকিল, বিপুল ভাই, ও কি? ও কী শব্দ?

দেখতে পাচ্ছ না? আজ আমাদের জয়যাত্রা। মৃত্যুর দেবদূত রথ হেঁকে চলেছে, শুনছ না? চাকার ঘর্ঘর শব্দ?

পাতাল, কই? দেখো কেমন রংমশাল জলছে। কি, কষ্ট হচ্ছে? ভয় কর্‌ছে?

পাতাল চক্ষু মুদিয়া বিপুলের গলা নিবিড় ভাবে জড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

—পাতাল, পরিপূর্ণ জীবন আজ, অভিনব অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা আজ আমাদের। পাতাল, তোমাকে বাঁচাতে পারতাম যদি তোমাকে সুখী দেখতাম তাহলে তোমাকে একলা ফেলে যেতে সাহস হোত কিন্তু কোথায় তোমাকে রেখে যাবো? তোমার জন্মদাতার অপরাধে তুমি অপরাধিনী। আমি আমার সমাজের হয়ে তোমাকে সে অপরাধ থেকে মুক্তি দিলাম।

পাতাল ক্লান্ত স্বরে বলিল, তোমার স্নেহের বন্ধনে আজ সত্যই আমার মুক্তি হোল বিপুল।

বিপুল অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল, আজ পিতৃপুরুষের ঋণ শোধ।

পাড়ার লোকজন জটলা পাকাইয়া আগুন নিভাইল। কিছুই উদ্ধার হইল না, কেবল আলিঙ্গনাবদ্ধ দুইটি তরুণ তরুণীর দগ্ধ প্রায় বীভৎস মৃত দেহ ছাড়া।

সকলে বলিল, বোধ হয় বেশী মাতাল হয়ে পড়েছিল। গেছে, বালাই গেছে।

কল্পনা

শ্রীঅদিতি দেবী

স্তব্ধ নীরব গৃহ !

ঘরের নীল পর্দ্দাটি ঈষৎ সরাইয়া সুনীতি বিষণ্ণ মুখে ভিতরে প্রবেশ করিল। এবং রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া, হাত বুলাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছ ভাই ?

ভাল।

খানিক নীরব থাকিয়া কল্পনা ডাকিল, বৌঠান !

কি ভাই ?

জীবনের কোন্ দিন থেকে যে আমরা দুটিতে পাশাপাশি হ'য়ে চ'ল্‌তে আরম্ভ ক'রেছিলুম ঠিক মনে পড়ে না ! তার মধ্যে যদি কিছু ভুল বা অন্যায় ক'রে থাকি, ক্ষমা ক'রতে পারবে তো ?

ওসব কি কথা ব'লছ ভাই ? দেখেছ, আজ কি রকম মেঘ ক'রেছে ? বোধ হয় বৃষ্টি হবে।

আবার চারি দিক নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল ! যেন সেই নীরবতা—তার শব্দহীন ভাষায় কি এক ভাবী বিপদের কথা জানাইয়া দিতেছিল !

বিনয় কল্পনার রোগপাণ্ডুর ললাট হইতে রুক্ষ চুলগুলি সরাইয়া মুখে ও মাথায় হাত বুলাইতেছিল।

দাদা !

আরও কাছে সরিয়া আসিয়া বিনয় সস্নেহে বলিল, কেন বোন ? এই যে আমি তোমার কাছেই ব'সে আছি।

আজ দু'দিন আমরা মুঙ্গেরে এসেছি—না ?

হাঁ। এখানে এসে একটু ভাল আছ তো ?

হঠাৎ দ্বারের কাছে কাহাকে দেখিয়া বিনয় বলিয়া উঠিল, এ কি ! নিখিলেশ যে ? তুমি কবে এলে ?

এবং উঠিয়া গিয়া বন্ধুকে ঘরের ভিতর আনিয়া বসাইল।

সুনীতিকে নমস্কার করিয়া নিখিল শয্যার দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। প্রথমে তো সে বিশ্বাসই করিতে পারে নাই যে, ওই যে শীর্ণ দুর্ব্বল দেহটি বিছানার উপর পড়িয়া আছে, তাহা কল্পনারই। ভীত শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অসুখ ক'রেছে ?

ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা টানিয়া সে উত্তর করিল, হুঁ। আপনি আছেন কেমন ? খুব তো এবার পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, কখন্ কোথায় থাকেন কিছু খোঁজই পাওয়া যায় না আর।

জানেন তো, ছন্নছাড়া হ'য়ে ঘুরে বেড়ান যেন আমার একটা স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ? এবং তাই একজায়গায় আর কোথাও টিকে থাকতে পারি না !

আপনার জন্যে আমি একটি জিনিষ রেখেছিলুম। কি ব'লতে পারেন ?

বোধ হয় অমূল্য কিছুই হবে। কিন্তু সেটি অতীতে গিয়ে দাঁড়াল কেন ?—বর্ত্তমানে কি আর সেই 'রাখার' আশাটি রাখতে পারি না ?

ম্লান হাসি হাসিয়া কল্পনা বলিল, আপনি আশা করবার ঢের আগেই তা' দেওয়া হয়ে গেছে—তবে সেটি এমন বিশেষ কিছুই নয়, আমার একটি পুরাণ বীণা। আপনি একজন বীণা-বাজিয়ে, তাই আশা ছিল আপনার নিপুণ হাতে বেজে উঠে এর সুরে এক দিন বিশ্বকে মোহিত ক'রে দেবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় নিখিলবাবু, আজ সে বীণার সব-কটা 'তার'ই ছিঁড়ে গেছে। আর বুঝি তাতে কোন সুর-ই বাজবে না ! তাই বলি, আজ ওই ভাঙা বীণা নিয়ে কাজ নেই, তার চেয়ে যে দিন নূতন 'তার চ'ড়ে তা'তে আবার নূতন সুর বেজে উঠবে—সেই দিন নেবেন।

গৃহসুদ্ধ লোক স্তব্ধ ! নির্ব্বাক !

কল্পনার কথাগুলি যেন তাহার চারিদিকের মনে কি এক বিষাদের করুণ রাগিণী বাজাইয়া দিয়া গেল !

সে সুর নিখিলেশের প্রাণের 'তারে' গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, যখন নাকি এই অকস্মাৎ আঘাতের জন্য তারা ঠিক মত বাঁধা ছিল না! এবং তাই, সবগুলো এক সঙ্গে যেন বেসুরো কান্নার মত হইয়া বাজিয়া উঠিল! সে বলিল, দিন্ না। আমারও বীণার বড় সখ। 'তার' না থাকে তো চড়িয়ে নেবো'খন। আমারও তাহ'লে এই ভবঘুরে জীবনটার একটা কিনারা হয়, ঘরের কোণে নিশ্চিন্ত মনে ব'সে একটু গাইবার।

বোঠান?

বল।

বীণাটি দেবে?

সুনীতি উঠিয়া গিয়া বীণাটি তাহার কাছে আনিল।

শীর্ণ দুর্ব্বল দুটি হাতে বীণাটি লইয়া নিখিলের দিকে বাড়াইতে চাইল—কিন্তু পারিল না! নিখিল তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া তাহার দুর্ব্বল, কম্পিত হস্ত হইতে বীণাটি তুলিয়া লইল।

পূজার অর্ঘ্যের মত দুই জল ভরা-চোখের চাহনি দিয়া কল্পনা বলিল, ভাঙা হ'লেও বীণাটি আমার বড় আদরের নিখিলবাবু!

সেই সময় দূর হইতে গান ভাসিয়া আসিতেছিল, 'আমার যাবার বেলা পিছু ডাকে!' সে সুর বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া কল্পনার কানে কানে বলিয়া যাইতে লাগিল—'পিছু ডাকে!' তাহার সারা প্রাণ সেই সুরে সুর মিলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—'পিছু ডাকে!' 'পিছু ডাকে!'

দুর্ব্বল শরীরের অত্যধিক পরিশ্রমে তাহার বক্ষ বড় বেশী দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল।

হঠাৎ সে 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিয়া বিনয়ের গলা জড়াইয়া ধরিতে গিয়া তাহার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরটা যেন নীরবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। —এ কি! সব শেষ হ'য়ে গেল? ঘরে বাহিরে আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি বলিয়া গেল—শেষ হ'য়ে গেল!

নাবিক

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

কবে তব হৃদয়ের নদী
বরি' নিল অসম্বৃত সুনীল জলধি!
—সাগর-শকুন্ত সম উল্লাসের রবে
দূর সিন্ধু-ঝটিকার নভে
বাজিয়া উঠিল তব দুরন্ত যৌবন!
—পৃথ্বীবেলাকূলে বসি কেঁদে মরে আমাদের শৃঙ্খলিত মন!
কারাগার মর্ম্মরের তলে
নিরাশ্রয় বন্দীদের খেদ-কোলাহলে
ভ'রে যায় বসুধার আহত আকাশ!
অবনত শিরে মোরা ফিরিতেছি ঘৃণ্য বিধিবিধানের দাস!
—সহস্রের অঙ্গুলি-তর্জ্জন
নিত্য সহিতেছি মোরা, বারিধির বিপ্লব গর্জ্জন
বরিয়া লয়েছ তুমি,—তারে তুমি বাসিয়াছ ভালো;
তোমার পঞ্জরতলে টগ্‌বগ্ করে খুন্—দুরন্ত ঝাঁঝালো!
তাই তুমি পদাঘাতে ভেঙে গেলে অচেতন বসুধার দ্বার!

অবগুণ্ঠিতার
হিমকৃষ্ণ অঙ্গুলির কঙ্কালপরশ
পরিহরি গেলে তুমি,—মৃত্তিকার মন্ত্রহীন রস
তুহিন নির্ব্বিষ নিঃস্ব পানপাত্রখানা
চকিতে চুর্ণিয়া গেলে,—সীমাহারা আকাশের নীল শামিয়ানা
বাড়ব আরক্ত স্ফীত বারিধির তট,
তরঙ্গের তুঙ্গ গিরি—দুর্গম সঙ্কট,
তোমারে ডাকিয়া নিল মায়াবীর রাঙামুখ তুলি'!
নিমেষে ফেলিয়া গেলে ধরণীর শূন্য ভিক্ষাঝুলি!
প্রিয়ার পাণ্ডুর আঁখি অশ্রু-কুহেলিকা মাখা গেলে তুমি ভুলি!
ভুলে গেলে ভীরু হৃদয়ের ভিক্ষা, আতুরের লজ্জা অবসাদ,
অগাধের সাধ
তোমারে সাজায়ে দেছে ঘরছাড়া ক্ষ্যাপা সিন্দবাদ!
মণিময় তোরণের তীরে
মৃত্তিকার প্রমোদ-মন্দিরে
নৃত্য গীত হাসি অশ্রু উৎসবের ফাঁদে
হে দুরন্ত দুর্নিবার, প্রাণ তব কাঁদে!
ছেড়ে গেলে মর্ম্মন্তুদ মর্ম্মর বেষ্টন!
সমুদ্রের যৌবন গর্জ্জন
তোমারে ক্ষ্যাপায়ে দেছে, ওহে বীর-শের!
টাইফুন-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছ অতীত, আখের!
হে জলধি-পাখী,
পক্ষে তব নাচিতেছে লক্ষ্যহারা দামিনী বৈশাখী!
ললাটে জ্বলিছে তব উদয়াস্ত-আকাশের রত্নচূড় ময়ূখের টিপ্!
কোন্ দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ
করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে!
বিচিত্র বিহঙ্গ কোন্ মণিময় তোরণের দ্বারে
সহর্ষ নয়ন মেলি হেরিয়াছ কবে!
কোথা দূর মায়াবনে পরীদল মেতেছে উৎসবে,—
স্তম্ভিত নয়নে
রহস্যের নীল-বাতায়নে
তাকায়েছ তুমি!
অতিদূর আকাশের সন্ধ্যারাগ-প্রতিবিম্বে প্রস্ফুটিত
সমুদ্রের আচম্বিত ইন্দ্রজাল চুমি'
সাজিয়াছ বিচিত্র মায়াবী!
সৃজনের যাদুঘর রহস্যের চাবি
আনিয়াছ কবে উন্মোচিয়া
হে জল-বেদিয়া!
অলক্ষ্য বন্দরপানে ছুটিতেছ তুমি নিশিদিন
সিন্ধু-বেদুঈন!
নাহি গৃহ, নাহি পান্থশালা!
—লক্ষ লক্ষ উর্ম্মি নাগবালা
তোমারে নিতেছে ডেকে রহস্য-পাতালে!
বারুণী যেথায় তার মণিদীপ জ্বালে
প্রবাল-পালঙ্ক-পাশে মীননারী ঢুলায় চামর!—
সেই দুরাশার মোহে গেছ ভুলে পিছু ডাকা স্বর,
ভুলেছ নোঙর!
কোন্ দূর কুহকের কূল
লক্ষ্য করি ছুটিতেছে নাবিকের হৃদয়-মাস্তুল
কে বা তাহা জানে!
অচিন্ আকাশ তারে কোন্ কথা কয় কানে কানে!

রমাঁ রলাঁ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রভাত

[শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী কর্ত্তৃক অনূদিত]

সংসারের গুরুভার বালক ক্রিস্তফ্ বীরের মত বহন করিতে অগ্রসর হইল। কাহারও সাহায্য লইতে সে পারে না। তার আত্মমর্য্যাদায় ঘা লাগে; সুতরাং সে একাই সব মাথায় করিয়া চলিতে প্রতিজ্ঞা করিল। শিশুকাল হইতে সে দেখিয়া আসিতেছে তার মা পরের কাছে সাহায্য লইয়া, সাহায্য ভিক্ষা করিয়া আসিতেছে; ক্রিস্তফ্ সেই অপমানে বিষম যন্ত্রণা পাইয়া আসিয়াছে। লুইসা যখন কোন ধনী মহিলার দান লইয়া উৎফুল্লচিত্তে বাড়ী ফিরিত, ক্রিস্তফ্ প্রায় ঝগড়া বাধাইয়া বসিত; লুইসার কাছে এটা কোন দোষের কথাই নয় বরং তার ছেলের ভার যে একটু কমাইতে পারিতেছে, তার সামান্য খাওয়া দাওয়ার মধ্যে দু'একটা ভাল জিনিষ দিতে পারিতেছে—ইহাতে মা খুশী! কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ক্রিস্তফ্ কেমন যেন মনমরা হইয়া থাকিত, সারা সন্ধ্যা কথা কহিত না এবং বাহির হইতে সংগৃহীত খাদ্যাদি স্পর্শ করিত না; লুইসা ইহাতে বিরক্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিত—খাওয়াইতে জেদ করিত কিন্তু ক্রিস্তফ্ চুপ করিয়া থাকিত, তাকে টলান শক্ত; লুইসা শেষে হয় ত চটিয়া কটুক্তি করিত এবং ছেলেটিও পাল্টা জবাব দিতে ছাড়িত না। রাগ চড়িয়া গেলে সে হয় ত তার ন্যাপ্কিন-খানা টেবিলে ফেলিয়া উঠিয়া যাইত। তার বাবা বিরক্ত হইয়া তাকে "ন্যাকা" বলিত এবং ভাইগুলো হাসিতে হাসিতে ক্রিস্তফের খাবার খাইয়া ফেলিত।

যাহোক সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় ত করিতে হইবে; যন্ত্র-সঙ্গতের দরুণ যেটুকু মাহিনা সে পাইত তাহা যথেষ্ট নয়; সুতরাং সে ছাত্র পড়ান শুরু করিল; যন্ত্রী-হিসাবে তার বেশ প্রতিভা, তার সুনাম, এবং সর্ব্বোপরি ডিউকের অনুগ্রহ—এই সব কারণে মধ্যবিত্ত বাড়ীর অনেক ছাত্র-ছাত্রী সে পাইত; প্রত্যহ সকাল নয়টা হইতে সে ছোট মেয়েদের পিয়ানো শিখাইত; তার মধ্যে দু'একটি মেয়ে ক্রিস্তফের চেয়ে বয়সে বড়; তারা তাদের হাবভাব ভঙ্গীমার চোটে ক্রিস্তফ্‌কে ভয়ে অস্থির করিয়া দিত; সে তাদের ভুল বাজনায় প্রায় ক্ষেপিয়া যাইত। মেয়েগুলি সঙ্গীতের বেলা একেবারে নিরেট কিন্তু হাসি-ঠাট্টায় প্রত্যেকেই পাকা ওস্তাদ; ক্রিস্তফের এতটুকু বিসদৃশ ভাবও তাদের বিদ্রূপ দৃষ্টিকে এড়াইত না। বেচারা যন্ত্রণায় ছটফট করিত; সে মুখ লাল করিয়া কাঠ হইয়া চেয়ারে বসিত; রাগে তার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইত তবু কথা বলিতে সাহস পাইত না; পাছে কথা বলিতে কিছু একটা বোকামা করিয়া বসে সেই ভয়ে সে নিজেকে সংযত করিত; নিজের কণ্ঠস্বর শুনিতে সে যেন ভয় পাইত; সুতরাং একটা

কথাও বলিত না। সে যেন খুব কড়া লোক এমনি ভাব মধ্যে মধ্যে দেখাইত অথচ বেশ জানিত যে, ছাত্র-ছাত্রীরা আড় চোখে তাহাকে দেখিতেছে! সুতরাং কথার মাঝে সে গোলমাল করিয়া ফেলিত এবং সে যে দমিয়া গেছে সেটা প্রকাশ করিয়া বসিত। পাছে লোকে তাকে দেখিয়া হাসে এই ভয়েই সে লোককে হাসাইয়া তুলিত অথচ হাসির ফোয়ারা ছুটিলে সে চীৎকার করিয়া এক কাণ্ড বাধাইত। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর দল তার প্রতিশোধ সহজেই লইত; কেমন একরকম করিয়া তাকাইয়া। অতি সাধাসিধা দু'একটা প্রশ্ন করিলেই ক্রিস্তফ্ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত; অথবা তারা ভান করিত যেন ঘরের ও-ধারে কিছু একটা জিনিষ ফেলিয়া আসিয়াছে; ক্রিস্তফ্‌কে সেটা আনিয়া দিতে অনুরোধ করিত; কি বিষম পরীক্ষা! সে ঘরের মধ্যে হাঁটিতে শুরু করিলেই সকলের করতালী বিদ্রূপভরা দৃষ্টি যেন আগুনের মত পিছন হইতে তাকে পোড়াইত; তার চলা-ফেরার এতটুকু অসঙ্গতি, তার হাত পায়ের আড়ষ্ট ভাব—সব যেন তারা নির্ম্মম পরিহাসের সঙ্গে দেখিতেছে। লজ্জায় ক্রিস্তফের শরীর যেন অচল হইয়া উঠিত।

শিক্ষাদান শেষ করিয়া সে রিহার্শেল দিতে ছুটিত। প্রায়ই খাবার সময় হইত না; সে পকেটের মধ্যে কিছু আহার্য্য লইয়া যাইত ও অবসর মত খাইত। মধ্যে মধ্যে প্রধান যন্ত্রী নিজের স্থানে ক্রিস্তফ্‌কে রিহার্শেলে সঙ্গত পরিচালক করিয়া শিক্ষা দিতেন কারণ তাকে তিনি স্নেহ করিতেন। তাছাড়া ক্রিস্তফের নিজের সঙ্গীত চর্চ্চাও ছিল। সন্ধ্যায় অভিনয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আবার ছাত্রদের শিক্ষা দান এবং অভিনয়ের পর প্রায়ই প্রাসাদে বাজাইবার ডাক আসিত, সেখানে ঘণ্টা দুই বাজনা চলিত; রাজকুমারী ভাবিতেন, তিনি সঙ্গীত বেশ বোঝেন। তিনি সঙ্গীত ভালবাসিতেন বটে কিন্তু ভাল ও মন্দের তারতম্য কোথায় জানিতেন না, সুতরাং তিনি আজগুবী রকম বাজনার ফরমাস করিতেন এবং ক্রিস্তফের অদৃষ্টে বড় বড় আলাপের সঙ্গে অতি খেলো গৎ সব বাজাইবার হুকুম আসিত। রাজকুমারীর সব চেয়ে আনন্দ ছিল ক্রিস্তফ্‌কে নূতন তান রচনা করিয়া বাজাইতে প্রণোদিত করা। কিন্তু এমন সব তানের টুকরা তিনি বাছিয়া দিতেন যার অসহ্য ন্যাকামীতে ক্রিস্তফ্ বিরক্ত হইত, বুঝিতে পারিত না কেমন করিয়া তান বিন্যাস করিবে।

প্রায় মধ্যরাত্রে যখন ক্রিস্তফ্ ছুটী পাইত তখন শরীর তার অবসন্ন, হাত জ্বালা করিতেছে, মাথা ধরিয়াছে, পেট চুঁই চুঁই করিতেছে, বাহিরে বরফ পড়িতেছে—কুয়াসা বিষম ঠাণ্ডা অথচ ভিতরে ক্রিস্তফ্ ঘামিয়া উঠিতেছে! সারা শহরটা পায়ে হাটিয়া যখন সে বাড়ী ফেরে তার যেন দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায়, তবু সাবধান হইতে হয়, পাছে একটি মাত্র ভাল সান্ধ্য পোষাক কাদার ছিটা লাগিয়া নষ্ট না হয়। বাড়ীতে আসিয়া তার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, বিছানায় পড়িয়া কাঁদে ও ক্রমশ ঘুমাইয়া পড়ে।

কিন্তু যে ঘরে সে শোয় সেখানেও সে একা নয়; তার ভায়েরা সেই ঘরে ঘুমায়; ছোট্ট ঘরের বদ্ধ অপ্রীতিকর গন্ধ, তার মধ্যে সে তার দুঃখের জোয়াল পোষাকপত্র যখন খোলে ক্রিস্তফের মনে হয় যেন নৈরাশ্যে ও বিতৃষ্ণায় সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ভাল করিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িবার মত ধৈর্য্যও তার থাকিত না; বালিশে মাথা দিতে না দিতেই সে গভীর নিদ্রায় অচেতন হইত, তার সমস্ত বেদনার বোধ লোপ পাইত।

কিন্তু আবার প্রত্যুষে ওঠা, শীতে রাত থাকিতে বিছানা ছাড়া! উপায় নাই, কারণ তার নিজের যন্ত্রাদি সাধাও যে দরকার; সকাল পাঁচটা হইতে আটটার মধ্যেই তার যা একটু নিজের সময় ছিল। কিন্তু সে সময়টুকুর খানিকটা নষ্ট হইত ফরমাসী কাজে! ডিউকের প্রাসাদের বাজিয়ে ও তাঁর পেয়ারের যন্ত্রী হবার দায় বড় কম্ নয়; রাজবাড়ীর উৎসবাদির জন্য কেতাদুরস্ত রচনা করিয়া রাখিতে হইত।

এমনি ভাবে তার জীবনের উৎসটি যেন বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল। স্বপ্নরাজ্যে পলাইয়া একটু শান্তি পাইবার স্বাধীনতাও যেন তার ছিল না। তবু সেই সমস্ত বাধা তার শক্তিকে বাড়াইয়া চলিল। কর্ম্মের পথে প্রতিবন্ধক যত কম মানুষের কর্ম্ম-প্রেরণা ততই সঙ্কীর্ণ। দুশ্চিন্তা ও অপ্রিয় কাজের চাপ যতই বাড়ে তার বিদ্রোহী মন ততই স্বাধীন হইতে চায়। বাধাহীন জীবনে সে খুব সম্ভব অদৃষ্টের হাতে

নিজেকে ছাড়িয়া দিত। দিনে দু এক ঘণ্টা মাত্র নিজেকে স্বাধীন অনুভব করিবার সুযোগ পাওয়ায় সেই ক্ষুদ্র অবসরটুকুর মধ্যে তার সমস্ত নিরুদ্ধ শক্তি পর্ব্বত-বর্ত্মবাহিনী নদীর মত প্রবল বেগে ছুটিত। শিল্পীর জীবনে এই সাধনার মস্ত বড় স্থান আছে; শক্তি অটল সীমার মধ্যে বদ্ধ হয় বলিয়াই তাহা সংহত ও প্রবল হইয়া উঠে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুঃখ বেদনা শুধু শিল্পীর চিন্তাকে নয় তার রীতিও শীল-কেও (Style) গঠন করে; ইহাতে শুধু শরীর নয় মনও সংযমের সার্থকতাটি বুঝিতে শেখে। সময় যখন অল্প, বাক্য যখন ছন্দবদ্ধ তখন বাজে বকিবার অবসর থাকে না এবং মানুষ শুধু আসল কথাগুলি বলিয়া যাইবার শিক্ষা লাভ করে। এইরূপে বাঁচিবার সময় কম বলিয়াই বাঁচার দ্বিগুণ আনন্দ মানুষ পাইতে পারে।

ক্রিস্তফের জীবনে তাহাই ঘটিল; অধীনতার জোয়াল কাঁধে করিয়াই সে স্বাধীনতার স্বাদ পূরামাত্রায় পাইল। বাজে কাজে বা কথায় সে তার জীবনের অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি নষ্ট করিত না। তার ঝোঁক ছিল চিন্তার সরল আবেগে, খেয়ালের বশে দেদার রচনা করিয়া যাওয়া। বর্জ্জন করিয়া বাটিয়া লইবার ধৈর্য্য না থাকা একটা মস্ত দোষ; তার সংশোধন হওয়া কঠিন হইত যদি না অত্যল্প সময়ে অনেকখানি স্থায়ী ভাবকে রূপ দিবার চাপ ক্রিস্তফের জীবনে না আসিত। এই চাপের চেয়ে বড় প্রভাব তার মানসিক বা নৈতিক জীবনে আর কিছু ছিল না; এটি না থাকিলে তার গুরুদের শিক্ষা, বা বড় বড় শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন ক্রিস্তফ্‌কে সাধনা ও সার্থকতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিত না। যে বয়সে তার চরিত্র গঠিত হইতেছিল সেই বয়সেই সে শিক্ষা করিল যে, সঙ্গীত একটি সুসংযত ভাষা যার প্রত্যেক কথার একটি অর্থ আছে; সুতরাং এই বয়সেই ক্রিস্তফ্ কিছু বলিবার না থাকিলেও রচনা করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

তবু যে সমস্ত রচনা এখন সে করিত তাহা পূর্ণরূপে ক্রিস্তফের ভাব প্রকাশ করিতে পারিত না, কারণ সে নিজেই নিজেকে তখনও ভাল করিয়া আবিষ্কার করে নাই। সে তখনও পরের কাছে অর্জ্জিত ভাবের ভিতর দিয়া নিজেকে খুঁজিতে চিনিতে চেষ্টা করিতেছিল, কারণ এই সব পরের চাপান চিন্তা ও ভাবের বোঝাই শিশুর শিক্ষার প্রধান উপাদান—প্রায় তার প্রকৃতির দ্বিতীয় আবেষ্টন বলিয়া আমরা মানিয়া লইয়াছি! এ পর্য্যন্ত ক্রিস্তফ্ শুধু মধ্যে মধ্যে তার আসল ব্যক্তিত্বটির আভাষ মাত্র পাইয়াছে; কারণ যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রবল আবেগের বান ডাকে তাহা এখনও সে অনুভব করে নাই, এই প্রচণ্ড আবেগ ব্যক্তিত্বের উপর যত ধারকরা পোষাক চাপিয়া আছে সব ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়; বজ্র যেমন আকাশের ঘন বাষ্পকে বিদীর্ণ করে, যৌবনও ব্যক্তিত্বের বিকাশে তেমনি সাহায্য করিয়া থাকে। ক্রিস্তফের মনে এখন অতীতের কত অদ্ভুত স্মৃতির সঙ্গে কত অস্পষ্ট অথচ প্রবল প্রেরণা মিশিয়া যায়; সে আর তাহাদের ঠেকাইতে পারে না। সেই অসত্য জোড়াতালিগুলো তাকে কষ্ট দেয়; যাহা সে ভাবিতেছে তাহার তুলনায় যাহা সে রচনা করিতেছে সেগুলো কি নিকৃষ্ট! নিজের শক্তির প্রতি তার গভীর সন্দেহ জাগে; অথচ নির্ব্বোধের মত পরাজয় স্বীকার করিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। আরো ভাল করিয়া কত জিনিষ রচনা করিতে সে ছট্‌ফট করিত কিন্তু প্রায়ই নিষ্ফল হইত। রচনার সময় ক্ষণিক মোহে সে ভাবিত বুঝি একটা বড় রকম কিছু হইতেছে হঠাৎ সজাগ হইয়া দেখিত যে যাহা রচনা করিয়াছে তার কোনই মূল্য নাই! রাগে কাগজ পত্র ছিঁড়িয়া সে পোড়াইতে বসিত। অথচ দরবারের আদেশ মত যে সব ফরমাসী রচনা সে লিখিয়াছে সেগুলো নষ্ট করিবার হুকুম নাই সুতরাং সেই কাঁচারচনাগুলো যেন তার আত্মনির্ব্বেদের নিদর্শন হইয়া তার ঘরে সাজান থাকিত এবং সর্ব্বদা বিষম পীড়া দিত। কবে রাজকুমারের জন্মদিনে অথবা রাজকুমারীর বিবাহ-উৎসবে ক্রিস্তফ্ যে সব আবর্জ্জনা রচনা করিয়াছে সেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঁধাই ও স্বর্ণাক্ষর খচিত হইয়া যেন তার নিরেট বুদ্ধির জয়স্তম্ভ হইয়া চিরকাল বিরাজ করিবে! বেচারা ক্রিস্তফ্! সে আবার 'চিরকালে' বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে সুতরাং সে নৈরাশ্যে অধীর হইয়া কাঁদিতে বসিত।

কি বিষম দিনগুলো! সে যেন বিকারের ঝোঁকে ছুটিয়াছে, বিশ্রাম নাই, ছুটি নাই, খেলা বন্ধু বান্ধব—যা কিছু এই অসহ্য একঘেয়ে খাটুনীর মধ্যে একটু শান্তি দেয়— তার কিছুই নাই! কেমন করিয়া থাকিবে? বিকালে যখন অপর ছেলেরা খেলা করে তখন ক্রিস্‌তফ্ টিমটিমে আলোয় ধূলোভরা রিহার্শেল ঘরে ঘাড় গুঁজিয়া ভ্রুকুটি করিয়া বাজাইতেছে। রাতে যখন অন্য ছেলেরা বিছানায় শুইয়াছে তখনও ক্রিস্‌তফ্ শ্রান্তিতে ঢুলিতে ঢুলিতে চেয়ারে বসিয়া বাজাইতেছে!

ভাইগুলোর সঙ্গেও ভাব নাই। এক ভাই আর্নেষ্ট যেমন দুর্দান্ত তেমনই পাজী? বয়স তার মাত্র বারো, পাড়ার যত বদ ছেলেদের সঙ্গে ঘুরিয়া শুধু তার ব্যবহার নয় স্বভাবটাও বদ হইবার জোগাড় হইয়াছে। সরল ক্রিসতফ্ হঠাৎ একদিন তার একটা আচরণ দেখিয়া চম্‌কাইয়া গেল। আর এক ভাই রডল্‌ফ ব্যবসা শিখিবে, সে থিওডোর কাকার প্রিয় ভাই-পো; সুতরাং সে ক্রিস্‌তফের শাসন মানিত না বরং নিজেকে তার চেয়ে একটা বড় জীব বলিয়া ভাবিত অথচ ক্রিসতফের উপার্জ্জিত অর্থে বেশ খাওয়াদাওয়া করিত। সে ছিল বাইরে ধীর ভিতরে ধূর্ত্ত। ক্রিস্‌তফের বিরুদ্ধে থিওডোর ও মেলশিয়রের যত অভিযোগ ছিল সবগুলির সে সমর্থন করিত এবং তাদের রচিত যত 'কেচ্ছা' সে প্রচার করিয়া বেড়াইত। থিওডোর কাকার নকলে রডল্‌ফও সঙ্গীত কলাকে ঘৃণা করিবার ভাণ করিত। ভাই-এরা কেউই সঙ্গীত পছন্দ করিত না। ক্রিস্‌তফ্ স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতি সুতরাং পরিবারের কর্ত্তা হিসাবে সে প্রায়ই ভাইএদের উপদেশাদি দিত; তার এই সর্দ্দারিটা তারা মোটেই পছন্দ করিত না, বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিত কিন্তু ক্রিস্‌তফ্ তার ঘুসির জোরে এবং ন্যায্য দাবীর বলে ভাইদের ঢিট্ করিয়া রাখিত। তারা অবশ্য যা খুশী তা করিতে ছাড়িত না; ক্রিস্‌তফের বিশ্বাস প্রবণতার সুযোগ লইয়া তারা যে সব ফাঁদ পাতিত ক্রিস্‌তফ্ প্রায়ই তার মধ্যে পড়িয়া যাইত। তাহা মিথ্যা কথা বলিয়া তাহারা দাদার কাছে টাকা আদায় করিত এবং আড়ালে হাসিত। ক্রিস্‌তফ্ প্রায় সর্ব্বদাই ঠকিত; সে এমনি ভালবাসার কাঙাল যে, একটা মিষ্টি কথা বলিলেই সে গলিয়া যাইত, তার সব রাগ উড়িয়া উবিয়া যাইত। একটু ভালবাসা দেখালেই সে ভায়েদের সব দোষ ক্ষমা করিয়া চলিত। কিন্তু এই বিশ্বাস তার নিষ্ঠুর ভাবে ভাঙিয়া দিত; একবার ঝগড়ার পর ক্রিস্‌তফের গলা জড়াইয়া তাকে আলিঙ্গন করিয়া ভাই দুটো ভণ্ডামীর পরাকাষ্ঠা করিল এবং সেই সুযোগে রাজকুমারের উপহার একটি সুন্দর সোনার ঘড়ি চুরি করিল; ক্রিস্‌তফ্ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে শুনিল যে, তারা তার নির্ব্বুদ্ধিতায় আড়ালে হাসিতেছে! সে তখন ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তেমনি ঠকিত; মানুষকে বিশ্বাস করা ও ভালবাসা যেন তার একটি দুরারোগ্য রোগ! সে সব বুঝিত এবং ভাইদের শয়তানী ধরা পড়িলে তাহাদিগকে খুব পিটিত কিন্তু তাই বলিয়া যখন তারা নূতন টোপ ফেলিত বঁড়শী গিলিতে ক্রিস্‌তফ্ বেশী দেরি করিত না।

আরো কঠিন দুঃখ তার অদৃষ্টে তোলা ছিল; হিতৈষী প্রতিবেশীদের কল্যাণে সে জানিত যে, তার বাবা তার নামে কুৎসা করিয়া বেড়াইতেছে! এতদিন ছেলের সাফল্যে গর্ব্ব অনুভব করিয়া এবং সর্ব্বত্র তার গর্ব্ব করিয়া মেলশিয়র এখন ঈর্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ছেলের শক্তিকে যতখানি খেলো করিতে পারা যায় তার জোগাড় করিতেছে। কী নীচতা! কাঁদিয়া কি হইবে? ক্রিস্‌তফ্ সব ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। বাবা নিজের অবনতিতে ক্ষেপিয়া গিয়াছে সেই তিক্ততার বশে কি করিতেছে সে নিজেই জানে না সুতরাং তার বিরুদ্ধে রাগ করিয়া লাভ নাই। ক্রিস্‌তফ্ পাছে কঠিন কিছু বলিয়া ফেলে এই ভয়ে বাবাকে কিছুই বলিত না কিন্তু মরমে মরিয়া যাইত।

সান্ধ্য ভোজনের জন্য সকলে সমবেত হইলে, সেই মিটমিটে আলো, অপরিষ্কার চাদরের উপর খাবার সাজান, সেই এক ঘেয়ে গাল গল্প, মুখের চপ্ চপ্ শব্দ সব দেখিতে দেখিতে ক্রিস্‌তফ্ অনুভব করিত সেই মানুষগুলোকে সে ঘৃণা করে, অনুকম্পা করে, আবার ভালও বাসে! শুধু তার সঙ্গে তার মা'র একটা গভীর সম্বন্ধ আছে সেটা বুঝিত। কিন্তু ছেলের মত মাও সারাদিন খাটিয়া এত শ্রান্ত হইয়া ফিরিত যে, প্রায় কথা বলিতে পারিত না এবং খাবার পর

ছেঁড়া পোষাক মেরামত করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত। লুইসা এতই স্নেহশীলা যে, তার সেই স্বামীরত্নটি ও ছেলেদের মধ্যে স্নেহে কোন পার্থক্য অনুভব করিত না; সকলকেই সমান ভালবাসিত। এ সময় ক্রিস্তফ্ যে একজন বিশেষ বন্ধু একজন আপনার দরদী মানুষকে খুঁজিতেছিল, লুইসা সে স্থান পূরণ করিতে পারিল না।

সুতরাং সে নিজের মধ্যে নিজের আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। কত দিন গিয়াছে সে একটা কথাও বাড়ীর লোকদের সঙ্গে বলে নাই, শুধু একটা চাপা রাগের বোবা গর্জ্জনে যেন তার সেই কঠোর শ্রান্তিকর কর্ত্তব্যভার সে বহন করিয়া চলিত। তার সেই সঙ্কটময় বয়সে যখন ভালমন্দ দুই দিকেই তার অনুভূতি অত্যুগ্র, যখন সহস্ররকম ধ্বংসের সম্ভাবনা তাহাকে ঘেরিয়া আছে—তখন এভাবে চলিলে ক্রিস্তফ্ চিরজীবনের মত ভিতরে ভিতরে পঙ্গু বিকলাঙ্গ হইয়া যাইতে পারে। তার স্বাস্থ্য বেশ খারাপ হইল।

পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে সে পাইয়াছিল একটি মজবুত স্বাস্থ্যপূর্ণ শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্যের আধিক্যই তার ভিতরটা জখম করিতে লাগিল; অল্পবয়সে দুশ্চিন্তার চাপ আরও বেশী অনিষ্ট করিল; তার নানাবিধ স্নায়বিক বিকার দেখা দিল। শৈশবে কোন কাজে বাধা পাইলে তার ফিট হইত; সাত আট বছর বয়সে তার ঘুমের নানা ব্যাঘাত হইত; ঘুমের মধ্যে সে হাসিত কাঁদিত; যখনই বেশী ভাবনা চিন্তা পড়িত, সেই রোগটা তখন আবার ফিরিয়া আসিত। সময় সময় তার বিষম মাথা ধরিত, মাথা ভারি লাগিত, চোখ ব্যথা করিত, যেন কেউ গরম ছুঁচ চোখে ফুটাইতেছে। হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া যাওয়ায় তাকে পড়া বন্ধ করিতে হইত। অসময়ে অন্ন ও এলোমেলো খাওয়ায় তার পরিপাক শক্তি মন্দ হইতেছিল, ক্রমশ পেটের পীড়া দেখা দিল। কিন্তু সে সব চেয়ে কষ্ট পাইত বুকের অসুখে; কখনও বুকটা বিষম ধড়ফড় করিত, কখনও যেন থামিয়া যাইত! রাতে গায়ের তাপ কত রকমে বাড়িত কমিত; একবার গা জ্বালা করে, আবার শীতে কাঁপে; তার গলা শুকাইয়া যায়; গলায় কি একটা আটকাইয়া যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়। কল্পনায় সে বিভীষিকা দেখিতে থাকে; নিজের মনে কত ভীষণ পরিণামের কথা ভাবিয়া সে নিজকে যেন হত্যা করিতে থাকে অথচ সেই যন্ত্রণার কথা বাড়ীর কাহাকেও বলে না। সে স্থির করিয়া বসে যে, তার একে একে সব অসুখ করিতেছে। একবার ভাবে সে কাণা হইয়া যাইবে; আবার হাঁটিতে হাঁটিতে মাথা ঘুরিলে ভাবে সে বুঝি পড়িয়া মরিবে। অসময়ে চলিতে চলিতে মরার আতঙ্ক যেন সর্ব্বদা তাকে আকুল করিত; 'যদি মরিতেই হয় ভগবান এখন যেন না মরি—একবার জয়ের আস্বাদ পাইয়া তারপর—'।

জয়! জয়ের প্রেরণা তার অজ্ঞাতসারে সারাক্ষণ তার প্রাণে যেন জ্বলিত; সমস্ত বিতৃষ্ণা, অবসাদ ও রুদ্ধ পঙ্কিল জীবনের যাতনার মধ্যে ঐ জয়ের আশা তাকে নির্ভয় দিত। সে যাহা হইয়া উঠিয়াছে, যাহা হইবে তার পূর্ব্বাভাষ যেন অস্পষ্টভাবে নাড়া দিত। কে সে? একটা রুগ্ন ছেলে—যে সঙ্গতে বেহালা বাজায় আর বাজে গৎ রচনা করে? না! ওটা ত বাইরের খোলশ—একদিনের পোষাক মাত্র। ওটা তার আসল সত্বা নয়; তার গভীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এখনকার মূর্ত্তি ও চিন্তার কোন যোগ নাই সে নিজে তা বোঝে। আর্শিতে মুখ দেখিয়া সে নিজেকে চিনিতে পারে না; ঐ যে চওড়া লাল মুখ, বড় বড় ভুরু, বসা চোখ, ছোট নাক, বিষণ্ণ মুখশ্রী—ঐ কুৎসিৎ মুখোসটা তার কাছে যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। তেমনি নিজের রচনায়ও ক্রিস্তফ্ আপনাকে পায় না! সে বিচার ক'রে ও বোঝে যে সে আজ যাহা হইয়াছে এবং সে যা আজ করে তা কিছুই নয়। অথচ সে ভবিষ্যতে কি হইবে কি করিবে সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। এই নিরুদ্বেগ ভাবটাকে সে মধ্যে মধ্যে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে যায়, নিজেকে হেয় প্রমাণ করিয়া ও যন্ত্রণা দিয়া নিজের শাস্তি বিধান করে; তবু ঐ নিশ্চয়তা থাকিয়া যায়, কিছুতেই বদলায় না! সে যাহা কিছু করে ভাবে, লেখে কিছুতেই তার আসল সত্বার প্রকাশ হয় না। তার কেমন যেন মনে হয় যে, সে আজ যাহা আছে তাহাতে নয়, কাল যাহা সে হইবে তাহাতেই তার সত্বা পূর্ণতর হইয়া আছে। সেই বিশ্বাসে সে জ্বলিয়া উঠে, সেই আলোর নেশায় সে মাতিয়া উঠে! হায় এই লক্ষ্মীছাড়া "আজ"টা যদি পথ-রোধ না করিত! এই আজটা দিনের পর দিন যে ফাঁদ

পাতিয়া তাকে বাধা দিতেছে, যদি কোন ক্রমে সেটা ক্রিস্তফ্ এড়াইতে পারে?

এমনিভাবে সে দিনের সমুদ্রে তার জীবন-তরীখানি বাহিয়া যায়—ডাইনে বাঁয়ে তাকায় না, চুপ করিয়া হাল ধরিয়া দিগন্তের দিকে চাহিয়া থাকে—ঐ যে চরম আশ্রয়—ঐ যে পরম সমাপ্তি! ঐ ভবিষ্যত—যাহা একটি ধূলিকণার আঘাতে হয় ত চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে—ঐ ভবিষ্যতের মধ্যেই সে সত্য বাঁচিয়া আছে, সঙ্গতে মুখর যন্ত্রীদের মধ্যে, বাড়ীতে আত্মীয়দের মধ্যে প্রাসাদের বারমাসী বাজনার অন্যমনস্কতার মধ্যে ক্রিস্তফ্ ভাবে শুধু এক কথা—ভবিষ্যৎ—ঐ সুমোহন ভবিষ্যৎ!

* * *

আর ছোট্ট বদ্ধ ঘরের মধ্যে পুরাণ পিয়ানোটির পাশে ক্রিস্তফ্ বসিয়া আছে—একা! রাত্রি নামিতেছে. দিনের মৃত্যু যেন তার তানের মধ্যে ছায়া ফেলিয়াছে। অস্তরবির শেষ রশ্মিরেখাটি পর্য্যন্ত সে স্বরলিপি পড়িতেছে আর বাজাইতেছে। কত উদার প্রেমিকহৃদয় যাহা আজ মৃত তাহাই ঐ মূক স্বরলিপির ভিতর দিয়া যেন তাদের প্রাণের প্রেমকে উৎসারিত করিতেছে—ক্রিস্তফের বুক ভরিয়া গেল, তার চোখ জলে উপ্‌ছাইয়া পড়িল! সে অনুভব করিল যেন কোন এক অচেনা অজানা প্রিয় তার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তার হাত দুখানি ক্রিসতফের গলায়—তার আকুল নিশ্বাস ক্রিস্তফের মুখে! সে চমকিয়া ফিরিল, অনুভব করিল, সে একা নয়। একজন তার কাছে আছে যে তাকে ভালবাসে, সেও যাকে ভালবাসে এবং সে তাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে পায় না বলিয়া গুমরিয়া কাঁদে, তবু সেই বিষাদের ছায়া তার সেই অপূর্ব্ব উন্মাদনার মধ্যে যেন কি এক নিবিড় মাধুর্য্য মিশাইয়া দেয়! বিষাদেরও দীপ্তি আছে। ক্রিস্তফ্ তার প্রিয় সঙ্গীত-গুরুদের কথা ভাবে—সেই মনীষীরা কবে চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু যে সঙ্গীতের মধ্যে তাঁরা একবার প্রাণ ঢালিয়াছেন তার মধ্যে আজও তাঁরা বাঁচিয়া আছেন। ক্রিস্তফের প্রাণ প্রেমে উপ্‌ছিয়া উঠে সে স্বপ্ন দেখিতে থাকে—কি অপূর্ব্ব আনন্দ ঐ মহাপ্রাণ শিল্পী-বন্ধুরা উপভোগ করিয়া গেছেন—তার সামান্য স্ফুলিঙ্গমাত্র আজও এমন করিয়া জ্বলিতেছে! ক্রিস্তফ্ ভাবে সে ঐ সব মহাপ্রাণদের মত হইবে, তাঁদের মত প্রেমের রশ্মি বিকীরণ করিবে—ওঁদের এতটুকু পথ-হারা কিরণ কেমন দিব্যহাস্যে তার সমস্ত দুঃখবেদনাকে যেন দীপ্তিময় করিয়া দিল! হাঁ এবার তার পালা! সে ভগবান হইবে, আনন্দের আলয়, জীবনের সবিতা হইবে!

হায়! যদি কোন দিন সে তার ঐ প্রিয়বন্ধুদের সমান হইয়া উঠিতে পারে, তাঁদের যে উজ্জ্বল ভাগ্য তার মন এত আকর্ষণ করিতেছে তাহা যদি সে লাভ করিতে পারে—সে হয় ত তখন দেখিবে—পূর্ণতা কোথায়। পূর্ণতা কি মায়া?

—ক্রমশ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রীশান্তা দেবী

খুব অল্প বয়সে হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত একখণ্ড রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী হাতে পাইয়াছিলাম। তাহাতে গদ্য পদ্য গল্প প্রবন্ধ সবই একসঙ্গে পাওয়া যাইত। কিন্তু তখনকার বয়সে কাব্য মনকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করিত না। সুতরাং তাহা কোনোদিন পড়িয়া দেখি নাই। সকলের আগে মন যাইত ইউরোপ প্রবাসীর পত্রের দিকে। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একসঙ্গে বাক্সের উপর "নির্দ্দয় ভাবে নৃত্য" করিয়া কি করিয়া যে তাহা বন্ধ করিয়াছিলেন এবং ভুল করিয়া অপরের ক্যাবিনে ঢুকিয়া পড়িয়া কি রকম গোলমাল বাধাইয়াছিলেন এই সকল বর্ণনাই ছিল আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক।

কিন্তু তারপর অল্পে অল্পে 'গুচ্ছের' দিকে মন ঝুঁকিতে লাগিল। তখন কেবলমাত্র নিছক হাস্যরস ছাড়া অন্য রস সন্ধানও মন করিত। সে ছিল বিস্ময়রস। কোন্ কোন্ গল্প তখন পড়িয়াছি মনে নাই, কিন্তু এই বিস্ময়রসকে যে সকল ছবি জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং আপন মনে নব নব ছবি গড়িয়া তুলিতে ও অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল সেই খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি নানাগল্পের কাঠামো হইতে সরিয়া আসিয়া আজও একটি স্বতন্ত্র চিত্রশালার মত মনের একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বিস্ময়কর ছবিগুলি শুধু যে বিস্ময় জাগাইত তাহা নহে, ভীতিও জাগাইত। ভৌতিক বিস্ময়ের ভীতি মনকে যতই কাঁপাইয়া তুলিত ততই সেই রহস্যময় অন্ধকার রাজ্যের ভিতর উঁকি ঝুঁকি দেওয়া বাড়িয়া চলিত, ছবিগুলি মনে আরো শিকড় গাড়িয়া বসিত।

মনে পড়ে 'জীবিত না মৃতে'র কাদম্বিনীর সেই প্রথম ছবি। বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ-রাত্রির গভীর অন্ধকারে শ্মশানের কোলে জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিল সে ত আপনার গৃহে নাই। মৃত্যুশয্যার কথা মনে করিয়া সে বুঝিল যে, সে বাঁচিয়াই আছে। কাদম্বিনীর মনের এই দ্বন্দ্ব আমার শিশু-মনকে মহা-সমস্যায় ফেলিয়াছিল। মৃত্যু যে কি জিনিষ, মরিয়া মানুষ কেমন করিয়া আপনার মৃত্যুকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না; তাই কাদম্বিনীর মত আমারও মন সংশয় দোলায় দুলিত। অবশেষে মরিয়া কাদম্বিনী প্রমাণ করিল যে, সে মরে নাই। বাহিরের লোক বুঝিল বটে যে, কাদম্বিনী প্রথমবার মরে নাই; কিন্তু কাদম্বিনী নিজে কি করিয়া বুঝিল সেইটা আমার কাছে রহিয়া গেল এক পরম সমস্যা।

"নিশীথে"র সেই পদ্মার চরে জোর হাসি, যাহা পদ্মাপার হইয়া দেশদেশান্ত লোকলোকান্তর ছাড়াইয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াও মস্তিষ্কের সীমানা ছাড়াইয়া যায় না – মৃতের পরিহাসের মতই কানে বাজিত। মনে হইত যেন শুনিতে পাইতেছি। মাথার উপর দিয়া হাসির তীব্র সুর ভাসিয়া যাইতেছে, যেন অন্ধকারে শীর্ণ অঙ্গুলি বাড়াইয়া "ওকে, ওকে, ও কে গো?" বলিয়া দক্ষিণারঞ্জনের মশারির চারিধারে কে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। মৃতাত্মার এই নির্ম্মমতায় বেচারী দক্ষিণার প্রতি বড় করুণা হইত।

'মণিহারা' ফণি-ভূষণের ঘরে বর্ষার অন্ধকার রাতের পর রাত নদীর ঘাট হইতে সুরু করিয়া দেউড়ি পার হইয়া অন্তঃপুরের গোল সিঁড়ি ঘুরিয়া সর্ব্বাঙ্গে হীরা ও স্বর্ণের অলঙ্কার পরিয়া হাড়ে গহনার খট খট ঝম্ ঝম্ ঝঙ্কার তুলিয়া যে কঙ্কাল উঠিত, তাহার সমগ্র ইতিহাসটাই যে মিথ্যা প্রমাণ করা হইল কেন বুঝিতাম না। ফণিভূষণের স্ত্রীর নাম নৃত্যকালী ছিল, এককথায় ইহা বলিয়া মন হইতে মণিমালিকার সালঙ্কারা কঙ্কাল মূর্ত্তিকে মুছিয়া ফেলা গেল না। কঙ্কালের সেই অবাস্তব ভীতিবিস্ময়কর কাহিনীই সত্য হইয়া রহিল, নৃত্যকালী একটা পরিহাস মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে নানা রস নানা রূপ ও নানা ভঙ্গী দেখা দিয়াছে। মানুষের মনের বহু বিচিত্র গতিকে বহু চিন্তা সমস্যা দুঃখ সুখ হাসি কান্না ও ছোট বড় অনুভূতির নানা স্তরকে তিনি তাঁহার লেখনীর সতেজ কোমল দৃঢ় ও পেলব স্পর্শে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেই স্পর্শের ছন্দ ভঙ্গী ও দৃঢ়তা অনুসারে বিষয়ের বৈচিত্র্য হিসাবে রসের ও রঙের